প্রতিচিন্তা

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

নবম বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● এপ্রিল-জুন ২০১৯



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ২০১৯

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; প্রধান নির্বাহী, নলেজ অ্যালায়েন্স

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.prothom-alo.com/protichinta, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
April-June Issue, 2019; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
Prothom Alo Bhaban, 19 Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81, 09613113366

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৬

ইতিহাস

গান্ধীর কংগ্রেস এবং জিন্নাহর মুসলিম লীগ রাজনীতির একটি অধ্যায় ৯
রাহমান চৌধুরী

পর্যালোচনা নিবন্ধ

মুসলিম লীগ কি বাংলার মুসলিমদের মুক্তিদাতা ছিল? ৫১
আসহাবুর রহমান

মন্তব্য

হিন্দুত্ববাদ কি ভারতে টেকসই হবে? ৮৩
সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

আন্তর্জাতিক

ভেঙে যাওয়া সামাজিক চুক্তি ও আরেকটি আরব বসন্ত ৯১
মারওয়ান মাউশের

সমাজ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিলীন সীমানা এবং তরুণদের মধ্যে অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিকাশ ১০৩
ম্যাটস একস্ট্রম ও অ্যাডাম শেহাতা

রাজনীতি

মার্ক্সের মানবসত্তা : এরিখ ফ্রমের পর্যালোচনা ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ ১৩৩
মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

বই আলোচনা

এক-এগারো : সেনা-রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া ১৪৭
সোহরাব হাসান

লেখক পরিচিতি ১৫৮



ভারতে ঘটে গেল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নির্বাচন। আর বলতে গেলে তা জিতে নিলেন একজন ব্যক্তি। নরেন্দ্র মোদির এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আবারও শুরু হয়েছে আলোচনা-সমালোচনা। কী হতে চলেছে ভারতের ভাগ্যে? সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ভাগ্যেই কী হবে, তা নিয়ে রয়েছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা।

মোদি জিতবেন, এতে হয়তো অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কারণ, ২০১৭ সালে পিউ রিসার্চের এক জরিপে আমরা দেখেছি, ভারতের ৫৫ শতাংশ জনগণ 'শক্তিশালী নেতা' চায়। মানে এক ব্যক্তির মাধ্যমে দেশ পরিচালনায় তাদের আস্থা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের দেশে এত বেশিসংখ্যক মানুষ এক ব্যক্তির শাসনকে পছন্দ করছে, তা নিঃসন্দেহে জনচরিত্রের দ্বিচারিতা। এই হার পৃথিবীর যেকোনো দেশের চেয়ে বেশি। এমনকি পুতিনের রাশিয়াও ভারতের জনগণের কাছে 'হার' মেনেছে।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কর্ণধার বিজেপির এমন বিজয় নিশ্চিতভাবেই ভারতের সেক্যুলার চরিত্রের জন্য হুমকি। কিন্তু এই পরিস্থিতি বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে দেশভাগের আগের রাজনীতিতে। দেশভাগের গরল ও তার বিষাদ ছায়া আজও উপমহাদেশের রাজনীতির জন্য ক্ষত চিহ্ন হয়ে আছে।

দেশভাগের ইতিহাস নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। কে দায়ী বা কী দায়ী—সে বিতর্ক আজও চলছে। কেউ দোষ দেখেন জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের, কেউবা দায়ী করেন কংগ্রেস-গান্ধীকে। অনেকেই দেখতে চান ভারতীয় রাজনীতির শ্রেণিচরিত্র বিশ্লেষণ করে। *প্রতিচিন্তা*র এই সংখ্যায় রাহমান চৌধুরী যেমন তুলে এনেছেন এমন সব দিক, যেখানে গান্ধীকেই দেশভাগের জন্য দায়ী মনে হবে। তার উল্টো দিকে আসহাবুর রহমান দেখিয়েছেন ইতিহাসের ভুলপাঠ থেকে কীভাবে মুসলিম লীগীয় ইতিহাস নতুন করে সামনে চলে আসছে। তিনি বলতে চেয়েছেন ভারতীয় রাজনীতির শ্রেণিচরিত্রের কথা। এই শ্রেণিচরিত্র বাদ দিয়ে আমাদের দেশেও প্রগতিশীল লেখক-বুদ্ধিজীবীরা মুসলিম লীগের বয়ান পাঠ করেই দেশভাগকে দেখেন বলে তিনি জানিয়েছেন তাঁর লেখায়।

বিদ্যায়তনিক দৃষ্টিকোণ থেকে *প্রতিচিন্তায়* দুটো লেখাই ছাপা হলো। এর সূত্র ধরে সৈয়দ ইফতেখার আহমেদ সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন দেশভাগের আগে যে রাজনীতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হয়েছিল, তা কতটা স্থায়ী হবে ভারতে। তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, হিন্দুত্ববাদ ভারতে স্থায়ী হবে কি না।

যাহোক, ভারতীয় কংগ্রেস দলকে নতুন করে ভাবতে হবে, কীভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পরাভূত করা যায়। তারাই ভারতের বিদ্যমান বিরোধী দল, যারা মোদিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারত। কিন্তু এই দলের ভরাডুবি ভারতের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ভবিষ্যৎ ফেলেছে শঙ্কার মুখে। বলা হচ্ছিল বেনামে বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো মোদিকে ১২০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে নির্বাচনী খরচের জন্য। আর এটা ঘটেছে, যখন রাজনৈতিক অনুদানের বিষয়ে রাখঢাক করাকে মোদি বৈধতা দিয়েছেন। সুতরাং সাধারণ জনগণের বদলে বড় ব্যবসায়ীদের পক্ষে মোদি কাজ করবেন, তা পরিষ্কার। ভারতের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের ব্যাপারে মুখে মুখে দায়সারা কথা বলে গেছে বিজেপি। এর বাইরে জাতপাত ও ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক বিভেদ সমাজে বেড়েই চলেছে। ব্যবসাবান্ধব ও মুসলিমবিদ্বেষী জাতীয়তাবাদী বিজেপির চাওয়াও ছিল এমনটাই। ভারতের বিরোধী শক্তিকে এখন সমতার নীতির ওপর জোর দিয়ে ক্যাম্পেইন করা উচিত। এ জন্য সেই বিরোধী শক্তিকে ভারতের দরিদ্র মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। ভারতের রাজনীতির ভবিষ্যৎ শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো উপমহাদেশের রাজনীতিতেই প্রভাব ফেলবে।

আট বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘটিত আরব বসন্ত পুরো দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। এত বছর পরে আবার এই অঞ্চল প্রতিবাদে জ্বলে উঠেছে। এ বছর এপ্রিলে আলজেরিয়া ও সুদানে ঘটা গণ-আন্দোলনের মুখে দীর্ঘদিন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা দুজন স্বৈরশাসক পদত্যাগে বাধ্য হন। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদেল আজিজ বুতেফ্লিকা পদত্যাগ করেন এপ্রিলের ২ তারিখে আর সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশির পদত্যাগপত্র জমা দেন একই মাসের ১১ তারিখে।

এই গণ-অভ্যুত্থানগুলোর সঙ্গে ২০১১ সালে মিসরে ঘটা গণ-অভ্যুত্থানের সাযুজ্য পাওয়া যায়। সেখানেও প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। তখনো এখনকার মতো তরুণদের আন্দোলন, বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে ক্লেপটোক্র্যাটিক নির্যাতনকামী একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল জনতা। সব কটি সংগঠনই সমাজে বিদ্যমান নানা সমস্যা ও দুর্দশা যেমন বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও পুলিশি নির্যাতনের মতো বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি জানায়। তিনটি দেশের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সেনাবাহিনীর জেনারেলরা স্বৈরশাসকদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদে যোগ দিয়েছেন। উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লব-পরবর্তী অবস্থার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।

এই ঘটনাগুলোর মধ্যে সাযুজ্য খোঁজার মধ্যে আবার কিছু সমস্যাও আছে। কারণ, মিসরে দেখা গেছে হোসনি মোবারকের উচ্ছেদের পরে গণতান্ত্রিক ধারায় উত্তরণ কীভাবে

ঘটবে, তা নিয়ে বিপ্লবীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ফলাফল দাঁড়ায় ২০১৩ সালের প্রতিবিপ্লব, যার মাধ্যমে সামরিক শাসনের পথ সুগম হয়। এর ফলে আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি ক্ষমতায় আসেন, যা আগের শাসনের চেয়ে আরও বেশি নির্যাতনকামী ও সহিংস হয়ে ওঠে। তবে মিসরের ঘটনা আলজেরিয়া ও সুদানের জন্য শিক্ষণীয়।

কিন্তু আরবের বাকি দেশগুলোর ভাগ্যে কী ঘটবে? আরেকটি আরব বসন্ত কি সেখানকার বিদ্যমান স্বৈরশাসকদের ভিত নাড়াবে? আর তা ঘটলেও চূড়ান্ত ফলাফল কি মিসরের মতোই হবে? মারওয়ান মাউশের *ফরেন অ্যাফেয়ার্স* সাময়িকীতে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। *প্রতিচিন্তার* পাঠকদের জন্য সে লেখাটি 'ভেঙে যাওয়া সামাজিক চুক্তি ও আরেকটি আরব বসন্ত' শিরোনামে ছাপা হলো। আরেকটি আরব বসন্ত কেন আসন্ন, তারই সুনিপুণ বিশ্লেষণ রয়েছে এ লেখায়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বর্তমান দুনিয়ার রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক দিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। জনমানস গঠন ও জনপরিমণ্ডল তৈরিতে এই মাধ্যমের রয়েছে অভূতপূর্ব ভূমিকা। সে প্রেক্ষাপটে দেখা দরকার কিশোর-কিশোরীরা কীভাবে ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সুইডেনের দুজন গবেষক সে দেশের ওপর দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা করে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁরা এ-ও বলেছেন যে এই গবেষণা সুইডেনে করা হলেও অন্যান্য জায়গার ক্ষেত্রেও প্রায় একই রকম। এই গবেষণার শক্তিশালী দিক হলো, একই উত্তরদাতাদের ওপর পাঁচ বছর ধরে গবেষণা চালানো হয়েছে। এর ফলে বোঝা গেছে সময়ের আবর্তে তাদের মধ্যে রাজনীতির প্রতি ঝোঁক বাড়ে না কমে। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বিশ্লেষণ করতে গবেষকদ্বয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যা তাঁদের বিশ্লেষণের যথার্থতা বাড়িয়েছে। সেই লেখাই *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যায় ছাপা হলো।

কার্ল মার্ক্স সব সময়েই প্রাসঙ্গিক এক চরিত্র। তাঁর চিন্তা-চেতনা বর্তমান সমাজেও সমানভাবে প্রযোজ্য। মার্ক্স কীভাবে মানবসত্তাকে দেখেছেন, তা বর্তমান দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। মুহাম্মদ তানিম নওশাদ মার্ক্স সম্পর্কে এরিখ ফ্রমের পর্যালোচনা বিশ্লেষণ করে মানবসত্তা সম্পর্কে মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে এনেছেন। এর পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ও এই লেখায় জায়গা পেয়েছে, যা পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

শেষ লেখায় রয়েছে বই আলোচনা। এবারের বই আলোচনায় স্থান পেয়েছে মহিউদ্দিন আহমদের *এক-এগারো : বাংলাদেশ ২০০৭-২০০৮* বইটি। আলোচনা করেছেন সোহরাব হাসান। সোহরাব হাসান বইটি আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততার বিষয়ে নজর দিয়েছেন। সেই আলোকেই তিনি বইটি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

ইতিহাস

গান্ধীর কংগ্রেস এবং জিন্নাহর মুসলিম লীগ রাজনীতির একটি অধ্যায়

রাহমান চৌধুরী

প্রাক্-কথন

কংগ্রেসের রাজনীতিতে গান্ধীর চেয়ে কম করে হলেও ১২ বছর আগে জিন্নাহ যুক্ত হয়েছেন। জিন্নাহ যখন প্রথম কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে বিলেত যান, গান্ধী তখন দক্ষিণ আফ্রিকায়। জিন্নাহর সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগ ১৯০৪ সাল থেকে। কিন্তু তখনো তিনি কংগ্রেসের সদস্য নন। ফিরোজ শাহ মেহতা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে ১৯০৫ সালে জিন্নাহ গোখলের সঙ্গে বিলেতযাত্রা করেন। পরের বছর মুসলিম লীগ গঠিত হয়। জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগ দেননি। তিনি ১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জিন্নাহকে সদস্য পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বারবার আমন্ত্রণ জানানোর পর তিনি শর্ত দেন যে মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসবিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে, তাহলেই তিনি মুসলিম লীগের সদস্য পদ গ্রহণ করবেন। মুসলিম লীগ জিন্নাহর শর্ত মেনে নিলে তিনি ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগে যুক্ত হন। দুটি-তিনটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে তখন বাধা ছিল না। কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যরা ইচ্ছা করলেই মুসলিম লীগের সদস্য হতে পারতেন। জিন্নাহর মুসলিম লীগের সদস্য হওয়ার কারণ ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে তিনি একই পতাকাতলে নিয়ে আসতে চাইছিলেন। জিন্নাহ মনে করতেন, ভারতের হিন্দু-মুসলমানরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করে, ব্রিটিশ শক্তি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হবে। জিন্নাহকে তাই গোখলে হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সরোজিনী নাইডুও জিন্নাহ সম্পর্কে তা-ই বলেছিলেন।

জিন্নাহ আরও অনেককে সঙ্গে নিয়ে ১৯১৬ সালে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির শর্তাবলির মধ্য দিয়ে দুটি সংগঠন একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সাংবিধানিকভাবে লড়াই করতে রাজি হলো। লক্ষ্ণৌ চুক্তির পর থেকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন একই শহরের একই জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত হতো, যাতে দুই পক্ষই পরস্পরের অধিবেশনে যোগ দিতে পারে। লক্ষ্ণৌ চুক্তির মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা মুসলমানদের অনেক যুক্তিপূর্ণ দাবি মেনে নিয়েছিল। সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলমানদের অনেক অধিকার স্বীকার করা হয়েছিল। ঠিক একইভাবে বাংলা ও পাঞ্জাব যেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু ছিলেন, সেখানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে হিন্দুদের জনসংখ্যার তুলনায় অধিক আসন বরাদ্দ করা হয়েছিল। গান্ধী যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে এলেন, জিন্নাহ তখন কংগ্রেসসহ বহু প্রতিষ্ঠানের প্রথম সারির সম্মানিত নেতা। গোখলে তখন কংগ্রেসে যোগদানের আগে গান্ধীকে ভারতের গ্রামগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞতা গ্রহণের পরামর্শ দেন। গান্ধী তখন মাঝেমধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিলেও সেভাবে পরিচিত বা ক্ষমতাবান নন। তিনি ১৯১৯ সালে ভারতের রাউলাট বিলকে ঘিরে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে রাতারাতি সাধারণ মানুষের জনপ্রিয় নেতা হয়ে যান। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘিরে তিনি সে আন্দোলন হঠাৎ আবার বন্ধ করে দেন। গোখলে তখন প্রয়াত, গান্ধী কংগ্রেসের জনপ্রিয় নেতা। গান্ধী এই সময়ে মুসলমানদের ধর্মীয় আন্দোলন খিলাফতে যোগ দেন। নিজের জনপ্রিয়তা আর প্রভাব খাটিয়ে তিনি কংগ্রেসকে সেই আন্দোলনে যুক্ত করতে চান। কিন্তু জিন্নাহ, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, তিলক প্রমুখ গান্ধীর বিরোধিতা করেন। সবাই-ই মনে করেন, খিলাফতের মতো একটি ধর্মীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের যুক্ত হওয়া ঠিক নয়, যার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রথমে কংগ্রেসের সব বড় নেতা বিরোধিতা করলেও পরে গান্ধীর জনপ্রিয়তা দেখে দমে যান।

জিন্নাহ মোটেই তা করেন না। তিনি শক্তভাবে গান্ধীর নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। গান্ধী মুসলমানদের মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি হিন্দুদেরও যোগ দিতে বলেন। তিনি মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনে সমর্থন দেওয়ার বিপরীতে মুসলমানদের কাছ থেকে এই শর্ত আদায় করে নিলেন, তারা গোহত্যা বন্ধ রাখবে। মুসলমানরা গোহত্যা বন্ধ করতে রাজি হলে হিন্দু সম্প্রদায় খিলাফত সম্পর্কে না বুঝেই তাকে সমর্থন দিয়ে বসল। জিন্নাহ স্পষ্ট বললেন, কট্টর ধার্মিকদের এভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনে গান্ধী ভুল করছেন। ধর্মীয় উন্মাদনার মধ্য দিয়ে তিনি যেভাবে হিন্দু-মুসলমানদের এক করছেন, সেটা খুব বেশি দিন টিকবে না। বরং জাতীয়

আন্দোলনের ওপর ধর্মীয়ভাবে কট্টরদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশনে তখন হিন্দু-মুসলিম জনতা সবাই খিলাফত এবং গান্ধীর সমর্থক। কংগ্রেস অধিবেশনে সেদিন যে ১৪ হাজার প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা ইতিপূর্বে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না। কংগ্রেসের সভায় উপস্থিত হননি। সবাই-ই তাঁরা খিলাফত আন্দোলনের জোয়ারে জিন্নাহর মতো প্রভাবশালী নেতাকে তাঁর বক্তব্য বা যুক্তি প্রদর্শন করতে দিলেন না। বরং জিন্নাহকে অপমান করতে লাগলেন। গান্ধী নীরবে সব দেখলেন। জিন্নাহ যাতে প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারেন, তার জন্য উত্তেজিত জনতাকে থামালেন না পর্যন্ত। কংগ্রেসের বাকি নেতারা আগেই গান্ধীর কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে রয়েছেন। জিন্নাহ উত্তেজনার মধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের বক্তব্য রাখলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন, সাংগঠনিক বিধি না মেনে যেভাবে কংগ্রেসে ব্যক্তিপূজা শুরু হয়েছে, আর বাকি নেতারা মুখ বুজে তা-ই মেনে নিচ্ছে, সেখানে তাঁর পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব নয়। জিন্নাহর আগের নেতা ফিরোজ শাহ মেহতা, গোখলে—কেউ তখন আর বেঁচে নেই। কংগ্রেসের অধিবেশনে অপমানিত জিন্নাহ এরপর কংগ্রেস ত্যাগ করলেন।[১]

এক.

জিন্নাহ কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেলেও ভারতের রাজনীতি থেকে বিদায় নেননি। নাগপুর অধিবেশনের পর কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করায় জিন্নাহর নেতৃত্বের পরিসর সীমিত হয়ে গেলেও তিনি ধর্মনিরপেক্ষ নিয়মতান্ত্রিক আদর্শ থেকে সরে দাঁড়াননি। ১৯২১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গোখলের মৃত্যুবার্ষিকীতে আয়োজিত জনসভায় আবার ধর্মীয় রাজনীতির বিরোধিতা করে বলেন, 'আমরা যা চাই, তা হচ্ছে সত্যিকার রাজনৈতিক নীতিভিত্তিক একটি সত্যিকার রাজনৈতিক আন্দোলন। এর ভিত্তিমূলে থাকবে সে আগুন, যার শিখা মাতৃভূমির জন্য সবার হৃদয়ে অনির্বাণ থাকে। যত দিন না আমরা এ বনিয়াদের ওপর দাঁড়াতে পারব, তত দিন আমাদের কর্মসূচি ত্রুটিমুক্ত হতে পারবে না।'[২] কিন্তু তখন অসহযোগ আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করেছে। সরকার অসহযোগ আন্দোলনবিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন, জিন্নাহ তাতে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে দিতে রাজি হননি।[৩] তিনি যে নীতিবিচ্যুত ছিলেন না, এ ঘটনায় তার ভিন্ন একটি পরিচয় পাওয়া যায়। সীতারামাইয়া তাঁর গ্রন্থে দেখান যে ১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে মালব্য, জয়াকর প্রমুখ কর্তৃক আহূত বোম্বের সর্বদলীয় সম্মেলন শেষে সম্মেলনের সভাপতি শঙ্কর নায়ার সংবাদপত্রে প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে কিছু ভুল তথ্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। সম্মেলনের দুই সম্পাদক জয়াকর ও নটরাজনের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে জিন্নাহ প্রকাশ্যে শঙ্করণের বিবৃতির বিরোধিতা

করেন।[৪] জিন্নাহ সুযোগ পেয়েও শত্রুতামূলকভাবে গান্ধীকে আক্রমণ না করে বরং তাঁর পক্ষই নিলেন।

ভিন্ন দিকে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় কৃষক বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে যুক্তপ্রদেশ। ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে অযোধ্যা তালুকে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে প্রয়াসী হন ঝিঙ্গুরি সিং ও দুর্গাপাল সিং। অচিরেই আবির্ভূত হলেন এক নতুন কৃষকনেতা, যিনি পরে বাবা রামচন্দ্র নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র নানা দেশ ঘুরে যুক্তপ্রদেশের ফৈজাবাদে আসেন ১৯০৯ সালে। ১৯২০ সালের মধ্যে তিনি কৃষকদের নেতা হয়ে ওঠেন এবং নিজের সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। চুরির মিথ্যা অভিযোগে রামচন্দ্র ও তাঁর ৩২ জন অনুগামীকে ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে গ্রেপ্তার করা হয়। হাজার হাজার কৃষক রামচন্দ্রের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হন। রামচন্দ্রের চুরির অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। রামচন্দ্র ছাড়াও ইতিমধ্যে আর্যসমাজি কেদারনাথ, বেনারস গান্ধী আশ্রমের দেও নারায়ণ পাণ্ডে প্রমুখ এই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২০ সালের ২১ ডিসেম্বর কিষান সভা অযোধ্যায় একটি সমাবেশের আয়োজন করলে প্রায় এক লাখ কৃষক এই সমাবেশে যোগ দেন। ১৯২১ সালে কৃষক আন্দোলন সহিংস রূপ নেয়। রায়বেরিলি, ফৈজাবাদ ও সুলতানপুর জেলায় বাজার ও শস্যগোলা লুট এবং পুলিশের সঙ্গে কৃষকদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে থাকে। চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চালিয়ে এই আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা চালায় সরকার।[৫]

সরকারিভাবে আইন করে সভা-সমিতি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়। বহু কৃষক পুলিশের গুলিতে নিহত হন। বাবা রামচন্দ্রসহ একাধিক কৃষকনেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কৃষকদের সেই জঙ্গি আন্দোলনে কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে কোনো সমর্থন পাওয়া গেল না। গান্ধী প্রথম থেকেই কৃষকদের সহিংস আন্দোলনের নিন্দা করছিলেন। রামচন্দ্র গ্রেপ্তার হলে গান্ধী বলেছিলেন, সরকারের দিক থেকে এটি একটি পবিত্র ঘটনা। মতিলাল নেহরু ও কংগ্রেস কৃষকনেতার পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রচারপত্র বিতরণ করা হলো। সেখানে বলা হলো, 'রামচন্দ্রের গ্রেপ্তারে আমাদের অখুশি হলে চলবে না এবং আমরা যেন তাঁকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা না করি।' কংগ্রেস নেতৃত্বের এই আচরণ স্বাভাবিকভাবেই রামচন্দ্রকে হতাশ করেছিল। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে রামচন্দ্র আত্মজীবনীমূলক রচনায় কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনেছিলেন।[৬] ভারতজুড়ে অসহযোগ আন্দোলন গণজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। কংগ্রেসের জাতীয় নেতাদের মানসিক প্রস্তুতির চেয়ে ভারতের সাধারণ মানুষ গণ-আন্দোলনে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। গান্ধী ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষণা করেন, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই ভারতে স্বরাজ আসবে। অবশ্য কেমনভাবে স্বরাজ আসবে, তিনি বলেননি।[৭] কিন্তু পরবর্তী

বছরে স্বরাজ তো আসেইনি, বরং গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেন।

ইতিপূর্বে ১৯২১ সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল উদ্দীপনায় মুসলমানরা বহু স্থানে হিন্দুদের মনোভাবের সমাদর করার জন্য কোরবানি ঈদের দিন স্বেচ্ছায় গরু কোরবানি বর্জন করেছিলেন। হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দিল্লির জুম্মা মসজিদে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে সমবেত মুসলমানদের সামনে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই বছরের আগস্ট মাসেই বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হলো হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও বিরোধ। খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মোপলা মুসলমানরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে হিন্দু প্রতিবেশীদের সরকারের পক্ষের লোক মনে করে তাদের ঘরবাড়ি লুটপাট করেন এবং অগ্নিসংযোগ করেন। মোপলারা ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। খেতমজুর, কুলি, কর্মহীন, ভবঘুরে, ভিক্ষুক ও অন্যান্য নিম্নবর্গের এই মোপলারা হিংসাত্মক হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা ভূস্বামীদের বিরোধিতা করতে গেলে তাঁদের অভ্যুত্থান বিপথগামী গণবিদ্রোহে রূপ নেয়।[৮] কংগ্রেসের বামপন্থী নেতা হিসেবে খ্যাত হসরৎ মোহানি মোপলাদের পক্ষে সাফাই গাইলে তার প্রতিক্রিয়ায় শ্রদ্ধানন্দ 'শুদ্ধি' আন্দোলন আরম্ভ করেন। মালব্যের নেতৃত্বে শুরু হয় হিন্দুদের 'সংগঠন' আন্দোলন। মুসলমানদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়ায় শুরু হলো 'তাবলিগ'; ও 'তঞ্জিম' আন্দোলন। স্বল্প সময়ে খিলাফতের আবেগধর্মী হিন্দু-মুসলিম ঐক্য মিলিয়ে গেল। নানা স্থানে দফায় দফায় তারপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটতে থাকে, উভয় সম্প্রদায়ই যার শিকার হয়।[৯] জিন্নাহ আগেই কংগ্রেস এবং গান্ধীকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, ধর্মীয় কট্টরদের সঙ্গে নিয়ে, ধর্মীয় আন্দোলন পরিচালনা করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্ভব নয়।

খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে গান্ধীর আঁতাত সত্ত্বেও সরকার প্রথম প্রথম এ ক্ষেত্রে অনুরূপ দমন-পীড়নের আশ্রয় নেয়নি। হিন্দু-মুসলিম সংহতি নষ্টের যে আশঙ্কায় জিন্নাহ ধর্মভিত্তিক খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন, ব্রিটিশ শাসকেরা সম্ভবত সে আশাতেই গান্ধীকে অবাধ বিচরণের সুযোগ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ দেয়। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি অচিরেই রূপান্তরিত হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায়। লক্ষ্ণৌ চুক্তি দ্বারা লীগ-কংগ্রেসের মিলিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতান্ত্রিক ঐক্যের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটিও ভেস্তে যায়। ফিরে আসে ব্রিটিশের কাঙ্ক্ষিত হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ-বিভক্তির অনুকূল পরিবেশ। এদিক থেকে বিবেচনা করলে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সবচেয়ে বেশি সুফল ভোগকারী ছিল ব্রিটিশরাই।[১০] ধর্মীয় খিলাফত আন্দোলনের ভেতর দিয়ে নয়, বরং লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে যেভাবে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধিত হয়েছিল, সেটাই ছিল সঠিক উদ্যোগ। গান্ধী খিলাফত আন্দোলন শুরু করার কারণেই লক্ষ্ণৌ চুক্তির উদ্যোগ আর বেশি দূর এগোতে পারল না।

নিঃসন্দেহে ভারতে ১৯২১ সালটি অসহযোগ আন্দোলনসহ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরে ৪০০টি শিল্প-শ্রমিক ধর্মঘট হয়। সরকারের হিসাব অনুযায়ী ৫ লাখের বেশি শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ মালিকানাধীন আসামের চা-বাগানে অন্ততপক্ষে ১২ হাজার চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রবল ভীতি ও হুমকির মুখে ধর্মঘট চালান। তাঁদের অনেককে ব্রিটিশ মালিক কর্মচ্যুত করেন। সদ্য বরখাস্ত চা-শ্রমিকদের কোনো রকম সাহায্য করতে সরকার অস্বীকৃতি জানায়। শেষ পর্যন্ত কর্মচ্যুত শ্রমিকেরা চাঁদপুরের স্টিমারঘাটে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার এবং তার অনুচরেরা স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে চা-শ্রমিকদের নির্মমভাবে প্রহার করেন এবং নদীর জলে ফেলে দেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে আসাম রেলওয়ের ভারতীয় কর্মচারীরা এবং স্টিমার কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করে দেন। কংগ্রেস সক্রিয়ভাবে শ্রমিকদের পাশে না দাঁড়ালেও সাধারণ মানুষের হস্তক্ষেপে চাঁদপুর ঘাটে অবরুদ্ধ শ্রমিকদের বাড়ি পাঠানো হয়। গান্ধী চা-শ্রমিকদের ধর্মঘট এবং এ ধরনের ঘটনায় আদৌ খুশি হননি।[১১] ভিন্ন দিকে জিন্নাহ কিন্তু খিলাফতকে সমর্থন না করলেও ১৯২১ সালেই গান্ধীকে আবার 'মহাত্মা' অভিধায় উল্লেখ করে প্রকাশ্য গণ-আন্দোলন এবং তজ্জনিত জনজাগরণকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[১২]

বিপরীত ঘটনা এই যে গান্ধী কৃষকদের গণজাগরণকে মেনে নিতে পারলেন না। কারণ, সেটা পরিচালিত হচ্ছিল ধনী ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে। গান্ধী মেলগাঁওয়ের কৃষকদের অসহযোগ আন্দোলনের সময় অহিংস পথ থেকে সরে আসার জন্য ভর্ৎসনা করেন। গান্ধী আসলে সাধারণ মানুষের হাত-পা বেঁধে দিয়েছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট একটি খড়ির গণ্ডি এঁকে দিয়েছিলেন লড়ার সীমানা নির্ধারণ করে। সামান্য মেধার একজন মানুষও বুঝতে পারবে, সেই সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে লড়াই করে কখনোই সরকারকে হটানো বা সাম্রাজ্যশক্তিকে পরাজিত করা যায় না। গান্ধী আসলে বহুকাল তা চাননি। তিনি যেন ভারতীয় জনগণকে নিয়ে একটি 'আন্দোলন আন্দোলন' খেলা খেলছিলেন নিজেকে জনপ্রিয় নেতা করে তোলার জন্য। একই সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তির কাছে নিজেকে শক্তিমান উদারতাবাদী রাজনৈতিক নেতা প্রমাণ করে সম্মান আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন। উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলিতে কৃষকের বিক্ষোভ মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালালে সাতজনের মৃত্যু হয়। প্রতিবাদস্বরূপ উত্তর প্রদেশের প্রায় ৭০ হাজার কৃষক অভূতপূর্ব উৎসাহের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু গান্ধী কৃষকদের এই অভ্যুত্থানকে ভয় পাচ্ছিলেন। মনে করেছিলেন, আন্দোলনের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব আর থাকবে না।

গান্ধী যতই অসহযোগের কথা বলেন না কেন, কৃষক চাঞ্চল্য প্রায়ই হিংসামূলক বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। কৃষকেরা একালে অসহিষ্ণু উত্তেজনায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল জ্বলে উঠতে পারত, তথাপি তাঁরা গান্ধীর

অহিংস নীতির কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আশ্চর্যরূপে শান্ত ছিলেন। জওহরলাল লিখেছেন, ১৯২০ সালের শরৎকালে কয়েকজন কৃষকনেতা সামান্য অপরাধে গ্রেপ্তার হন। ঠিক হয়েছিল প্রতাপগড় শহরে তাঁদের বিচার হবে। বিচারের দিন চারদিক থেকে বিশাল জনতা এসে জেলের দরজা হতে আদালত প্রাঙ্গণ পর্যন্ত ছেয়ে ফেললেন। ম্যাজিস্ট্রেট ভীত হয়ে সেদিনের মতো বিচার স্থগিত রাখলেন। জনতা কিন্তু বাড়তে লাগল এবং তাঁরা সবাই কারাগার প্রায় ঘিরে রইলেন। জওহরলাল লিখেছেন, কৃষকেরা এক মুষ্টি ভাজা চানা খেয়ে অনায়াসে কয়েক দিন কাটাতে পারেন। অবশেষে সম্ভবত জেলের মধ্যে কোনোরকমে বিচার শেষ করে কৃষকনেতাদের ছেড়ে দেওয়া হলো। কৃষকেরা একে একটা প্রকাণ্ড জয় বলে মনে করলেন। কিন্তু রায়বেরিলিতে ঘটল ভিন্ন ঘটনা। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে কয়েকজন প্রধান কৃষক গ্রেপ্তার হয়ে স্থানীয় জেলহাজতে আটক ছিলেন। প্রতাপগড়ে কৃষক আন্দোলনের সাফল্য এবং অবলম্বিত কৌশলের কথা স্মরণ করে দলে দলে কৃষক রায়বেরিলির শহরে আসতে লাগলেন। কিন্তু এবার সরকার আগে থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ও সৈন্য সংগ্রহ করে কৃষকদের শহরে প্রবেশে বাধা দিল।[১৩]

শহরের বাইরে একটি ছোট নদীর অপর পারে অধিকাংশ কৃষককে থামিয়ে রাখা হলো। অবশ্য অনেকে নানা পথ দিয়ে শহরে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু সামরিক জান্তার গুলিতে তাঁদের বহুজনকে প্রাণ দিতে হলো। জওহরলাল লিখেছেন, কৃষকেরা যদিও ছত্রভঙ্গ হতে বা ফিরে যেতে অস্বীকার করেছিলেন, তথাপি তাঁরা বরাবর শান্তিপূর্ণ ছিলেন। প্রশাসন রায়বেরিলি জেলায় দুবার কৃষকদের ওপর গুলি চালিয়েছিল। রায়বেরিলি ও প্রতাপগড় জেলার পল্লী অঞ্চলে শত শত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ও অন্যান্য উপায়ে কৃষক কংগ্রেস আন্দোলন দমনের চেষ্টা করতে লাগল। ১৯২১ সালে ফৈজাবাদ জেলা ব্যাপক দমননীতির স্বাদ পেল। কতগুলো গ্রামের কৃষকেরা একত্র হয়ে এক তালুকদারের বাড়ি লুট করেন। পরে প্রকাশ পেল, এ তালুকদারের শত্রুপক্ষীয় আরেক জমিদারের কর্মচারীরা প্ররোচনা দিয়ে এই কাজ করিয়েছিলেন। এই অজ্ঞ গরিব কৃষকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে মহাত্মা গান্ধী তাঁদের বলেছেন লুট করতে এবং সেই আদেশ পালন করার জন্য তাঁরা 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' বলতে বলতে লুট করেছিলেন।[১৪] কৃষকদের এই আন্দোলন সত্যিকার অর্থে গান্ধী বা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে ছিল না বা তাদের পরিকল্পনামতো এগোচ্ছিল না। জওহরলালের কথা থেকে বোঝা যায়, জনগণ গান্ধীর ডাকা আন্দোলনকে নিজের মতো করেই পরিচালনা করেছিলেন।

কংগ্রেস এই সময়ে ওয়েলসের যুবরাজের ভারত আগমনের বিরোধিতা করে এবং যুবরাজের জন্য আয়োজিত সর্বপ্রকার সভা-সমিতি ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বর্জনের আহ্বান জানায়। যুবরাজ আগমনের দিন প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সারা ভারতে হরতাল

পালিত হয়। কংগ্রেস সর্বত্র অহিংস ও শান্তিপূর্ণ হরতাল পালনের নির্দেশ দেয়। কিন্তু বোম্বাই শহরের হরতালে সংঘর্ষ দেখা দেয়, ফলে ৫৩ জন মারা যান। সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের দরুন প্রতিবাদস্বরূপ গান্ধী পাঁচ দিন অনশন করেন। ব্রিটিশ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে কংগ্রেস সেবাদল সংগঠন ও খিলাফত কমিটিকে বেআইনি ঘোষণা করে। ফলে কংগ্রেস সেবাদল ও খিলাফত কমিটির সদস্য হওয়া আইনের চোখে অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। সাম্রাজ্যবাদের এই দমননীতি আইনের প্রতিবাদে কংগ্রেস দেশবাসীকে দলে দলে কংগ্রেস সেবাদল সংগঠনে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। সারা দেশে প্রথম সারির কংগ্রেস নেতাদেরসহ বহু সহস্র রাজনৈতিক কর্মীকে সরকারের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে গণ-গ্রেপ্তার চলতে থাকে। সাধারণ মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে তাঁরা দলে দলে সেবাদল প্রতিষ্ঠানে নাম লিখিয়ে কারাবরণ করেন। সারা ভারতে ৩০ হাজারের বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে রাখা হয়। জওহরলাল এ সম্পর্কে লিখছেন, যাঁরা কোনো দিন কংগ্রেসে বা তার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেননি, তাঁরাও গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য জেদ দেখাতে লাগলেন। ঘটনা এমনও ঘটেছে, সরকারি দপ্তরের করণিক কার্যালয় হতে বাড়িতে ফেরার পথে জনসাধারণের উৎসাহের স্রোতে ভেসে বাড়িতে না গিয়ে কারাগারে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। যুবক ও বালকেরা পুলিশের গাড়িতে উঠে বসত এবং কিছুতেই নামতে চাইত না। প্রতিদিনই দেখা যেত, এভাবে গাড়ির পর গাড়িবোঝাই বন্দীরা জয়ধ্বনি দিতে দিতে কারাগারে প্রবেশ করছেন।[১৫]

সারা দেশ যখন কারাগারে পরিণত হয়েছে, তখন এমন উত্তেজনাকর পরিবেশের মধ্যে আহমেদাবাদে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন আয়োজন করা হলো। গান্ধী তখনো কারাগারের বাইরে। চিত্তরঞ্জন দাশ কারাগারে থাকার কারণে তাঁর পরিবর্তে হাকিম আজমল খাঁ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। গান্ধীর প্রতিশ্রুত স্বরাজ ১৯২১ সালে এল না। তা সত্ত্বেও অধিবেশনে যত দিন স্বরাজ না আসে, তত দিন উৎসাহের সঙ্গে অহিংস অসহযোগ চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই অধিবেশনে গান্ধীকে কংগ্রেস কর্মপরিষদের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করা হলো। তিনিই এখন থেকে কংগ্রেসের হর্তাকর্তা বিধাতা হলেন। আহমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন না। বহু জেলা থেকে খাজনা বন্ধ আন্দোলন স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করার জন্য গান্ধীর কাছে অনুমতি চাওয়া হলো। গান্ধী তখন কোনো ইতিবাচক সাড়া দেননি। অন্ধ্রের গুন্টুর জেলায় রাজনৈতিক কর্মীরা নিজেদের উদ্যোগে খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করলে গান্ধী তাঁদের ভর্ৎসনা করলেন। শুধু তা-ই নয়, গান্ধী সময়মতো পুরো বকেয়া খাজনা পরিশোধের নির্দেশ

দেন। জনগণ যখন খাজনা বন্ধ আন্দোলন করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত, জাতীয় আন্দোলনের নেতারা এবং গান্ধী সেই পথে এগোতে জনগণকে উৎসাহিত করলেন না। গান্ধী ভূস্বামী, সরকার না জনগণ—কার পক্ষ নিয়ে রাজনীতি বা সংগ্রাম করছিলেন, বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

জিন্নাহ কিন্তু খিলাফত আর অসহযোগ আন্দোলনের এই দিকগুলোর ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন। তিনি প্রশাসনের গুলির সামনে সাধারণ কৃষকদের পাঠাতে চাননি। জিন্নাহ জানতেন, ক্ষমতা দখল হলো ভদ্রলোকদের আন্দোলন। স্বভাবতই সরকারের সব সুযোগ-সুবিধা ভদ্রলোকেরাই ভোগ করবেন। জিন্নাহ মনে করতেন, সেই আন্দোলন হতে হবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে। ভদ্রলোকদের ক্ষমতা ভাগাভাগির আন্দোলনে তিনি সাধারণ মানুষ বা কৃষক-শ্রমিকদের বন্দুকের সামনে দাঁড় করাতে চাননি বলেই গান্ধীর মতো হঠকারী আন্দোলনের ডাক দেননি। গান্ধীর আন্দোলনের সারকথা হলো, জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করবে, কিন্তু তাতে করে সরকার যদি জনগণের ওপর হিংসাত্মক আক্রমণ চালায়—জনগণ হিংসা প্রকাশ করতে পারবে না। সরকার যদি জনগণকে হত্যা করে, সরকারের হিংসার কাছে জনগণ প্রাণ দেবে, কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে হিংসাত্মকভাবে রুখে দাঁড়াতে পারবে না। জিন্নাহ গান্ধীর মতো যুক্তিহীন হঠকারী ছিলেন না। জিন্নাহ জানতেন, সরকারের বাহিনীর সামনে দাঁড়ানোর শক্তি ভারতের সাধারণ মানুষ তখনো অর্জন করেনি। গান্ধীর আগেই জিন্নাহ অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে হোমরুল আন্দোলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন, জনগণের সাড়া পেয়েছেন কিন্তু সেখানে এমন কোনো হঠকারিতার আশ্রয় নেওয়া হয়নি যে পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালাতে পারে।

গান্ধী অহিংস আন্দোলন করে তখন বিরাট নেতা বনে গেছেন। তিনি পরের বছর বড়লাটকে এক চিঠি লিখে রাজবন্দীদের মুক্তি এবং সর্বপ্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা বন্ধ করার দাবি জানালেন। তিনি বড়লাটকে সতর্ক করে দিলেন, এই দাবি মানা না হলে তিনি গণভাবে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি গুজরাটের বরদৌলি জেলাকে বেছে নিলেন। এই জেলার শান্তিপ্রিয় কৃষকদের তিনি অহিংসভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য সবচেয়ে যোগ্য বলে মনে করলেন। কিন্তু বড়লাটের কাছে গান্ধীর চিঠি পৌঁছাতে না-পৌঁছাতে খবর এল, উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে কৃষকদের দ্বারা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। সেই গ্রামের উত্তেজিত কৃষক সমাবেশের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে কৃষকেরা থানা আক্রমণ করেন, তার ফলে ২২ জন পুলিশের মৃত্যু ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে বরদৌলি জেলায় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকা হলো এবং সে সভায় আইন অমান্য আন্দোলনকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে তাঁর ভাষায় সারা দেশের রাজনৈতিক কর্মীদের অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন এবং শিক্ষামূলক চরকায় সুতা

কাটার মতো গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। গান্ধীর এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সারা দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। গান্ধীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারাগারের ভেতর নেতারাও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। পট্টভি সীতারামাইয়া লিখেছেন, জেলের ভেতর থেকে মতিলাল নেহরু ও লালা লাজপত রায় দীর্ঘ পত্র পাঠালেন। একটা অঞ্চলের পাপে সারা দেশকে শাস্তিদানের জন্য তাঁরা গান্ধীজিকে দোষারোপ করলেন। মতিলাল প্রশ্ন করলেন, 'কন্যাকুমারিকার একটি গ্রাম যদি অহিংস নীতি মেনে না চলে, তার জন্য হিমালয়ের পাদদেশের শহরকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন?'[১৬]

সুভাষচন্দ্র ব্যাপারটাতে ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করেন। সুভাষচন্দ্র সে সময় কারাগারে ছিলেন। তিনি লিখেছেন, চিত্তরঞ্জনসহ সব জাতীয় নেতা গান্ধীর সিদ্ধান্তে বিক্ষুব্ধ হন। চিত্তরঞ্জন দাশ মনে করেন, আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে গান্ধী গুরুতর ভুল করলেন। আবুল কালাম আজাদ মন্তব্য করেন, গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করলেন, রাজনৈতিক মহলে তা গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। দেশের মনোবলে আঘাত হানল। এতে রাজনৈতিক কর্মীদের মনোবল এতই ভেঙে গিয়েছিল যে গণজোয়ার সৃষ্টি করতে আবার বহু বছর লেগে যাবে।[১৭] কিন্তু কী লাভ তাতে? সবাই মিলেই তো তখন দলের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিসর্জন দিয়ে গান্ধীর কাছে কংগ্রেসকে বন্ধকি দিয়ে রেখেছেন। কংগ্রেসের এসব নেতা রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে গান্ধীর মতো একজন সন্ত বা পুণ্যাত্মা দ্বারা ধর্মীয় মন্দিরের মতো দেশ পরিচালনা করতে চেয়েছেন। গান্ধী নামের এক ব্যক্তির কাছে জিম্মি হতে চাননি বলেই জিন্নাহ আগেই কংগ্রেস ছেড়েছিলেন। ভারতের কংগ্রেসের রাজনীতির চেহারা হয়ে দাঁড়াল গান্ধী নামের এক ব্যক্তি কখন কী চাইবেন না চাইবেন, সেই খামখেয়ালের কাছে আত্মসমর্পণ করা। কংগ্রেসের রাজনীতি গান্ধীর অহিংস নামক এক খেয়ালের কাছে বন্দী হয়ে রইল।

গান্ধী কী করলেন? তাঁর রাজনীতির লক্ষ্য কী হয়ে দাঁড়াল? লাখো মানুষের অত্যাচারিত হওয়া, অপমানিত হওয়া, লুণ্ঠিত হওয়ার কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে। তিনি অহিংস নীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর এক গবেষণাগারে পরিণত করে ফেললেন কংগ্রেস তথা সারা দেশের মানুষকে। সারা দেশের গণমানুষের, তাঁদের সংগ্রামী চেতনার কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে, নেই তাঁদের ইচ্ছার প্রতি সামান্য সম্মানবোধ—গান্ধী চাইলেন সবার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার কাছে এসে নত হবে, সবার ইচ্ছার ওপর তাঁর ইচ্ছা স্থান পাবে। কারণ, তিনিই একমাত্র সত্য পথে রয়েছেন। তিনি যুক্তিবোধের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেকে পুণ্যাত্মা সাজালেন, সন্তদের বেশ ধরলেন—লক্ষ্য ছিল ভারতের মানুষ নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে ধর্মীয় সাধুদের মতো তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পিত করবেন। কংগ্রেসকে ঘিরে যে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাঁধার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, গান্ধী তাকে খাদের

কিনারায় নিয়ে গেলেন। কংগ্রেস কি কোনো রাজনৈতিক দল, নাকি কোনো সন্তর আখড়া—বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ব্যক্তিপূজা ছাড়া, গণতন্ত্রের চর্চা ও গণ-আন্দোলন দুটিই মুখ থুবড়ে পড়ল।

যা ঘটল, একদিকে চৌরিচৌরার ঘটনায় গান্ধী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন বন্ধের আহ্বান, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটপরিবর্তনের ফলে খিলাফত আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা অবান্তর হয়ে দাঁড়াল। এই রকম পরিস্থিতিতে দেশে এক রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। উগ্র হিন্দুত্বে বিশ্বাসী বিভিন্ন গোষ্ঠী হিন্দু পুনর্জাগরণের আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে। খিলাফত আন্দোলন আকস্মিকভাবে গান্ধী প্রত্যাহার করে নিলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তীব্র আকার ধারণ করে। খিলাফত আন্দোলনকারী মুসলমানরা মনে করেন, গান্ধী তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। জিন্নাহ কিন্তু তখন খিলাফত বা মুসলিম লীগ, কারও সঙ্গে সুরে সুর মেলাননি। গান্ধীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের খেপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেননি। তিনি তখনো হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। জিন্নাহ ১৯২২ সালে জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারনৈতিক একটি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য জয়াকর ও মতিলাল নেহরুর মতো সমভাবাপন্ন বন্ধু এবং সহকর্মীদের সঙ্গে বহুবার আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁরা সেভাবে উৎসাহ না দেখালে জিন্নাহর সে ইচ্ছা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।[১৮] ফলে জিন্নাহ মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গেই থেকে গেলেন।

কিছুদিন পর জানা গেল গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ানোর আসল কারণ চৌরিচৌরার ঘটনাবলি নয়, গান্ধী বহুদিন ধরেই অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন। গান্ধীর হঠাৎ করে নাটকীয়ভাবে আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ার প্রকৃত কারণটি ছিল ভিন্ন। জওহরলাল নেহরু গান্ধীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেছিলেন, বাহ্যত প্রবল শক্তি ও উদ্দীপনা সত্ত্বেও আন্দোলন খণ্ড খণ্ড হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। রজনী পাম দত্ত বলেছেন, এর অর্থ যদি এই হয় যে আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সংস্কারপন্থী শান্তিবাদীদের হাত থেকে সরে যাচ্ছিল, তাহলে সে সত্য স্বীকার করতে হবে। গণ-আন্দোলন জোরদার হলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে আন্দোলনকারীদের ওপর সংস্কারপন্থী শান্তিবাদীদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়। সে জন্যই গান্ধীর পক্ষে আন্দোলন স্থগিত রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। গান্ধীর পক্ষে আন্দোলন স্থগিত না করে ভদ্রলোকদের এবং সরকারের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হতো না। কারণ কৃষকেরা খাজনা বন্ধ করার জন্য ক্রমাগত আন্দোলনের নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন। বড়লাট ১৯২২ সালে লন্ডনে প্রেরিত তারবার্তায় জানিয়েছিলেন, অসহযোগ আন্দোলন ভারতের শহরগুলোর সাধারণ মানুষকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। কোনো কোনো অঞ্চলে কৃষকেরাও আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। সমগ্র দেশে মুসলমান জনসংখ্যার একটা

বড় অংশ ক্ষুব্ধ। তিনি ভারতে এই আন্দোলনকে ঘিরে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে বলে ব্রিটিশ সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

ভারতের গণ-আন্দোলন সম্পর্কে বড়লাটের তারবার্তার বক্তব্য মূল্যায়ন করলে বোঝা যায়, সঠিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে গেলে শুধু যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই পরাস্ত হতো, তা-ই নয়, সেই সঙ্গে জমিদারি প্রথাও আঘাত পেত। গান্ধী ভারতের জমিদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে চাননি। বরদৌলিতে বসে আন্দোলন স্থগিত করার সময় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যে প্রস্তাব পাস করা হয়েছিল, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে আন্দোলন স্থগিত রাখার প্রকৃত কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। সভার সিদ্ধান্তে স্পষ্ট ভাষায় জমিদার বা সরকারের প্রাপ্য কর বা খাজনা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।[১৯] কর বা খাজনা বন্ধ করার সঙ্গে হিংসা বা অহিংসার কোনো সম্পর্ক জড়িত নেই। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে, প্রশ্নটি হলো শ্রেণিসম্পর্কের। জমিদার বা সরকারের সঙ্গে বিরোধে জড়াতে চাননি গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। কিন্তু মানুষকে বোকা বানানোর জন্য আন্দোলন বন্ধ করার কারণ হিসেবে অহিংসার কথাই বারবার বলা হলো। গান্ধীর ধুরন্ধরতার পরিচয় মেলে এ ব্যাপারে। কারণ খাজনা বন্ধকে কোনোমতেই হিংসাত্মক কাজ বলা যায় না। বরং খাজনা বন্ধের আন্দোলন গণ-অসন্তোষ প্রকাশের শান্তিপূর্ণ উপায়মাত্র।

জিন্নাহ কখনো খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। কিন্তু ভারতজুড়ে সংগ্রাম যেভাবে দানা বাঁধে এবং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে, জিন্নাহ তার মধ্যে ইতিবাচক লক্ষণই দেখতে পেয়েছিলেন। জিন্নাহ মনে করছেন, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন প্রমাণ করে স্বরাজের দাবি করাটা ন্যায়সঙ্গত। জিন্নাহ জনগণের আন্দোলনের চারিত্রধর্মকে বিচার করছেন এভাবে যে সরকারের বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে দরিদ্র জনগণের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কঠিন, কিন্তু একই সঙ্গে যতটা ইতিমধ্যেই লড়েছেন, তা জনতার শক্তির উদাহরণ। কিন্তু জনগণকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই অহিংসার নামে সরকারের বন্দুকের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়াটাকে তিনি হঠকারিতা মনে করতেন। জওহরলাল নেহরুর বক্তব্যে জিন্নাহর কথার সত্যতা টের পাওয়া যাবে। জওহরলাল লিখেছেন, ভারতীয় কৃষকদের সহ্য করার বা দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অতি অল্প। দুর্ভিক্ষ ও মহামারির কবলে ইতিমধ্যে লাখো নরনারী প্রাণ হারান, তথাপি আশ্চর্য যে সরকার ও জমিদারদের সম্মিলিত চাপ এক বছরকাল পর্যন্ত তাঁরা প্রতিরোধ করেছিলেন। কিন্তু সরকারের দৃঢ় আক্রমণের সম্মুখে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, পরিণামে তাঁদের আন্দোলনের মেরুদণ্ড সাময়িকভাবে ভেঙে গেল। ভাঙলেও আন্দোলন মরল না। স্মরণ রাখা উচিত যে এ ঘটনা ১৯২১ সালের শেষ ভাগে কংগ্রেসের কারাগমন সিদ্ধান্তের আগে ঘটেছিল। আগের বছরের ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও কৃষকেরা এ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন।[২০]

জওহরলাল আরও লিখেছেন, 'সাধারণত দীর্ঘদিন আন্দোলন চালানোর মতো পর্যাপ্ত শক্তি জনসাধারণের নেই। কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি এবং বিদেশি শাসনের প্রতি অসন্তোষ যতই ব্যাপক হোক না কেন, আমাদের উপযুক্ত মেরুদণ্ড ও সঙ্ঘশক্তি ছিল না। যাঁরা সাময়িক উত্তেজনায় কারাগারে এসেছিলেন, তাঁরাও দ্রুত একটা মিটমাট প্রত্যাশা করতেন।' জওহরলাল স্বীকার করেন, এই রকম পরিস্থিতিতে ১৯২২ সালে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঠিকই হয়েছিল। তিনি মনে করেন, সেটা হঠাৎ না করে আরও সুষ্ঠুভাবে করা যেত।[২১] সুভাষচন্দ্র বসু বলছেন ভিন্ন কথা। তিনি বলছেন, '১৯২২ সালে যখন সমগ্র জাতি আবেগপূর্ণ কর্মে জেগে উঠেছিল, তখন সেনাধ্যক্ষ আকস্মিকভাবে শ্বেতপতাকা উত্তোলন করলেন। কয়েক মাস আগে তিনি একটি অনন্য সুযোগ হারানোর ঠিক পরেই এই ঘটনা ঘটল।'[২২] তিনি আরও বলছেন, যদি আমাদের নীতি আপসহীন সংগ্রামের হতো, তাহলে ১৯২২ সালের বরদৌলি আত্মসমর্পণ কখনো ঘটত না। তিনি স্পষ্ট করেই বলেন, মাহাত্মা গান্ধী খামখেয়ালিভাবে সে গণসংগ্রাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।[২৩] কংগ্রেসের রাজনীতিতে গণ-আন্দোলনের চরিত্রটি ছিল হাস্যকর। কংগ্রেস গণ-আন্দোলন চাইত, কিন্তু একই সঙ্গে আশা করত, সে আন্দোলন যেন ব্রিটিশ শক্তির গায়ে আঁচড় না কাটে। কংগ্রেসের গণ-আন্দোলন যে সত্যিকার অর্থে কোন লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল, সেটা বুঝে ওঠাই ছিল দুষ্কর।

গান্ধী জনগণের অসন্তোষ বুঝে আন্দোলনের ডাক দিতেন বটে, কিন্তু সেটাকে খুব বাড়তে না দিয়ে থামিয়ে দিতেন। গান্ধীর খিলাফত এবং অসহযোগ বা আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার পর কংগ্রেসে কী ঘটল? গান্ধীর সমর্থকেরা সরকারবিরোধী অসহযোগ আন্দোলন বাদ দিয়ে গান্ধী-প্রদর্শিত গঠনমূলক অরাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। সে জন্য তাঁরা হস্তশিল্পে উৎসাহ দান, চরকায় সুতা কাটা, অস্পৃশ্যবিরোধী এবং মাদকদ্রব্যবিরোধী কাজের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন, যা ব্রিটিশ সরকারের গায়ে সামান্যতম আঁচড় কাটবে না। জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীর সমর্থকেরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সপক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন। গান্ধীর গঠনমূলক কর্মসূচি প্রধানত শহরের মধ্যবিত্ত, কারুশিল্পী এবং ছোট ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের মতো রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন প্রত্যাহার করার ফলে শহর ও গ্রামের মানুষ যাতে কংগ্রেস নেতৃত্বের বাইরে চলে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। গান্ধী খিলাফত আর অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়ার পরই সরকার তাঁকে কারাগারে পাঠায়। বিচারে গান্ধীর ছয় বছরের কারাদণ্ড হয়।

কংগ্রেসের গয়া সম্মেলনের প্রাক্কালে ১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন কারাগার থেকে মুক্তি পান। অভ্যর্থনা কমিটি তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করে। চিত্তরঞ্জন দাশ

বিকল্প কর্মসূচিতে বিশ্বাস করতেন এবং বলতেন যে বিরাজমান পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ত্যাগ করে ব্যবস্থাপক সভার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করতে হবে। জিন্নাহর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের চিন্তার এই ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্যও ছিল না। কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার পর তিনি মনে করলেন, তিনি এবার দেশকে তাঁর কর্মসূচির দিকে নিয়ে যেতে পারবেন। গয়া অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে দাশ প্রস্তাব করলেন যে কাউন্সিলে প্রবেশ কর্মসূচিকে গ্রহণ করে ব্যবস্থাপক সভার অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা কংগ্রেসের উচিত। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তাঁর বক্তব্য নিয়ে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দিল।[২৪] সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন সর্দার প্যাটেল, রাজা গোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ। তাঁদের মধ্যে সর্দার প্যাটেল এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন গান্ধীর নিজের আবিষ্কার। বলা যায়, তাঁর নিজ হাতে গড়া। গান্ধীর আশীর্বাদে পরবর্তী সময়ে তাঁরা কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতায় পরিণত হন।[২৫] দাশ সবিস্তারে এর ব্যাখ্যা দিলেন, কিন্তু কংগ্রেসের উচ্চতর নেতৃত্বকে এর সপক্ষে আনতে পারলেন না। রাজা গোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অন্যরা তাঁর বিরোধিতা করলেন এবং তাঁর প্রস্তাবকে ব্যর্থ করে দিলেন। রাজা গোপালাচারীর আনীত বয়কট আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটি বিপুল ভোটে গৃহীত হয়। প্রতিবাদস্বরূপ চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন।

চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু এবং হাকিম আজমল খান কংগ্রেসের মধ্যে 'কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ দল' গঠন করেন। স্বরাজ্য দল নামেই তা ব্যাপকভাবে পরিচিত। স্বরাজ্য দল জন্ম নেওয়ার কারণ কী ছিল? চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খান প্রমুখ যখন কাউন্সিলের রাজনীতিতে ফিরে যেতে আগ্রহী, গান্ধীবাদীরা তখন রাজি না হলে আইনসভার আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে কংগ্রেসিরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যান। ধনীদের স্বার্থ রক্ষাকারী স্বরাজ্য দল গঠিত হয়। সংখ্যালঘু হলেও স্বরাজ্য দলের নেতারা কংগ্রেসের প্রভাবশালী অংশ ছিলেন। কারণ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় কয়েকজন নেতা স্বরাজ্য দল গঠন করেন। সংস্কারপন্থীদের কাউন্সিলের রাজনীতির বিপক্ষে যাঁরা গান্ধীর পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন, তাঁরা কিন্তু কংগ্রেস স্বরাজ্য দলের আইনসভায় প্রবেশের বিকল্প কোনো কর্মসূচি দিতে পারলেন না। মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং হাকিম আজমল খানের নেতৃত্বে গঠিত স্বরাজ্য দল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বরাজ লাভকেই রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। ভারতের ভদ্রলোক শ্রেণি এবং ভূস্বামীর স্বার্থের সম্যকরূপ প্রতিফলন ঘটেছিল স্বরাজ্য দলের কর্মসূচিতে। গান্ধীর মূল লক্ষ্যের সঙ্গে এই দলের বিশ্বাসের খুব একটা পার্থক্য ছিল না। স্বরাজ্য দলকে ঘিরে কংগ্রেস সংস্কারপন্থী এবং সংস্কারবিরোধী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

গান্ধী তখন কারাগারে থাকলেও আবুল কালাম আজাদ ১৯২৩ সালে মুক্তি লাভ করেন। তিনি দুই দলের মধ্যে একটা সমঝোতা করার চেষ্টা চালান। সেই বছরের

সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে দিল্লিতে। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে আজাদকে অধিবেশনের সভাপতিত্ব করতে বলা হয় এবং তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম করার পরিবর্তে কংগ্রেস সদস্যরা তখন নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে শক্তি ক্ষয় করছে। দাশ, মতিলাল, আজমল খান পরিবর্তনকামীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অন্যদিকে রাজা গোপালাচারী, সর্দার প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিবর্তনবিরোধীদের মুখপাত্র। দুই দলের মধ্যে আজাদ একটি সমন্বয় সাধন করেন। দিল্লি সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হলো নিজেদের মধ্যে বিরোধ না করে পরিবর্তনকামী এবং পরিবর্তনবিরোধীরা নিজ নিজ কর্মসূচি অনুসরণ করবেন।[২৬] স্বরাজ্য দলের নেতাদের সঙ্গে পূর্বের বিরোধী নেতাদের মধ্যে সমঝোতা হয় যে নতুন শাসন সংস্কার আইনে যাঁরা আইনসভার নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের বিরুদ্ধে নীতিগত আপত্তি প্রত্যাহার করা হলো। প্রবল জনসমর্থন ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে স্বরাজ্য দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। স্বরাজ্য দলের নির্বাচনী জয় ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করল। স্বরাজ্য দলের সাফল্য যদিও সব প্রদেশে সমান হয়নি, কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দলের ৪৮ জন সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় এই দল সর্ববৃহৎ একক দলরূপে স্বীকৃত হয়, কিন্তু স্বরাজ্য দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় এই দল স্বতন্ত্র সদস্যদের সঙ্গে কর্মসূচিভিত্তিক সমঝোতা করে।[২৭]

স্বরাজ্য দল সরকারের ক্ষমতার ভাগ চাইছিল এবং স্বরাজ লাভের কথা বলছিল। স্বরাজ্য দল সে কারণেই পরবর্তী বছরে কংগ্রেস সংগঠনে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। সে জন্য দেখা যায়, ১৯২৩ সালে দিল্লির বিশেষ অধিবেশনে স্বরাজ্য দল খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আজাদ স্বীকার করেছেন, ১৯২৩ সালের পর কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপ প্রধানত স্বরাজ্য দলের হাতে ছিল। স্বরাজ্য দল সংসদের ভেতর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল, যাঁরা স্বরাজ্য দলের বাইরে ছিলেন, সেই কংগ্রেসিরা গঠনমূলক কর্মসূচি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁরা স্বরাজ্য দলের মতো জনসমর্থন ও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেননি।[২৮] জওহরলাল লিখেছেন, স্বরাজ্য দলের সূচনা মন্দ হলো না। কিন্তু স্বরাজ্য দলের সূচনাতেই তার মধ্যে দুর্বলতার বীজ প্রবেশ করল। ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভায় কাজ করতে গিয়ে অন্যের সঙ্গে এবং নরমপন্থীদের সঙ্গে প্রতিদিনই আপস করতে হয় এবং এ অবস্থার মধ্যে অভিযানের দৃঢ়সংকল্প কিংবা সুনির্দিষ্ট নীতি বেশি দিন টিকতে পারে না। ফলে স্বরাজ্য দলের উচ্চ কণ্ঠস্বর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। কেউ কেউ খসে পড়ে অন্য দলে যোগ দিতে লাগলেন। উত্তর ভারতে ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্য এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল।[২৯]

স্বাস্থ্যগত কারণে গান্ধী ১৯২৪ সালের প্রথম দিকে কারাগার থেকে মুক্তি পান। ছয় বছরের জায়গায় তিনি দুই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য বোম্বের জুহু সমুদ্রসৈকতের কাছে অবস্থান করছিলেন। মতিলাল নেহরু ও জওহরলাল নেহরু গান্ধীর সঙ্গে আলাপ করতে কিছুদিনের জন্য জুহু চলে যান। মতিলাল স্বরাজ্য দলের পরিকল্পনা বুঝিয়ে গান্ধীকে স্বমতে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি আশা করেছিলেন, গান্ধী সাহায্য না করলেও নিরপেক্ষ থাকবেন। কিন্তু গান্ধী নিরপেক্ষ থাকলেন না। স্বরাজ্য দলের দিক থেকে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনায় কোনোই লাভ হলো না। গান্ধী নিজ মতে অটল রইলেন। দুই পক্ষই পরস্পরের সম্মতি নিয়ে ভিন্নমত অবলম্বন করলেন এবং সেই অনুসারে পত্রপত্রিকায় বিবৃতি বের হলো।[৩০] গান্ধীর কাছে জওহরলাল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চাইলেন। গান্ধী স্পষ্ট করে কিছুই বললেন না। জওহরলাল লিখেছেন, 'তিনি আমার একটি সংশয়ও মীমাংসা করে দিলেন না। ফলে আমিও কিছুটা নিরাশ হয়ে জুহু থেকে ফিরে এলাম। তিনি স্বভাবতই অনেক দূর ভবিষ্যৎ দেখতে চান না এবং দীর্ঘকালব্যাপী কোনো কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট করতে চান না। তাঁর মতে আমাদের ধৈর্যসহকারে জনসেবা করে যেতে হবে, কংগ্রেসের গঠনমূলক ও সমাজসংস্কারমূলক কাজ চালাতে হবে এবং সংগ্রামশীল কাজের জন্য শুভ দিনের অপেক্ষা করতে হবে।' জওহরলাল লিখেছেন, ধরা যাক শুভ দিন এল, কিন্তু গান্ধী যেভাবে চৌরিচৌরা গ্রামের ঘটনার জন্য খিলাফত আর অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছিলেন, নতুন করে শুভ দিন আসার পর পুনরায় তো তেমন ঘটনা ঘটতে পারে। যদি গান্ধী তখন আবার সেই একই কারণে আন্দোলন বন্ধ করে দেন, নিশ্চয় তখন সবার সমস্ত প্রত্যাশা আবার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। গান্ধীকেই এই প্রশ্ন করেছিলেন জওহরলাল, গান্ধী তার কোনো নিশ্চিত উত্তর দেননি।[৩১]

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় গান্ধীর সঙ্গে স্বরাজ্য দলের নেতাদের শক্তি পরীক্ষা হয় ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি আহমেদাবাদে। গান্ধী বলেন, কংগ্রেসিদের আইনসভায় প্রবেশের সঙ্গে অসহযোগ কর্মসূচির বিরোধ রয়েছে, যদিও গান্ধী ইতিপূর্বেই অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন। সত্যি বলতে, চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর জনপ্রিয়তা গান্ধীকে ভীত করে তোলে। মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশের জনপ্রিয়তায় ভীত গান্ধী প্রস্তাব করেন, অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিকে সমর্থন না করলে সেই সব ব্যক্তির সদস্য পদ কংগ্রেস থেকে বাতিল করা হবে। মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে গান্ধীর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি গান্ধীর প্রস্তাবকে কংগ্রেসের সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করার দাবি জানান। হিংসার বিরোধী গান্ধীর মনের ভেতরেই রয়েছে মহা হিংসা। গান্ধী তাই কংগ্রেসে নিজের সম্পূর্ণ একক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে

সংবিধানবিরোধী প্রস্তাব দিতেও দ্বিধা করেন না। গান্ধীর সঙ্গে স্বরাজিদের বিরোধ উপস্থিত হয়ে কতগুলো নাটকীয় ঘটনার সূত্রপাত হলো। গান্ধী কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে কতগুলো গুরুতর পরিবর্তন আনতে চাইলেন।

কংগ্রেসের সদস্য পদ লাভের জন্য আগে নিয়ম ছিল, শান্তিপূর্ণভাবে স্বরাজ লাভে কংগ্রেসের মূলনীতি মেনে নিয়ে যে চার আনা চাঁদা দেবে, সে-ই কংগ্রেসের সদস্য পদ লাভ করবে। গান্ধী প্রস্তাব রাখেন যে কংগ্রেস সদস্যকে পূর্বের চার আনা চাঁদার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ হাতে কাটা সুতা বাধ্যতামূলকভাবে জমা দিতে হবে। গান্ধী এভাবে শক্তি প্রয়োগে তাঁর চরকা আন্দোলনকে কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত করতে চান। তিনি নিজের আশ্রমের সব নিয়মকে কংগ্রেস দলে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের বহু সদস্য সেটা পছন্দ করতে না পারলেও বা গান্ধীর সঙ্গে একমত না হলেও গান্ধীর বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পান। কিন্তু তারপরও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে। স্বরাজ্য দলের যাঁরা ছিলেন, তাঁরা প্রতিবাদ করেন। যদি গান্ধীর নিয়ম গ্রহণ করতে হয়, তাহলে কংগ্রেসের সাধারণ সভায় ভোটাভুটি হতে হবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো অধিকার ছিল না। জওহরলাল নেহরু লিখেছেন, কিন্তু নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করার বাধা উপস্থিত হলে গান্ধী কদাচিৎ নিয়মতন্ত্রকে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। নিয়মতন্ত্রের প্রতি এই আঘাতের ফলে জওহরলাল খুব মনঃক্ষুণ্ন হলেন এবং সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করার কথা ভাবলেন।[৩২]

চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরু দুজনেই গান্ধীর এই স্বেচ্ছাচারিতার কারণে অনিয়মতান্ত্রিক ভোট গ্রহণের আগে দলবল নিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে গান্ধীর এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভোট গ্রহণ করা হলো। আগের প্রভাব না থাকলেও গান্ধী তখনো দলের ভেতর অনেক নেতার কাছে ভয়াবহ পুণ্যাত্মা। ফলে অসাংবিধানিক ভোটাভুটিতে গান্ধীর জয় হলো। মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশ তখন দলবল নিয়ে সভামণ্ডপ ত্যাগ করে চলে গেছেন। জিন্নাহকে কিছুদিন আগে এভাবেই গান্ধীপূজার কারণে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল। গান্ধীর প্রস্তাব ভোটে বিজয়ী হলেও পরে ভবিষ্যতের পরিণতির কথা ভেবে আবার পরিবর্তন করা হলো। গান্ধী টের পেলেন যে তাঁর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট কমে গেছে। চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর অনমনীয়তা দেখে গান্ধী কিছুটা ভয় পেলেন। চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরুর জনপ্রিয়তা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা সম্পর্কে গান্ধী জানতেন, তাই গান্ধীর বিরুদ্ধে স্বরাজ্য দলের প্রকাশ্য বিদ্রোহকে তিনি নিজেই বেশি দূর এগোতে দিলেন না। ফলে কংগ্রেসের সদস্যদের জন্য চার আনা চাঁদা প্রদান অথবা তার পরিবর্তে হাতে কাটা সুতো দুটোর ব্যবস্থাই বলবৎ রাখা হলো।[৩৩] জওহরলাল লিখেছেন, 'তিনি কেন

কেবল হাতে কাটা সুতায় চাঁদা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তনের জন্য এত উৎসুক হয়েছিলেন, আমি কোনো দিনই তা বুঝে উঠতে পারিনি। যদিও কংগ্রেসের অধিকাংশ তাঁর পক্ষেই ছিলেন, তবু তিনি আপন সংকল্প শিথিল করলেন এবং অন্য পক্ষের সঙ্গে আপস করতে লাগলেন। তিন মাসের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে কয়েকবার তাঁর মত পরিবর্তন করলেন। তিনি যেন তখন অকূল সমুদ্রে পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন।'[৩৪]

চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গান্ধী স্বরাজ্য দলের বিদ্রোহকে কংগ্রেসের পক্ষে নিয়ে এলেন। গান্ধীর সঙ্গে স্বরাজ্য দলের যে চুক্তি হয়, তার মূল কথা হলো কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলোতে কংগ্রেসের পক্ষে স্বরাজ্য দল কাজ করে যাবে।[৩৫] ব্যাপারটা কী দাঁড়াল তবে? গান্ধী তো স্বরাজ্য দলের মতের সঙ্গেই সন্ধি করলেন। গান্ধী আসলে দলের ভেতর নিজের ক্ষমতা আন্দাজ করা ও প্রদর্শনের জন্য স্বরাজ্য দলের সঙ্গে অহেতুক বিরোধ তৈরি করেছিলেন। কংগ্রেস দলের ভেতর গান্ধীর কর্মকাণ্ডের একটি ইতিহাস হলো তাঁর নিজের কর্তৃত্ব ও ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেওয়ার ইতিহাস। কারণ, গান্ধীর সমর্থকেরা জাতীয় কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। গান্ধী দলের ভেতর কীভাবে পূজিত হতেন, তার একটি উদাহরণ জওহরলাল নেহরুর জীবনীতে পাওয়া যায়। দলের কার্যকরী সম্পাদক হিসেবে নেহরু নিয়ম চালু করেছিলেন, কোনো সদস্যের নাম লেখার সময় তার আগে বা পরে সম্ভ্রমসূচক উপাধি যোগ করা যাবে না। যথা মহাত্মা, মাওলানা, পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত ইত্যাদি। মহম্মদ আলী তখন কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি জওহরলালকে জরুরি তারবার্তা পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন যে প্রাচীন ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে। বিশেষ করে গান্ধীর নামের আগে মহাত্মা যুক্ত করতে হবে।[৩৬] মহম্মদ আলীও পরে কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ান মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় কংগ্রেসের উদাসীনতা দেখে।

স্বরাজ্য দল গঠিত হওয়া, খামখেয়ালিভাবে অসহযোগ বন্ধ করে দেওয়া—এই সব কারণে গান্ধীর প্রভাব-প্রতিপত্তি কংগ্রেসে এবং জাতীয় ক্ষেত্রে তখন অনেকটাই হ্রাস পায়। গান্ধী অসহযোগ বন্ধ করার পরই ইংরেজ সরকার ১৯২২ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করার সাহস দেখায়। সার্বিকভাবে তখন গান্ধীর জনপ্রিয়তা কমে গেছে। জওহরলাল স্বীকার করেন যে এই সময় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে গান্ধীর জনপ্রিয়তা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছিল। এগিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে যাঁরা তাঁর অনুগমন করেন, যখন অনিবার্যভাবে প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাঁরা হয়ে ওঠেন সমালোচক।[৩৭] যশোবন্ত সিংহ দেখাচ্ছেন যে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধী যখন সাম্প্রদায়িক বিভেদ নিষ্পত্তির জন্য লাহোরে গেলেন, সে সময়ে পাঞ্জাবের নাগরিকেরা, এমনকি হিন্দুরা পর্যন্ত গান্ধীর আবেদনে সামান্য সাড়া দিলেন না, মহাত্মা হিসেবে তখনো তিনি ভারতের রাজনৈতিক আকাশে মহানক্ষত্র।[৩৮] জিন্নাহ কিন্তু এই সময়ে গান্ধীকে

যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। তিনি পুরোনো ঘটনার কারণে গান্ধীর প্রতি সামান্য বিদ্বেষ পোষণ করেননি। তিনি গান্ধীর এই কম সাফল্যের দিনেই তাঁকে আবার মহাত্মা বলে সম্বোধন করেন। জিন্নাহ মনে করতেন, তিনি আর গান্ধী মিলে চাইলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করা যাবে এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একসঙ্গে কাজ করতে পারবে।

দুই.

খিলাফতের সাময়িক সংগ্রামের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে মুসলিম লীগও তখন প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশন বাতিল করে দিতে হয় সঠিকসংখ্যক সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে। অন্যদিকে ১৯২৩ সালে জিন্নাহ বোম্বাই মুসলিম আসনের নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনর্নির্বাচিত হন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে পদত্যাগের পর এই তাঁর পুনরায় সংসদীয় কার্যকলাপে যোগদান করা।[৩৯] তিনি আইনসভার ভেতরে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা থেকে একটি দল গঠনের কথা ভাবতে থাকেন। ১৯২৪ সালের শেষার্ধে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদের নিয়ে 'ইনডিপেনডেন্ট পার্টি' নামে জাতীয়তাবাদীদের এক নতুন গোষ্ঠীর জন্ম হয় এবং জিন্নাহ তাঁর নেতা নির্বাচিত হন। ভারতের সব প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতার কাছে জিন্নাহর গ্রহণযোগ্যতা এ থেকেই প্রমাণিত হয়।[৪০] জিন্নাহ-মতিলাল-নেহরু আঁতাতে গঠিত ওই দলের উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে আরও ছিলেন পণ্ডিত মালব্য, বিপিনচন্দ্র পাল, পুরুষোত্তম দাস, ক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগী প্রমুখ। ভাইসরয় লর্ড রিডিং কৌশলে জিন্নাহ-নেহরু জোট ভেঙে দেওয়ার জন্য জিন্নাহকে নাইটহুড উপাধি প্রদানের প্রস্তাব দিয়ে বশীভূত করার চেষ্টা করেন। জিন্নাহ সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'জিন্নাহ নামের আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই বাঁচতে চাই এবং সাধারণ মানুষ হিসেবে মরতে চাই।'[৪১]

জিন্নাহ ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে নানা পথে হাঁটতে থাকলেন। কিন্তু তাঁর কাছে তখনো গুরুত্বপূর্ণ হলো হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। ১৯২৪ সালের ২৫ মে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে জিন্নাহ সভাপতিত্ব করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে পরবর্তী তিন বছরের জন্য মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি অসহযোগ আন্দোলন-উত্তর কংগ্রেসের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলার জন্য লীগের সভাপতিরূপে চাইলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য লক্ষ্ণৌ চুক্তিকে আবার কাজে লাগাতে। সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে জিন্নাহ বলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য হবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মাধ্যমে যথোপযুক্ত সময়ে ১৯১৬ সালের মতোই পুনরায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্ব

এবং বোঝাপড়া প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, 'আমি যত দূর বুঝেছি, লিগ কোনোমতেই এমন কোনো নীতি বা কর্মসূচি গ্রহণ করবে না, যা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিন্দুমাত্র বিরোধী হতে পারে।...পক্ষান্তরে আমার বিশ্বাস, লিগ এমন পন্থা অনুসরণ করবে, যা জাতীয় স্বার্থের পরিপুষ্টির অনুকূল হয়, যদিও এর জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ স্বার্থের কথা বিস্মৃত হওয়া চলবে না।' খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন, 'গত তিন বৎসরের যুদ্ধের পরিণামে আমরা অবশ্য ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রাপ্তির অনুকূলে এক প্রকাশ্য আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছি।[৪২]

জিন্নাহর ওপরের বক্তব্যে তাঁর গণতান্ত্রিক মানসিকতা এবং উদারতা টের পাওয়া যায়। তিনি মুসলিম লীগ সম্পর্কে যখন বলছেন, তিনি প্রমাণ করছেন না মুসলিম লীগের সব ক্ষমতা তাঁর হাতে। তিনি কখনোই মুসলিম লীগের অন্য সদস্যদের মত না নিয়ে নিজে একক সিদ্ধান্ত দেননি। তিনি সে জন্যই বলেন, যত দূর আমি বুঝতে পেরেছি, মুসলিম লীগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাবে না এবং হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য চাইবে। তিনি গান্ধীর খিলাফত আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও উদার দৃষ্টিতে এই কথা স্বীকার করেন, সরকারের সঙ্গে জনগণের তিন বছরের যুদ্ধে বা লড়াইয়ে এটা বোঝা যাচ্ছে, জনগণ স্বরাজ প্রাপ্তির অনুকূলে রয়েছে এবং তার জন্যই সংগ্রাম করেছে। জনগণের মূল সংগ্রামটা ছিল স্বরাজ লাভের জন্য, নিজেদের ভাগ্য পাল্টানোর জন্য—ধর্মের জন্য নয়, জিন্নাহর দৃষ্টিতে তা এড়ায়নি। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ হিসেবে খিলাফত আন্দোলন পছন্দ না করলেও জনগণের আন্দোলন বা লড়াইকে তিনি সম্মানের দৃষ্টিতেই দেখেছেন। তিনি জনগণের লড়াই সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেননি। গান্ধীর চেয়ে অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে জিন্নাহর মূল্যায়ন অনেক বেশি স্বচ্ছ। গান্ধী জনগণের হিংসাত্মক আন্দোলনকে নিন্দা করেছেন, কৃষকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে বিরক্ত হয়েছেন, মাঝপথে তিনি আন্দোলন বন্ধ করেছেন।

জিন্নাহ কংগ্রেস থেকে সরে এলেও ক্ষুব্ধ মুসলমানদের সুরে সুর মেলাননি। জিন্নাহ ১৯২৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং সভাপতির ভাষণে তিনি স্পষ্ট করেই বললেন, 'স্বরাজ অর্জনের এক অপরিহার্য শর্ত হলো হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য। আমি বলতে চাই যে যেদিন হিন্দু-মুসলমান মিলিত হবে, সেদিনই ভারতবর্ষে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লোপ পাবে।' গান্ধী *ইয়ং ইন্ডিয়া* পত্রিকায় ১৯২৪ সালের ২৯ মে প্রকাশিত দীর্ঘ নিবন্ধে জিন্নাহর এই বক্তব্যের সঙ্গে নিজে একমত বলে উল্লেখ করে লেখেন, 'হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নই হচ্ছে আমার কাছে একমাত্র সমস্যা, অবিলম্বে তার সমাধান হওয়া প্রয়োজন। জিন্নাহ সাহেবের সঙ্গে আমি একমত যে,

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যই হচ্ছে স্বরাজ। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী ও আন্তরিক ঐক্য না এলে এই দুর্ভাগা দেশে কোনো কিছু করার আমি উপায় দেখি না। অবিলম্বে এই ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব—এ কথা আমি বিশ্বাস করি।'[৪৩] কিন্তু পুরো প্রবন্ধে তিনি আর যা লিখেছেন, তাতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য হওয়ার কোনোই কারণ ছিল না।

মুসলমান বা পিছিয়ে পড়াদের জন্য গান্ধী চাকরি বা কিছুই সংরক্ষণ করতে রাজি নন। তিনি বলেন, সবকিছু হতে হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে। তিনি লিখেছেন, 'সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে যদি সাম্প্রদায়িক মনোভাব আমদানি করা যায়, তবে তা মারাত্মক হয়ে উঠবে। শাসনকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হলে যোগ্যতমের ওপরেই এই ভারার্পণ করা কর্তব্য। কিছুতেই এ ব্যাপারে পক্ষপাত দেখানো চলবে না। পাঁচজন প্রকৌশলী নিয়োগকালে সব সম্প্রদায় থেকে একেকজন নিলে চলবে না। যোগ্যতম যে পাঁচজন, তাঁরা সবাই মুসলমান বা পারসি যা-ই হোক না কেন, তাঁদেরই নিতে হবে। প্রয়োজন হলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত কোনো নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদেরই নিম্নতম পদগুলোতে নিয়োগ করা হবে। জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক হারে কোনোক্রমেই চাকরির বাঁটোয়ারা হওয়া উচিত নয়।'[৪৪] গান্ধীর এই বক্তব্য মেনে নিতে হলে দেখা যাবে, বহু বছর ধরে সুবিধা পাওয়া শুধু বর্ণহিন্দুরাই সব পদ দখল করে রাখবে। পশ্চাৎপদ মুসলমান বা নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তা লাভ করতে পারবে না। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, গান্ধী ও কংগ্রেসের বহু নেতার এ ধরনের মানসিকতার কারণেই ভারত ভাগ হয়েছে।

গান্ধীর এই বক্তব্যের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন একমত হননি। বাংলা প্রদেশে তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যর কথা ভেবে ঠিক করেছিলেন, মুসলমানরা যত দিন না চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের সমান হচ্ছে, তত দিন তাদের জন্য আসনগুলো সংরক্ষিত থাকবে। বাংলায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। কিন্তু নানা কারণে তারা শিক্ষাগত এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে ছিল। যদিও তারা ছিল সংখ্যায় ৫০ শতাংশের বেশি, তথাপি সরকারি চাকরির ৩০ শতাংশ পদও তাদের অধিকারে ছিল না। দাশ দেখলেন, সমস্যাটা আসলে অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক নয়। তিনি অনুধাবন করলেন, মুসলমানদের তাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যতক্ষণ না আবশ্যকীয় নিশ্চয়তা প্রদান করা যাচ্ছে, ততক্ষণ কংগ্রেসে তাদের আন্তরিক অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করা অসম্ভব। তিনি তাই একটি ঘোষণা প্রদান করলেন, যা শুধু বাংলা নয়, পুরো ভারতকে বিস্মিত করল। তিনি ঘোষণা করলেন যে কংগ্রেস বাংলার ক্ষমতায় এলে জনসংখ্যা অনুযায়ী যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না হওয়া পর্যন্ত সব নতুন নিয়োগের ৬০ শতাংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কলকাতা করপোরেশনের বেলায়

তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, অনুরূপ শর্তে ৮০ শতাংশ নতুন নিয়োগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তিনি উল্লেখ করলেন যে যত দিন না মুসলমানরা জনজীবন ও চাকরিতে যথাযথ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাবে, তত দিন পর্যন্ত বাংলায় সত্যিকারের গণতন্ত্র আসবে না।

কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি আজাদ লিখেছেন, কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই এই ঘোষণার প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন এবং দাশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হলো। বহুজন তাঁকে সুবিধাবাদী এবং মুসলমানদের পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন। কিন্তু তিনি প্রস্তরবৎ দৃঢ় রইলেন। সমগ্র প্রদেশ ভ্রমণ করে তিনি সমানভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর উদ্দেশ্যের শক্তিমত্তা ও আন্তরিকতা শেষ পর্যন্ত বাংলার কংগ্রেসকে তাঁর মত গ্রহণে বাধ্য করল। তাঁর মনোভাব বাংলার অভ্যন্তরে এবং বাংলার বাইরে মুসলমানদের দারুণভাবে প্রভাবিত করল।[৪৫] বাংলার মানুষ যে সাম্প্রদায়িক ছিল না, এ ঘটনা তা প্রমাণ করে। বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বেশির ভাগ ভোটার ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের, কিন্তু তারপরও চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। বাংলার বেশির ভাগ মানুষ, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ মানুষ যে অসাম্প্রদায়িক ছিল, এই ঘটনাই কি তা প্রমাণ করে না? প্রশ্নটি হচ্ছে নেতার যোগ্যতা এবং আন্তরিকতার প্রশ্ন। দাশ বাংলার মুসলমানদের সব আশঙ্কা এবং অনুভূতিকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁদের নেতার স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু গান্ধী মুসলমানদের বিপুল জনপ্রিয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও বেশি দিন নেতা থাকতে পারলেন না তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। মুসলমানদের বাস্তব অবস্থাটা না বুঝে তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য চাইছিলেন।

বাংলার সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে চিত্তরঞ্জন দাশ যেভাবে কাজ করেছিলেন, তা স্মরণযোগ্য। তিনি কথায় নয়, কাজে সেটা প্রমাণ করছিলেন। *ইয়ং ইন্ডিয়া* পত্রিকায় গান্ধীর আগের লেখাটিতে প্রচ্ছন্নভাবে দাশের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করা হয়েছে। গান্ধী সব ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা বা যোগ্যতার যে প্রশ্নটি তুলেছেন, যুক্তিসংগত মনে হলেও তা বাস্তব নয়।[৪৬] দাশ তা প্রমাণ করেছেন। প্রথমত, পিছিয়ে পড়া মানুষরা যেমন বাস্তব কারণেই একদিকে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না, ঠিক তেমনি প্রতিযোগিতায় ভালো করলেও যাঁরা ইতিমধ্যেই ক্ষমতায় বসে রয়েছেন, তাঁদের সমর্থন লাভ করবেন না। দাশ পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের সমস্যাটাকে দেখেছেন অর্থনৈতিকভাবে আর গান্ধী ব্যাখ্যা করেছেন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়ে। গান্ধী সম্পূর্ণ লেখাটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের দয়ার ওপর বা অনুগ্রহের ওপর সংখ্যালঘুদের ছেড়ে দিচ্ছেন। পিছিয়ে পড়া মানুষদের ভাগ্য পাল্টানোর ব্যাপারে তিনি সব আবেগধর্মী কথা বলেছেন। শ্যামাপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 'বস্তুত গান্ধীজি তাঁর লেখায় হিন্দু-

মুসলমান দ্বন্দ্বের কোনো সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় যাননি।'[৪৭] বাংলা এবং ভারতের দুর্ভাগ্য হলো ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন প্রয়াত হলেন। চিত্তরঞ্জনের ভক্ত কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ লিখছেন, দুঃখের বিষয় এই যে দাশের মৃত্যুর পর তাঁর কতিপয় অনুসারী তাঁর পদের অবমাননা করে বসেন এবং তাঁর ঘোষণাকে বর্জন করেন। ফলে বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে সরে গিয়েছিল এবং দেশবিভাগের প্রথম বীজটি রোপিত হয়েছিল।[৪৮]

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য নিয়ে উল্লেখ্য গান্ধীর ছয় হাজার শব্দের প্রবন্ধ তখনকার বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। সারা বিশ্বই পশ্চাৎপদদের জন্য সংরক্ষণ প্রথাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, যা গান্ধী মানতে রাজি ছিলেন না। সে সময়ে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল—যাদের দাবি ছিল চাকরিতে সংরক্ষণ।[৪৯] গান্ধী তাদের সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছেন। কিন্তু তাদের অবজ্ঞা করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য কেমন করে সম্ভব হতো? গান্ধীর চিন্তাকে সমর্থন করতেন জওহরলাল নেহরু। জওহরলাল নেহরু লিখেছেন, যেকোনো সাম্প্রদায়িক দল হতে যেকোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক দাবি-দাওয়া করা হয়েছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটা কেবল চাকরির দাবিমাত্র এবং এই চাকরিগুলো মুষ্টিমেয় উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণি ছাড়া আর কারও ভাগ্যে জুটতে পারে না। অবশ্য আইন সভাগুলোতে বিশেষ আসনের দাবিও ছিল। এই দাবির মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অপেক্ষা সাম্প্রদায়িকভাবে চাকরি বণ্টনের ক্ষমতা লাভের আগ্রহই বেশি ছিল।[৫০] সুবিধাভোগী বর্ণহিন্দু হিসেবে নেহরুর পক্ষে ধারণা করা সম্ভব ছিল না, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কাছে চাকরিটা এত বড় ব্যাপার কেন? সব সংগ্রামের মূল লক্ষ্য হলো জীবনসংগ্রাম—ভালোভাবে বেঁচে থাকা। সেখানে চাকরি লাভ হলো উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনা।

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ প্রধানত ছিল সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তের স্বার্থ রক্ষাকারী সংগঠন। বহুদিন পর্যন্ত দুটিই ছিল সরকারের সমর্থক দল। দুই দলেরই উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ সরকারকে টিকিয়ে রেখে কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ। যখন কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ কিছুটা সরকারবিরোধিতার পথ ধরল, সেটাও ছিল ইংরেজ সরকারের জায়গায় জমিদার আর ধনিকদের স্বার্থ রক্ষা করা। স্বভাবতই কংগ্রেস যেমন এই আন্দোলন থেকে আরও বেশি পেতে চাইবে, মুসলিম লীগ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সেটাই আশা করবে। কিন্তু এই সত্য সবার আগে বুঝতে হবে, পিছিয়ে পড়া মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা, পিছিয়ে থাকা শিখরা নিজেদের ভাগ্য পাল্টাতে চাইবেন। মুসলিম লীগ গঠিতই হয়েছে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের ভাগ্য পাল্টানোর জন্য। মুসলমানদের সমর্থন পেতে গেলে তাই পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের সুযোগ-সুবিধা দিয়েই সেটা লাভ করতে হবে।

বর্ণহিন্দুরা সমাজে মুসলমানদের বহুগুণ এগিয়ে ছিল, ফলে পিছিয়ে পড়া মানুষের যন্ত্রণার ভাগীদার না হলে দুই পক্ষের ঐক্য কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না। কংগ্রেস বা কংগ্রেসের কতিপয় নেতা সেটা বুঝতে চাননি বলেই ভারত ভাগ হয়েছে।

লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ স্থির করে, প্রতিষ্ঠানটি স্বরাজের জন্য প্রয়াস চালাবে। বলা হলো, ভারতীয় মুসলমানদের জন্য 'পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা' বজায় থাকবে। কারণ যৌথ নির্বাচনব্যবস্থা বিবাদ ও অনৈকের কারণ। কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ আলী তখন মুসলিম লীগ এবং তার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। মহম্মদ আলীর বিরূপ সমালোচনার উত্তরে সংযত ভাষায় জিন্নাহ বলেন, 'সবাই ভালোভাবে জানেন যে আমি পৃথক নির্বাচন প্রথা ও সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থার দলে নই। কিন্তু এ ব্যাপারে মুসলিম জনমত এমন প্রবল যে আমাদের হয়তো অন্তত সাময়িকভাবে একে অপরিবর্তনীয় সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হবে। এর ভিত্তিতে মুসলমানরা যেখানে সংখ্যালঘু, সেখানে তাদের যথেষ্ট এবং কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে। আমি তাই আশা করি, হিন্দু ভাইরা আমাকে ভুল বুঝবেন না। কারণ আজও আমি যথেষ্ট পোড়-খাওয়া জাতীয়তাবাদী। কিন্তু মুসলিমদের যদি সংগঠিত করতেই হয়, তাহলে শুধু জাতীয় অগ্রগতির বা স্বার্থের বিনিময়ে হবে না। পক্ষান্তরে এ হবে তাদের অন্যান্য ভারতবাসীর সমপর্যায়ে আনার উদ্দেশ্যে।' জিন্নাহ স্পষ্ট করেই বলে দেন যে শুধু পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের হিন্দুদের সমকক্ষ করে আনার জন্যই মুসলিম লীগ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সিদ্ধান্ত জিন্নাহর একার নয়, মুসলিম লীগের অধিকাংশ সদস্যদের। জিন্নাহ একা তার বিরুদ্ধে যেতে পারেন না। মুসলিম লীগের পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা চাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে সে কারণেই পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা মেনে নেওয়া হয়েছিল। ভারতবর্ষে তখন সব নাগরিকের ভোটাধিকার ছিল না। সরকার যেভাবে নির্বাচকমণ্ডলী ঠিক করেছিল, তাতে হিন্দুরাই বেশি ভোটার ছিলেন। বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু সেখানে আসন সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছিল কেন? কারণ, ভোটাররা সেখানকার বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। ফলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কিছু লাভ ছিল না।

লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ জিন্নাহকে সভাপতি করে অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে ভবিষ্যৎ ভারতের সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি পর্ষদ গঠন করেন। মূলত এটা ছিল জিন্নাহর উদ্যোগ। লিগ এ ব্যাপারে কংগ্রেসের পরামর্শ চেয়েছিল, কিন্তু তারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়নি। জিন্নাহ বেলগ্রামে কংগ্রেস ও লীগের যে ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশন বসবে, সেটাকে দুই দলের যৌথ অধিবেশন করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু সেটিও নাকচ হয়ে যায়। যশোবন্ত সিংহ লিখেছেন, কংগ্রেসের অন্তর্নিহিত ধারণা পাল্টাতে জিন্নাহ আবারও ব্যর্থ হলেন।[৫১] লীগের

কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য কংগ্রেসের এই উদ্ধত আচরণে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে একই জায়গায় লীগের অধিবেশন করতেও তাঁদের আপত্তি ছিল। কংগ্রেস এবং লীগের সম্পর্ক তখন বেশ খারাপ, তবু জিন্নাহ আর স্বরাজিরা একটা বোঝাপড়া চাইছিলেন। মতিলাল নেহরু যখন জানতে পারলেন, মুসলিম লীগ তাদের অধিবেশন বেলগ্রামে না করে বোম্বেতে করবে, তখন তিনি জিন্নাহকে অনুরোধ জানালেন, অধিবেশন বেলগাঁওয়ে স্থানান্তর করা হোক। জিন্নাহ বললেন, সেটা আর সম্ভব নয়, কারণ, হাতে সময় নেই। কিন্তু তিনি লীগের অধিবেশন কয়েক দিন পিছিয়ে দিলেন, যাতে কংগ্রেসের অধিবেশনে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা অংশ নিতে পারেন। ডিসেম্বর মাসে বেলগ্রামে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হলো, গান্ধী ছিলেন তার সভাপতি। জওহরলাল মহা ক্ষমতাধর গান্ধী সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, তিনি অনেক বছর ধরে কার্যত কংগ্রেসের স্থায়ী মহাসভাপতি হয়েই আছেন। জওহরলাল আরও জানান, সভাপতির অভিভাষণ তাঁর মোটেই ভালো লাগেনি। সভাপতির ভাষণে প্রেরণা পাওয়ার মতো কিছুই ছিল না।[৫২]

যশোবন্ত সিংহসহ বহুজনই দেখাচ্ছেন যে জিন্নাহ হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন। কিন্তু কংগ্রেসের উগ্রতার জন্যই তা করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন ঘটনা তা-ই প্রমাণ করবে। নিঃসন্দেহে গান্ধীর রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার একটি বড় অংশজুড়ে ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। স্বরাজিদের বাদ দিলে কংগ্রেসিদের মধ্যে তিনিই সব থেকে এই বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। সে জন্যই তিনি খিলাফত আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান। যশোবন্ত সিংহ লিখেছেন, যদি পেছনে ফিরে তাকানো হয়, তাহলে দেখা যাবে গান্ধীর পথটি যথাযথ ছিল না। খিলাফতকে সমর্থন দিতে গিয়ে ভালোর চেয়ে মন্দ হয়েছে বেশি। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন, খিলাফতকে সমর্থন দিলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথটি প্রশস্ত হবে। তিনি মনে করেছিলেন, হিন্দুদের খিলাফতকে সমর্থন যদি মুসলিমদের আবেগের ক্ষতে প্রলেপ দেয়, নিশ্চিতভাবেই ব্রিটিশের বিরোধিতায় হিন্দু-মুসলিম মিলিত সংগ্রাম আরও জোরদার হবে।[৫৩] গান্ধীর এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবসম্মত ছিল না। জিন্নাহ একইভাবে চাইতেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য। তিনি সে জন্য লক্ষ্ণৌ চুক্তি করেছিলেন। গান্ধী লক্ষ্ণৌ চুক্তিকে সমর্থন দেননি বা ভালোভাবে নেননি। তিনি বলেছিলেন, এটা হচ্ছে ধনী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। গান্ধী এটা ভেবে দেখেননি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিটা সমাজের ওপরতলায় তৈরি করা গেলে নিচের তলায় সমস্যা থাকে না। কারণ মূল বিভেদটা ওপরতলার ভদ্রলোকদের মধ্যে তৈরি হয় আর সেটা নিচের দিকে নেমে যায়।

মূলত গান্ধী যে লক্ষ্ণৌ চুক্তিকে সমর্থন করতে পারেননি, তার কারণ গান্ধীর হীনম্মন্যতা। কারণ এই চুক্তি যখন হয়, গান্ধী তাতে যুক্ত ছিলেন না, এমনকি তিনি

কংগ্রেসের তখন কেউ নন। গান্ধী কংগ্রেসে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন, সম্পূর্ণভাবে তার অহিংস আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ ভারতের মতো বিরাট ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি সামান্য সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। সরকারি পদের প্রতি লোভ ছিল না। মন্ত্রী হতে চাননি। তিনি চেয়েছেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চেয়ে তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। গান্ধীর সঙ্গে সে কারণেই চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরুর বিরোধ বাধে। বারবার বিরোধ বাধে জিন্নাহর। গান্ধী যেভাবে সামান্যতম সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, জিন্নাহও ছিলেন না। কিন্তু গান্ধী হিন্দু ছিলেন, ধার্মিক ছিলেন—জিন্নাহ তা-ও ছিলেন না। গান্ধী রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন, গোমাতাকে রক্ষার কথা বলতেন—জিন্নাহ কখনো ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন না। জিন্নাহ তাই অনেক খোলা মনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে কংগ্রেস মুসলিম লীগের মিলিত বা সমন্বিত উদ্যোগ চাইতেন। তিনি বারবার তা প্রমাণ করেছেন।

জিন্নাহ ১৯২৪ সালে লিগ নেতৃত্বের একাংশের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বোম্বের লিগ অধিবেশনে কংগ্রেসের বহু হিন্দু নেতাদের আমন্ত্রণ জানান এবং লিগ প্রতিনিধিদের সামনে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করার সুযোগ দেন। যশোবন্ত সিংহ লিখেছেন, ঠিক এই সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতো। কিন্তু বাধা এসেছিল আরও আগেই, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের হিন্দুদের কাছ থেকে। পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় ক্রমশ জাতীয় নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। মালব্য, চিন্তামনি ও লাজপত রায়ের কাছে তখন 'হিন্দুদের বিপদ' কথাটি বেশি গুরুত্ব পেল। তিনি মুসলমানদের নিরঙ্কুশ অধিকারের দাবির সমালোচনা করে দুই বছরের মধ্যে তেরোটি প্রবন্ধ লিখলেন। মুসলিম লীগের জন্য সদস্য জোগাড় করছে বলে তিনি জিন্নাহর নিন্দা করলেন। বিরোধিতা করলেন সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচনের। লালা লাজপত রায় লিখলেন, সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী একবার তৈরি হলে আর কখনো তাকে বিদায় করা যাবে না। বিদায় দিতে গেলে গৃহযুদ্ধ বাধবে। সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী মেনে নিলে ভারতবর্ষ দুভাগে ভাগ হয়ে যাবে: হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারত। তিনি আবার নিজে এরপরই লিখলেন, পাঞ্জাবি মুসলমানরা যেহেতু সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিশেষ সুবিধা দিতে রাজি নয়, সুতরাং পাঞ্জাবকে ভাগ করাই শ্রেয়। দরকার হলে বাংলাকেও ভাগ করতে হবে এবং স্বশাসিত হিন্দু-মুসলিমদের নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি সব প্রদেশের বিশিষ্ট হিন্দুদের কাছে প্রেরিত প্রতিবেদনে লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে সম্মতি দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের নিন্দা করলেন এবং হিন্দু মহাসভাকে নিজেদের রাজনৈতিক মুখপাত্র করার জন্য আবেদন জানালেন। বেলগ্রাম কংগ্রেস অধিবেশনে

এই আবেদনে রীতিমতো সাড়া মিলল। সেখানেই কংগ্রেসের মধ্যে প্রথম হিন্দু মহাসভার কর্মকাণ্ডের একটা রাজনৈতিক চরিত্র প্রকট হলো। সাম্প্রদায়িক অভিমত প্রকাশ করার জন্য একটি পর্ষদও তাঁরা গঠন করলেন।[৫৪]

পাঞ্জাব আর ভারত ভাগের কথাটি তাহলে প্রথম কারা উচ্চারণ করেছিল? ভারত বা পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের ২৩ বছর আগে হিন্দু মহাসভা তা করেছিল। হিন্দু মহাসভার প্রভাব তখন প্রচণ্ডভাবে কংগ্রেসকে গ্রাস করে রেখেছিল। গান্ধী বেলগ্রাম সভার সভাপতি হিসেবে হিন্দু মহাসভার পাঞ্জাব আর বাংলা ভাগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কী ভূমিকা রেখেছিলেন? কিছুই না। জিন্নাহ কিন্তু বিরোধে না জড়িয়ে এই ঘটনার কয়েক দিন পরই মুসলিম লীগের অধিবেশনে কংগ্রেসের নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গান্ধীর সভাপতিত্বে ১৯২৫ সালের ২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন জিন্নাহ। কিন্তু তত দিনে হিন্দু মহাসভার প্রভাবে লক্ষ্ণৌ চুক্তির ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হয়ে গেছে। বিস্তর ভুল-বোঝাবুঝির জন্য সেগুলোর সমাধানকল্পে সম্মেলন এক মাস স্থগিত রাখা হলো। কিন্তু ধারণা করা গেল, হিন্দু মহাসভার কারণে সমস্যার সমাধান হবে না। মতিলাল নেহরু ও গান্ধী বোঝাপড়ার জন্য কিছুটা আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দু মহাসভার আপত্তি অগ্রাহ্য করে কিছু করতে পারলেন না। ১৯২৫ সালের ২ মার্চ মতিলাল দিল্লিতে গান্ধীকে জানালেন, মীমাংসার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তিন দিন পর গান্ধী বোম্বেতে সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, তিনি হিন্দু-মুসলিম সমস্যাটিকে 'এক পাশে' সরিয়ে রাখতে চান। যশোবন্ত সিংহ ইঙ্গিত দিচ্ছেন, গান্ধীর এই বক্তব্য সংকেত দিয়েছিল, ভবিষ্যতে হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসকে তটস্থ করে রাখবে।[৫৫] কিন্তু সব ঘটনার দায়দায়িত্ব বহুকালের জন্য জিন্নাহর ঘাড়ে চেপে বসবে। জিন্নাহকেই সব ঘটনার খলনায়ক বানানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। কিন্তু জিন্নাহর মধ্যে সামান্য সাম্প্রদায়িক মনোভাব বা কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধিতা করার লক্ষণ ধরা পড়ছে না। বরং গান্ধীবাদী শৈলেশকুমারের ভাষায় জিন্নাহকে তখনো নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী বলেই মনে হচ্ছে। জিন্নাহ ১৯২৫ সালের ২৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় পরিষদে বাংলার বিগত বছরের অক্টোবরে জারি করা অর্ডিন্যান্সের এবং বিপ্লবীদের প্রতি সরকারি নীতির বিরোধিতা করলেন। মার্চ মাসে সরকারের দিক থেকে অর্ডিন্যান্সকে আইন পরিণত করার জন্য বিল উত্থাপিত হলে জিন্নাহ তারও বিরোধিতা করলেন। অধিকাংশ সদস্যের বিরোধিতায় সে বিল বাতিল হয়ে গেল।

খিলাফত ও আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেওয়া চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহরুর স্বরাজ্য দলের রাজনৈতিক ভাবনা জিন্নাহর পথেই হাঁটছিল, স্বরাজ্য দল ক্ষমতায় গিয়ে সাংবিধানিকভাবেই ইংরেজদের সঙ্গে দফারফা করতে চেয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে স্বরাজ্য দল দুর্বল হয়ে পড়ল। মতিলাল নেহরু এই সময়ে

আবার গান্ধীর দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে কানপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গান্ধী কেবল পাঁচ মিনিট বক্তৃতা দিলেন। তিনি দুঃখের সঙ্গে বললেন, যদি তাঁর দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেমের উত্তাপ আর আগুন দেখতেন, তাহলে সেদিনই তিনি আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে দিতেন। কিন্তু হায়! তা হওয়ার নয়।[৫৬] গান্ধী টের পাচ্ছিলেন, যখন আন্দোলন থাকে না, যখন সংগ্রামের আবেগ থাকে না। গান্ধী তখন নিষ্প্রভ হয়ে যান। ফলে গান্ধীর জন্য নতুন করে আন্দোলন ডাকার একটা উদ্বেগ তৈরি হয়। জওহরলাল লিখছেন, কিন্তু বাস্তব ঘটনা হলো, যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হয়, তখনই জনগণ বিরাট গণ-আন্দোলনের জন্য জেগে ওঠে। না হলে কোনো নেতা জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে শূন্য থেকে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেন না।[৫৭] গান্ধী চাইলেও ১৯২২ সালে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া আন্দোলন যখন-তখন আর শুরু করা সম্ভব ছিল না।

জিন্নাহ এদিকে অনেকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। মুসলিম লীগের সকল নেতার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ জিন্নাহর যে মতের মিল ছিল, তা নয়। বহু চেষ্টা করেও কংগ্রেস আর মুসলিম লীগকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে পারলেন না। কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিষদের ভেতর তিনি সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯২৬ সালে জিন্নাহর জীবনের ক্রিয়াকলাপ প্রধানত সংসদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় পরিষদে তিনি ভারতীয় শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, মধ্যবিত্তদের কর্মহীনতা, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শাসন-সংস্কারের যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয়ে কথা বলেন। ভারত শাসন-সংস্কারের জন্য রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করার দাবিও পুনরায় উত্থাপন করেন। নভেম্বরে জিন্নাহ বোম্বের মুসলমান নগর কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে আবার কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হন।[৫৮] ভিন্ন দিকে গান্ধী ১৯২৬ সালে *ইয়ং ইন্ডিয়া* পত্রিকা মারফত জানালেন, তিনি ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সবরমতী আশ্রমে থাকবেন। তিনি কারণ দেখালেন, ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য বিশ্রাম নিতে চান এবং আশ্রমের কাজে অধিক দৃষ্টি দিতে চান। মূলত রাজনীতিতে অংশ নেওয়া থেকে গান্ধী বিরত থাকলেন। ২০ ডিসেম্বর গান্ধী তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করে সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে এলেন। তিনি ওয়ার্ধাতে প্রথম বক্তৃতা দিলেন।

গান্ধী বিশ্রাম গ্রহণের পর প্রথম বক্তৃতায় জানালেন, তিনি এত দিন ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়েই চিন্তাভাবনা করেছেন। তিনি বললেন, 'নিস্তব্ধতার বছরে আমি এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছি এবং সিদ্ধান্তে এসেছি যে আমরা স্বরাজ পেতে পারি, এমনকি রামরাজ্য—যদি তিনটি কর্মসূচি সফল করতে পারি।' সেই তিনটি হলো হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং মধ্যবিত্তদের স্বদেশি বাণী সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি। তিনি পুনরায় এ কথাও বললেন, 'দেশের মুক্তির জন্য

সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত—একমাত্র সত্য ও অহিংসা ছাড়া। সত্য অথবা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে ভারতের সেবা করতে চাই না।'[৫৯] গান্ধীর এই ভাববাদী কথার মধ্যে খুব নতুন কিছু ছিল না। তিনি অস্পৃশ্যতার বিষয়টিকে যোগ করলেন মাত্র। গান্ধী হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চাইছেন, কিন্তু তার জন্য কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করছেন না। তিনি মনে করছেন, যেন সেটা স্বাভাবিকভাবেই ঘটে যাবে। গান্ধীর কাছে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের মূল স্থায়ী কারণের একটি হচ্ছে গোহত্যা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাজনা বাজানো। কিন্তু এ দুটি প্রধান সমস্যা ছিল না। মুসলমানদের মনে ছিল বঞ্চনার কষ্ট, যা গান্ধী বুঝতে চাইছিলেন না। চিত্তরঞ্জন দাশের মতো জিন্নাহ আবার এটাকেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন সাম্প্রদায়িক সংকট নিরসনের জন্য।

তিন.

জিন্নাহ তখনো হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ব্যাপারে আশা ছাড়েননি। জিন্নাহ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বাইরে থেকে ভারতীয় মুসলমানদের একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ঠিক এই সময় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারী আলী ভ্রাতৃদ্বয় কংগ্রেসের বিরোধিতা শুরু করেন। তাঁদের নতুন সংগঠনের নাম হয় জামিয়াৎ-ই-উলেমা-ই-হিন্দ। সেই একই সময়ে আবার ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত হয় 'নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলন'। ১৯২৭ সালের ২০ মে জিন্নাহ দিল্লির মুসলিম সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এখানে মুসলমানদের দাবিগুলো চূড়ান্ত রূপ পায়, যা 'দিল্লির মুসলিম প্রস্তাব' নামে খ্যাত। দিল্লির মুসলিম প্রস্তাবের সারমর্ম ছিল, চারটি শর্তে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় ও পরিষদসমূহে যৌথ নির্বাচন প্রথায় রাজি। শর্তগুলো হলো—এক : সিন্ধুকে পৃথক প্রদেশের মর্যাদা দিতে হবে, দুই : উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে অন্যান্য প্রদেশের সমমর্যাদা দিতে হবে, তিন : পাঞ্জাব ও বঙ্গে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যাভিত্তিক হবে এবং চার : কেন্দ্রীয় পরিষদে এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না।

দিল্লির ওই সভায় জিন্নাহ ছাড়া আরও বাঘা বাঘা মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। জিন্নাহর পক্ষে সবাইকে পৃথক নির্বাচনের কথাটা গ্রহণ করাতে কষ্ট হয়েছে। পূর্বের পৃথক নির্বাচন প্রথাকে বাদ দিয়ে জিন্নাহর যৌথ নির্বাচন প্রথার উদ্যোগ গ্রহণ বহু মুসলমানের কাছে মনঃপূত হয়নি।[৬০] কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে তিনি সেটা গ্রহণ করাতে পারলেন। জিন্নাহর মাথায় রয়ে গেছে তখন লালা লাজপত রায়ের কথাটি। লাজপত রায় বলেছিলেন, পৃথক নির্বাচন একবার শুরু হলে তা আর কখনো রোধ করা যাবে না। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। ফলে জিন্নাহ এবার পৃথক নির্বাচন বাদ দিয়ে

যৌথ নির্বাচনের কথা মুসলমানদের বললেন এবং তাঁদের রাজি করালেন। খুব স্বাভাবিক, মুসলমানরা যৌথ নির্বাচনে গেলে কিছু শর্ত দেবেই তাদের নিরাপত্তার জন্য। ১৯২৭ সালের মে মাসে বোম্বেতে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 'দিল্লির মুসলিম প্রস্তাব'কে অনুমোদন করা হয়।[৬১] সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের অংশ হিসেবে দিল্লির মুসলিম প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদন লাভ করে।[৬২] যার অর্থ দাঁড়াল দিল্লির মুসলিম প্রস্তাবের সঙ্গে কংগ্রেস ঐকমত্য প্রকাশ করল। ফলে দুই পক্ষের একসঙ্গে পথ চলতে এবং সংগ্রামে অংশ নিতে আপত্তি থাকার আর কোনো কারণ নেই। সেই বছর মুসলিম লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। জিন্নাহ পুনরায় গান্ধীকে 'মহাত্মা' বলে সম্বোধন করেন এবং সে বছরের কলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে অ্যানি বেসান্ত ও সরোজিনী নাইডুকে ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানান। দুজনই খুশি মনে উপস্থিত থেকে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ভাষণ দিলেন। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পথ তৈরি হলো।

পাশাপাশি ঘটল ভিন্ন ঘটনা। ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে সাইমন কমিশন গঠন করে। কমিশনের যে সাতজন সদস্য ছিলেন, সবাই-ই তাঁরা ইংরেজ। জিন্নাহ দেখলেন, শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা গঠিত এই কমিশনে কোনো ভারতীয়কে রাখা হয়নি। সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গ কমিশন গঠন করে ভারতের অংশীদারত্বের মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে নসাৎ করা হয়েছে বলে জিন্নাহ এক বিবৃতিতে এর প্রতিবাদ জানান। কংগ্রেস সভাপতি আনসারিও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কমিশন ভারতে আগমনের পূর্বেই মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস একযোগে 'সাইমন কমিশন' বয়কট করলে ভাইসরয় এ ধরনের সর্বাত্মক বয়কটের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কংগ্রেস নেতা গান্ধীকে তখন নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়। তিনি যুক্তি দেখান যে কমিশন বয়কট কিংবা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পেছনে কোনো বাস্তবতা নেই, এটি স্বরাজ লাভের যথার্থ পন্থাও নয়। তাই এ ধরনের অবাস্তব মহড়ায় নেতৃত্ব দেওয়ার কথা তিনি বিবেচনা করেননি। সাইমন কমিশনকে বয়কট করা গান্ধীর কাছে তখন প্রধান কাজ বলে মনে হয়নি।[৬৩] মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস মিলিতভাবে সাইমন কমিশন বর্জন করলে ক্ষুব্ধ ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড তখন ভারতীয়দেরই একটি সর্বজনগ্রাহ্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছুড়ে দেন। কংগ্রেস ভারত সচিবের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ্রহণ করে।

কমিশন বয়কটে কংগ্রেসের সঙ্গে জিন্নাহর জোটবদ্ধ হওয়ায় ভারত সচিব জিন্নাহর ওপর বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হন। বার্কেনহেড সাইমনকে পরামর্শ দেন, তাঁরা যেন ভারতে গিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেন, যার দ্বারা মুসলমানদের সমর্থন পাওয়া যাবে এবং জিন্নাহকে উচিত শাস্তি দেওয়া যাবে।[৬৪] তিনি ভাইসরয়ের নিকট প্রেরিত এক বার্তায় একইভাবে

জিন্নাহকে এ জন্য উপযুক্ত শাস্তি দানের পরামর্শ দেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ভার পূর্ণাঙ্গভাবে ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিয়ে সরকার প্রকৃত অর্থে জিন্নাহকে শিক্ষাদানেরই ব্যবস্থা করে।[৬৫] বার্কেনহেডের উদ্দেশ্য ছিল সাইমন কমিশনের মাধ্যমে মুসলমানদের কিছু বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নিজেদের দলে নেওয়া এবং ভারতের রাজনীতিতে জিন্নাহকে একা করে দেওয়া। জিন্নাহ কিন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাইমনের কমিশনের সঙ্গে হাত মেলালে মুসলিম লীগের জন্য বহু সুবিধা আদায় করে নিতে পারতেন। জিন্নাহ তা করেননি বলে বার্কেনহেডের রাগটা তাঁর প্রতি বেড়ে যায়। সাইমন কমিশনকে বর্জনের ব্যাপারে জিন্নাহর সঙ্গে একমত হলেন না পাঞ্জাবের মহম্মদ শফি। জিন্নাহ 'সাইমন কমিশন' বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলে লীগ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মুসলিম লীগে ভাঙন ধরে। শফি আলাদাভাবে লিগ গঠন করেন। জিন্নাহ তবু সাইমন কমিশনকে বয়কটের ব্যাপারে পাথরের মতো অনড় রইলেন।

সাইমন কমিশনকে বর্জনকারীদের একত্র হওয়া দরকার ছিল। মাদ্রাজে ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য সবাইকে নিয়ে কাজ করার জন্য ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করা হলো। গান্ধী বহুদিন কংগ্রেস থেকে দূরে সরে থাকার পর এই মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু গান্ধী নিজেকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। ইতিপূর্বেই জওহরলাল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আকৃষ্ট। ফলে ১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত মাদ্রাজ কংগ্রেসে তথা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা গেল। মাদ্রাজ কংগ্রেসে জওহরলাল কর্তৃক উত্থাপিত এবং সুভাষচন্দ্রের অনুগামীদের দ্বারা সমর্থিত 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র প্রস্তাব বিনা বিরোধিতায় গৃহীত হলো। গান্ধী ব্যাপারটায় খুশি হতে পারেননি। স্বাধীনতাবিষয়ক প্রস্তাব এবং ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট তাঁর মনঃপূত ছিল না। পরবর্তীকালে গান্ধী 'দায়িত্বহীন এবং না ভেবেচিন্তে তড়িঘড়ি করে নেওয়া' বলে এই সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করেন। তিনি আরও মন্তব্য করেছিলেন, কংগ্রেস প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করে সমালোচকদের কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে।[৬৬]

মাদ্রাজ অধিবেশনের পর গান্ধী মনঃক্ষুব্ধ হয়ে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ফিরে এলেন সবরমতী আশ্রমে। রাজনৈতিক দিক থেকে ১৯২৮ সালটি ছিল কর্মবহুল একটি বছর। কিন্তু গান্ধী আশ্রমের ভেতর নিজেকে আবদ্ধ করে রাখলেন। *ইয়ং ইন্ডিয়া* পত্রিকায় তিনি ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসেই স্বাধীনতা প্রস্তাবটির তীব্র সমালোচনা করে লিখলেন, এর চেয়ে অনেক কার্যকর প্রস্তাব কংগ্রেস নিতে পারত।

গান্ধীর মতে, 'বিদেশি বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ, সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট—কংগ্রেস এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করলে তার কিছু অর্থ বোঝা যেত, কিন্তু স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ

নেহাত নরথক। ব্য ক্তগতভাবে আ ম স্বাধ নতা আকুলভাবে প্রাথনা ক র না, তবে আমি ইংরেজদের জোয়াল থেকে মুক্তি কামনা করি।' ভারতের স্বাধীনতা বাদ দিয়ে কীভাবে তিনি ইংরেজদের জোয়াল থেকে মুক্তি লাভ করতে চান, তা ব্যাখ্যা করা কঠিন। তিনি অবশ্য সেখানে লেখেন, ভারতের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায়, এ ব্যাপারে প্রায় একই রকম সংজ্ঞা দেবে—এ রকম দুই ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে না। তিনি আরও বলেন, 'আমরা জানি না আমাদের সুদূরের লক্ষ্য। এটা নির্দিষ্ট হবে আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কাজের দ্বারা, সংজ্ঞা দিয়ে নয়। যদি আমরা জ্ঞানী হই, তাহলে বর্তমানের কথা চিন্তা করর, ভবিষ্যৎ তার নিজের ভাবনা ভাববে। ঈশ্বর আমাদের সীমিত দৃষ্টি দিয়ে সীমিত গোত্রের মধ্যে কাজ করতে দিয়েছেন। আজকের কাজটুকুই যথেষ্ট ভালো কাজ।' তিনি মনে করেন 'স্বরাজ' শব্দটিই যথেষ্ট সন্তোষজনক। তিনি আরও বলেন, যদি কংগ্রেস স্বরাজ শব্দটিই গ্রহণ করত, তাহলে স্বাধীনতার প্রস্তাব নেওয়ার মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটত না।[৬৭]

গান্ধী মনে করছেন, স্বাধীনতার প্রস্তাব নেওয়াটা দুঃখজনক। গান্ধী বলছেন, স্বরাজই যথেষ্ট। কিন্তু গান্ধীর এই স্বরাজের ধারণাটাই সর্বক্ষেত্রে আগাগোড়া অস্পষ্ট। গান্ধীর স্বরাজের মূলে রয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ। ভারতের প্রত্যেক মানুষকে হয়ে উঠতে হবে সুশৃঙ্খল, নির্ভীক, অহিংস ও নির্লোভ। নিজের ওপর তার সংযম ও নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের মানুষ এই চরিত্র অর্জন করবে না, গান্ধীর মতে, ততক্ষণ ভারত থেকে ইংরেজকে তাড়িয়ে লাভ নেই। কারণ, তাতে শুধু শাসকের পরিবর্তন হবে, জনগণের মুক্তি আসবে না। কংগ্রেস স্বাধীনতার প্রস্তাব নেওয়ার পরপরই গান্ধী *ইয়ং ইন্ডিয়া* পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে এই কথা জানিয়ে দেন।[৬৮] গান্ধীর বক্তব্যের সারকথা হলো, ভারতের প্রত্যেক মানুষ মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধীর মতো নির্ভীক, নির্লোভ, সংযমী এবং অহিংস হয়ে উঠতে পারলেই স্বাধীনতার সুফল পাওয়া যাবে, তার আগে নয়। ফলে তার আগে শাসক পরিবর্তন করে লাভ নেই। অতএব ইংরেজরা আছে থাকুক। গান্ধীর স্বরাজের ধারণায় ভারতের প্রতিটি মানুষ নির্লোভ, নির্ভীক, সংযমী, আত্মনির্ভরশীল ও অহিংস হয়ে উঠবে, এই চিন্তার মধ্যে বাস্তবতা নেই। কল্পনাতেই তা সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর 'চরকা' এবং 'স্বরাজ' সম্পর্কে যথেষ্ট বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

গান্ধী নিজের জনপ্রিয়তা নিয়ে সন্দিহান থাকায় ১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো ঝুঁকি নিতে সাহস করেননি। কারণ ইতিপূর্বে তিনি চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল নেহরুর মতো ব্যক্তিকে কংগ্রেস থেকে বের করে দেওয়ার কৌশল খাটাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। রাওলাট আর খিলাফত আন্দোলনের ডাক দিয়ে তিনি যে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিলেন, সেটা তখন আর গান্ধীর ছিল না। সে কারণেই মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেসের নেওয়া স্বাধীনতা প্রস্তাব তিনি

নরবে হজম করলেন। কন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর বরুদ্ধে কলম ধরে কাজ াকে কোর সমালোচনা করতে ছাড়লেন না। ঠান্ডা মাথায় গান্ধী ভিন্ন পথে এগোলেন, নিজের ক্ষমতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য। গান্ধীর পেছনে বিরাট সমর্থন ছিল ভারতীয় বণিকদের, সেটা কংগ্রেসের সবাই-ই জানতেন। কারণ, গান্ধীর অহিংস আন্দোলন আর সরকারের সঙ্গে বড় বিরোধে না জড়ানোর রাজনীতি বণিকদের সমর্থন পেয়েছিল। গান্ধীর আশ্রমকেন্দ্রিক চরকার রাজনীতিকে বণিকরাই সর্বান্তঃকরণে অর্থ জোগাতেন। ফলে গান্ধী আগের জনপ্রিয়তা হারালেও বহু কিছু তখনো তাঁর নিয়ন্ত্রণে। বিশেষ করে শক্তিমানদের সমর্থন গান্ধীর পেছনে।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্বরাজ দলের অন্যতম খুঁটি মতিলাল নেহরু তখন ক্রমশ গান্ধীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। যখন ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের নিজস্ব সংবিধান রচনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানালেন, গান্ধীর প্রভাবে মতিলাল নেহরুর ওপরই সংবিধান রচনার মূল দায়িত্বভার অর্পণ করা হলো। গান্ধীই ১৯২৮ সালে মতিলাল নেহরুকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হতে সাহায্য করেন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে গান্ধীর ইচ্ছায় পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে পুনরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে 'স্বায়ত্তশাসন'কেই সংগ্রামের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বলা বাহুল্য, স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবটি গান্ধীর প্রভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হয়েছিল।[৬৯] গান্ধী জানতেন, কতিপয় তরুণ পূর্ণ স্বাধীনতা চাইলেও, কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতারা তা চান না। মতিলাল নেহরুকে সংবিধান রচনার সুযোগ দিয়ে তিনি রক্ষণশীলদের সমর্থন আদায় করে নিলেন। গান্ধী কংগ্রেসের সব নেতাকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি চাইলে বেশ ভালোই কলকাঠি নাড়তে পারেন। তিনি পাশাপাশি কংগ্রেস তরুণ নেতাদের না চটানোর জন্য বললেন, সরকার এক বছরের মধ্যে ভারতকে 'স্বায়ত্তশাসন' না দিলে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনকে রাজনৈতিক লক্ষ্যরূপে ঘোষণা করা হবে।

জওহরলাল, সুভাষ বসু প্রমুখ যখন ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করেন, গান্ধী তার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেন। কিন্তু তারপর দেখা যাবে গান্ধীর চরিত্রের দ্বিচারিতা এই যে দুই বছরের মধ্যে গান্ধী নিজেই পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন। তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে 'স্বায়ত্তশাসন' শব্দটি গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হলো, সরকার যদি এক বছরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে না নেয়, পরবর্তী বছরে তাহলে পূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হবে। কথাটা হলো এই যে পরবর্তী এক বছরের মধ্যে কি ভারতের সব মানুষের চরিত্র শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে যাবে? গান্ধী ১৯২৯ সালে পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দেন। গান্ধী যখন ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দেন, তখন

ক ভারতের মানুষ স্বরাজ লাভের গুণগুলো অজন করে ছল? য দ তা অজন না করে থাকে, গান্ধী নিজেই এর ডাক দিলেন কেন? গান্ধী নির্লোভ ছিলেন না, ছিলেন অস্থিরমতি। যখন তাঁর জনপ্রিয়তা কমে যেত, কংগ্রেসে তাঁর অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ত, তখনই তিনি নতুন করে আবার সংগ্রামের ডাক দিতেন। জনগণকে রাস্তায় নামাতেন নিজের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তোলার জন্য। নিজের হাতে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্য তিনি এ কাজটি করতেন। তিনি ছিলেন ভয়াবহ রকম কর্তৃত্ববাদী।

সাইমন কমিশন বয়কট করার পাশাপাশি ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেসের ডাকা প্রথম সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। জিন্নাহসহ মুসলিম প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দিয়ে লক্ষ করেন যে ইতিপূর্বে মুসলমানদের পক্ষ থেকে শর্ত সাপেক্ষে যৌথ নির্বাচনের যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং যা কংগ্রেসের অধিবেশনে বহু আগেই গৃহীত হয়েছে—মুসলমানদের দেওয়া সেই দিল্লির মুসলিম প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতা জয়াকর, মালব্য, লাজপত রায় প্রমুখ অবস্থান নিয়েছেন। সম্মেলনে হিন্দু মহাসভা এবং শিখ লীগের প্রতিনিধিরা অত্যন্ত সরব এবং আর সবাই-ই নিজের দিকে ঝোল টানতে সমভাবে উন্মুখ। কংগ্রেস প্রতিনিধিরা ইতিপূর্বে মুসলমানদের কাছে প্রতিশ্রুত সুযোগ-সুবিধা কাটছাঁট করে সবাইকে সন্তুষ্ট করতে ব্যগ্র। মুসলিম প্রতিনিধিরা এই সব দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন।[৭০] জিন্নাহ তারপরও সম্মেলন শেষে একটানা ১০ দিন ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেন, যাতে দিল্লির মুসলিম প্রস্তাবের শর্তাধীন যুক্ত নির্বাচন প্রথার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তা গৃহীত হলো না।[৭১] মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, জিন্নাহ অতি অবশ্যই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্ররোচনায় এরূপ দাবি করেননি। তাঁর পরিকল্পনার পেছনে যে ব্যাপারটা কাজ করছিল, তা হলো মুসলমানদের মনোভাব বা আবেগের মূল্য দেওয়া।[৭২]

সর্বদলীয় সম্মেলন শেষ হওয়ার পর জিন্নাহ তাঁর মুসলিম লীগ কাউন্সিলের এক সভা আহ্বান করেন। সে সভার প্রধান বক্তব্য ছিল মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন প্রথা। জিন্নাহ সভাপতির ভাষণে খেদ প্রকাশ করে বলেন, হিন্দু মহাসভা কার্যত লীগের যৌথ নির্বাচনের প্রস্তাবকে বাতিল করেছে। দিল্লি মুসলিম প্রস্তাবকে বিরোধিতার জন্য হিন্দু মহাসভাকে দায়ী করে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। বস্তুত এই ঘটনার পর থেকে মুসলিম লীগ সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগ দেয়নি। কারণ কংগ্রেস এ সময়ে ভিন্ন সুরে কথা বলছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯২৮ সালের ১৯ মে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে লীগের কোনো প্রতিনিধি যোগদান করেনি। সেই সম্মেলনে ২৯টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে পরবর্তী পয়লা জুলাইয়ের মধ্যে সংবিধানের মূলনীতির খসড়া রচনার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। জিন্নাহ তখন স্ত্রী রত্নাবাঈয়ের অসুস্থতার কারণে বিদেশে চলে যাচ্ছেন।[৭৩] যশোবন্ত সিংহ লিখছেন, কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় লীগের সরে

দাড়ানো এবং জন্নাহর বদেশযাত্রা সবদলয় ব•ককে অনেক া দুবল করে দিয়েছিল।[৭৪] জওহরলাল নেহরুকে তখন আনসারী এক চিঠিতে বলেছিলেন, কংগ্রেসের বেশির ভাগ সদস্যের কাছে জিন্নাহই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি মুসলিমদের তরফে কিছু করে দেখাতে পারতেন। জিন্নাহ ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাঁকে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বহু সদস্যই সমীহ করতেন। কিন্তু জিন্নাহর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তাঁরা গ্রহণ করতে পারতেন না নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে।

জিন্নাহ দেশের বাইরে চলে গেলেন। নানা দৃষ্টিভঙ্গির নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর নেহরু কমিটি তার প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। এই প্রতিবেদনের ওপর আরও জনমত সংগ্রহ করার জন্য ১৯২৮ সালের ২২ ডিসেম্বর সর্বদলীয় এক সম্মেলনের আহ্বান করা হয়। স্থির হয় যে কংগ্রেস এবং লীগের অধিবেশনও ওই সময় কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে, যাতে বিগত বছরের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক মতবিনিময় করতে পারে। সংবিধান প্রণয়ন পর্ষদের ১০ জন সদস্য সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের কোনো সূত্র বের করতে পারলেন না। সবশেষে যে সমাধান সূত্রে পৌঁছানো গেল, তাতে বলা হলো সব সদস্যই আসন সংরক্ষণের বিরোধী—তা সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু, যে সম্প্রদায়ের জন্যই হোক। ভিন্ন দিকে যে জাতীয় সরকারের কথা চিন্তা করা হলো, তা ছিল 'কেন্দ্রীয়' পদ্ধতির, 'যুক্তরাষ্ট্রীয়' পদ্ধতির নয়। সব ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছিল, প্রদেশগুলোর হাতে নয়। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে প্রতিবেদন প্রস্তাব দিল পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বাতিল করতে এবং সংখ্যালঘুদের ওপর বিশেষ জোর দিতে। বহুজন প্রদেশকে বাদ দিয়ে কেন্দ্রের হাতে সব ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আপত্তি তুললেন। দিল্লির মুসলমান প্রস্তাব অনুসারে কেন্দ্রে মুসলমানদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের দাবি বাতিল করা হলো।[৭৫]

লক্ষ করলে স্পষ্ট হবে যে প্রস্তুতকৃত নেহরু প্রতিবেদনে দিল্লির মুসলিম প্রস্তাবকে বাস্তবায়ন করা হয়নি। কিন্তু কংগ্রেস কথা দিয়েছিল যে দিল্লির মুসলিম প্রস্তাবকে মেনে চলা হবে। ইতিপূর্বে কংগ্রেস মুসলিম প্রস্তাবকে গ্রহণ করেছিল বলেই সেই শর্তে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের আহ্বানে সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল।[৭৬] জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাবিগুলো আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং সরাসরি নেহরু প্রতিবেদন রচনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেননি। জিন্নাহ বিদেশে থাকায় নেহরু খসড়া প্রতিবেদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাঁর বোম্বের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে লেখেন, 'আপনি বোম্বেতে এ সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন, তার ওপরেই এই প্রতিবেদন এবং প্রত্যুত সমগ্র সংবিধানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।' তিনি তাঁকে আরও সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান, 'আপনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমাকে সুযোগ দেওয়ার পূর্বে আপনি এই প্রতিবেদনের

বরুদ্ধে কোনো মতামত দেবেন না। সুভাষচন্দ্র ম তলাল নেহরুর এ চ ার কথা জানতেন না, তিনিও স্বহস্তে জিন্নাহর কাছে এক উদ্বেগভরা চিঠি লেখেন।[৭৭]

জিন্নাহ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব রাখতেন, দুটো চিঠির উল্লেখ থেকে ধারণা করে নেওয়া যায়। লক্ষ্ণৌতে পরবর্তী যে বৈঠকটি বসে, বিদেশ থেকে ফিরে জিন্নাহ তাতে যোগদান করতে পারেননি। জিন্নাহ যাতে বৈঠকে যোগদান করতে পারেন, তার জন্য মতিলাল নেহরু বৈঠকের তারিখ এক দিন পিছিয়ে দিয়েছিলেন। জিন্নাহর যোগদান করতে হলে বৈঠকের তারিখ আর দু-তিন দিন পেছানো দরকার ছিল। যশোবন্ত সিংহ লিখেছেন, 'জিন্নাহর উপস্থিতির জন্য নেহরু বৈঠক পিছিয়ে দিতে অনুরোধ করল। সকলেই অনুরোধ রাখার ভান করলেন, কিন্তু আসলে অনুরোধ রাখলেন না, অসৌজন্যের পরিচয় দিয়ে বৈঠক মাত্র এক দিন পেছানো হলো। জিন্নাহর সঙ্গে আপস করতে নেহরুরা খুব আগ্রহী ছিলেন না। দুটি শিখ সংগঠনসহ সব ধর্মীয় সংগঠনকে বাদ রাখা হলো। কেবল এক শ জনের মধ্যে উপস্থিতি সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। খুব আশ্চর্যের নয় যে বৈঠক ঠিক তেমনি ফল দিল।'[৭৮] সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ বাতিল করার জন্য শওকত আলীর কাছ থেকে মৃদু আপত্তি শোনা গেল। মতিলাল নেহরু হিন্দু মহাসভাকে বিশেষ সুযোগ দিয়েছিলেন বলে শওকত আলী মতিলাল নেহরু থেকে আলাদা হয়ে গেলেন, যেসব মুসলমান মতিলালকে সমর্থন দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের থেকেও আলাদা হয়ে গেলেন। শওকত আলীর এই আপত্তি কংগ্রেসকে কিছুটা বিব্রত করল।

শওকত আলীর আপত্তিকে মতিলাল ততটা গুরুত্ব না দিয়ে জিন্নাহর বক্তব্যের ওপর নির্ভর করলেন। জিন্নাহই সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি, জিন্নাহর সমর্থন পেলেই নেহরু প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় মর্যাদা পাবে। শওকত আলী আর কোনো ক্ষতি করার আগেই জিন্নাহকে রাজি করানোর জন্য মতিলাল নেহরু পুরুষোত্তম ঠাকুরদাসকে নিয়োগ করেন। জিন্নাহ কিন্তু দেশে ফিরে সরাসরি প্রতিবেদনের পক্ষে তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করলেন না। বরং স্বভাববিরোধী সতর্কতার সঙ্গে মুসলিমদের মতামত জানতে চাইলেন। লক্ষ্ণৌতে তিনি মুসলিম লীগ কাউন্সিলের যে বৈঠক ডাকলেন, তা থেকে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল না। এর ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা বলা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এই রকম অচল অবস্থার ফলে মতিলাল ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে আক্ষেপ করেছিলেন, 'ঐক্যবদ্ধ না হলে বিদেশিদের সামনে দাঁড়ানো মুশকিল।'[৭৯] গান্ধীর কংগ্রেস মুসলিমদের দাবির প্রতি সামান্য সম্মান না দেখিয়ে, নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে বারবার মুসলমানদের কাছ থেকে নিঃশর্ত সমর্থন আশা করছিল। মুসলমানরা কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতায় তখন আর যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ছিল না। জিন্নাহ তবু ভারতের স্বার্থে একটা সমাধান চাইছিলেন।

কলকাতায় ১৯২৮ সালের ২২ ডিসেম্বর পুনরায় সবদল য় সম্মেলন বসলে জন্নাহ তাতে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের ২৪ জন প্রতিনিধির পক্ষ থেকে কলকাতার সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন। সংক্ষেপে জিন্নাহর প্রস্তাব ছিল, প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না। দ্বিতীয়ত, নেহরু প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সব প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত না হলে পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানরা জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন পাবে, তার থেকে বেশি নয়। তৃতীয়ত, বাদবাকি সব ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে, কেন্দ্রের হাতে নয়।[৮০] জিন্নাহ ও তাঁর দলের দ্বিতীয় দাবি অনুযায়ী যদি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে দাবি অনুমোদিত না হয়, সে ক্ষেত্রে পাঞ্জাব ও বাংলার গত ১০ বছরের জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। জিন্নাহ স্মরণ করিয়ে দেন যে এই প্রস্তাবগুলো দিল্লির মুসলিম প্রস্তাবেই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং প্রস্তাবগুলো কংগ্রেসের বোম্বাই ও মাদ্রাজ অধিবেশনে আলোচিত এবং গৃহীত হয়েছিল। তিনি বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে বলেন যে পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলিমদের ভোটাধিকার ক্ষমতা জনসংখ্যার সমানুপাতিক হারে নেই, যদিও ওই দুটি রাজ্যে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

জিন্নাহ নেহরু প্রতিবেদনের ১৩ নম্বর ধারা সম্বন্ধে লীগের আপত্তির কথা উল্লেখ করেন। সেই ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাজ্যের সংবিধানকে স্থগিত রাখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের হাতে প্রদত্ত অবশিষ্ট ক্ষমতার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সংবিধানগুলো স্থগিত করে দিতে পারে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিষয়গুলো তারা পরিবর্তন করতে পারে। কংগ্রেসের আনসারী জিন্নাহ এই বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত বলে উল্লেখ করেন এবং এ ব্যাপারে মতামত বিশ্লেষণ করার জন্য তাঁকে সুযোগ দেন। জিন্নাহ পুনরায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, তিনি পুরোপুরি সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছেন এবং এখানে কোনো সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নেই। তিনি জোর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'হিন্দুরা বলবে মুসলিমরা সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার দ্বারা পরিচালিত। সেই একই রকম কথা মুসলিমরা হিন্দুদের সম্পর্কে বলবে। সুতরাং যদি আমরা ক্ষমতা বিভাজনের প্রশ্ন সতর্কতার সঙ্গে আলোচনা করি, তাহলে আমরা দেখব, অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলো রাজ্যের হাতে থাকা উচিত।' তিনি বলেন, তিনি সেই পদ্ধতিরই সপক্ষে, যে পদ্ধতিতে অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলো কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে না গিয়ে রাজ্যগুলোর হাতে থাকবে।[৮১]

সম্মেলনে জিন্নাহর বক্তব্য নিয়ে তীব্র মতবিরোধ হয়। কংগ্রেসের এককালের সভাপতি মহম্মদ আলী তখন নেহরু প্রতিবেদনের সমালোচনা করেন। উদারপন্থী নেতা তেজবাহাদুর সপ্রু জিন্নাহর বক্তব্যকে সমর্থন দিলেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে যদি নেহরু প্রতিবেদনের অতি তুচ্ছ কিছু বাদ যায়, তাহলে হিন্দু মহাসভা নেহরুর প্রতিবেদনকে সমর্থন করবে না। হিন্দু মহাসভার সবাই-ই

আবার কংগ্রেসের সদস্য ছলেন। খোলা অধিবেশনে জন্নাহ আবার সদস্যদের মত পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করলেন। তিনি সবাইকে বললেন, যে পরিবর্তনগুলোর প্রস্তাব করা হয়েছে, তা ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত। কোনো দেশ সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না রেখে স্বাধীনতা পায়নি এবং দেশের হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য এটা প্রয়োজন।[৮২] জিন্নাহর বক্তব্যের বিরোধিতা এল কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার নেতা জয়াকরের কাছ থেকে। তিনি জিন্নাহর প্রতি বিদ্রূপ করে বললেন, জিন্নাহ মুসলমানদের সামান্য এক অংশের প্রতিনিধি। ফলে তাঁর দাবি মেনে নেওয়ার কোনো অর্থ হবে না। কারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের বেশির ভাগের তাতে কিছু যাবে-আসবে না। তিনি বললেন, 'জিন্নাহ যে মুসলিম লীগের নেতা, তাঁদেরকে তিনি বরং নেহরুর প্রতিবেদনের পক্ষে নিয়ে আসুক'। জিন্নাহ সভায় নিজের কোণঠাসা অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারলেন। জিন্নাহ সৎ উদ্দেশ্যে সভায় যোগ দিয়েছিলেন। ফলে তিনি বিদ্রূপে মনঃক্ষুণ্ন না হয়ে বললেন, 'শুধু মুসলিম লীগের মুসলমানদের আপনাদের সঙ্গে পেলে হবে না, ভারতের স্বরাজের সংগ্রামে সব মুসলমানকে আপনাদের সঙ্গে পেতে হবে।'[৮৩]

জিন্নাহ সম্মেলনে প্রতিনিধিদের কাছে ব্যাকুল মিনতি জানিয়ে বললেন, 'আমরা যা চাই, তা হলো—আমাদের লক্ষ্য সাধিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে পথ চলবে। সুতরাং দেখা জরুরি যে আপনারা কেবল মুসলিম লীগকেই সঙ্গে পাননি, ভারতবর্ষের সব মুসলমানকেও সহযোগী রূপে পেয়েছেন। আমি মুসলমান হিসেবে এ কথা বলছি না, বলছি একজন ভারতবাসী হিসেবে। আর আমি এটা দেখতে চাই যে স্বাধীনতাসংগ্রামে আমাদের সঙ্গে ৭ কোটি মুসলমান যেন সমানতালে পা ফেলে চলেন। আপনারা কি সামান্য কয়েকজনের সহযোগিতাতেই সন্তুষ্ট হবেন? আপনারা কি আমার এ-জাতীয় কথা শুনে সন্তুষ্ট হতে পারেন যে কেবল আমি আপনাদের সঙ্গে আছি? ভারতবর্ষের সব মুসলমান আপনাদের সঙ্গে চলুক, সেটা কি আপনারা চান না? শিখ, খ্রিষ্টান, পারসি সম্প্রদায় কাউকে বিন্দুমাত্র অসম্মান না করে আমি বলতে চাই, আপনাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষের দুটি প্রধান সম্প্রদায় হলো হিন্দু ও মুসলমান। তাই এই দুই সম্প্রদায়কে পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবসম্পন্ন ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে—তাঁদের বুঝতে হবে যে তাঁদের মধ্যে কোনো স্বার্থের সংঘাত নেই এবং তাঁরা এক সর্বজনীন মঙ্গলের অভিমুখে সম্মিলিতভাবে পদযাত্রা করে এগিয়ে চলেছেন।'[৮৪]

পৃথিবীর একাধিক দেশের সংবিধানের নজির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সংখ্যালঘুরা সর্বদা সংখ্যাগুরুদের আতঙ্কে দিনযাপন করে। ধর্মীয় সংখ্যাগুরুরা তাঁর মতে সচরাচর নিপীড়ক ও অত্যাচারী হয়। সুতরাং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দাবি করার অধিকার সর্বদাই আছে। তিনি অতঃপর আরও বললেন, 'এসব বড় বড় প্রশ্ন, যার সমাধান করতে হলে উচ্চকোটির রাষ্ট্রনায়কসুলভ মানসিকতা ও রাজনৈতিক

প্রজ্ঞার প্রয়োজন। আবার আ ম তা আপনাদের অনুরোধ জানা চ্ছ যে চূড়ান্ত সদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনারা এ ব্যাপারে ভালো করে খুঁটিয়ে বিচার করুন। আমি যা বলেছি, তাতে কোনো পক্ষকে কোনোরকম শাসানি দেওয়া হয়েছে বলে যেন দয়া করে মনে করবেন না এবং আমি আশা করি যে আমাকে ভুল বোঝা হবে না। আজ যদি আপনারা এ প্রশ্নের সমাধান না করেন, তবে আগামীকাল তা করতে হবে এবং ইতিমধ্যেই আমাদের জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হবে। আমরা সবাই এই দেশের সন্তান। আমাদের সম্মিলিতভাবে থাকতে হবে, মিলেমিশে কাজ করতে হবে। আমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ থাকুক না কেন, আমরা যেন তার অধিকন্তু আর পারস্পরিক দ্বেষ সৃষ্টি না করি। যদি আজ আমরা একমত হতে না পারি, আমরা যেন ভিন্নমত পোষণ করার ব্যাপারে সহমত হতে পারি এবং যেন বন্ধু হিসেবে এখানে থেকে যেতে পারি। আমার কথা বিশ্বাস করুন যে হিন্দু-মুসলমানরা মিলিত হতে না পারলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি হবে না। তাই একটা নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে কোনো রকম যুক্তি-তর্ক-দর্শন অথবা বাদ-বিবাদ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।'[৮৫]

জিন্নাহর সব কথার পরও কংগ্রেস এবং মহাসভা একচুল নড়তে রাজি হলো না। যশোবন্ত সিংহ লিখেছেন, জিন্নাহর যুক্তি ছিল জোরালো, প্রশ্নগুলো ভালো, কিন্তু জয়াকর আগেই তার উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। ফলে বৈঠকে জিন্নাহর প্রস্তাব খারিজ হয়ে গেল এবং এর ফলে জিন্নাহর পথ আলাদা হয়ে গেল।[৮৬] মনঃক্ষুণ্ন, অপমানিত, আহত জিন্নাহ সভা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব পেয়ে শীর্ষস্থানীয় নেতারা নিজ নিজ মূর্তি ধারণে কালবিলম্ব করেননি। এমনকি গান্ধী ইতিপূর্বে যদিও বলেছেন, শাসনসংস্কার বা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কোনোটিতে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই, স্বরাজ লাভের ওপরই কেবল তাঁর মনোযোগ; কিন্তু নেহরু প্রতিবেদন প্রণয়নের সময় তিনিই অবতীর্ণ হলেন তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায়। তাঁর তত্ত্বাবধানেই নেহরু কমিটি কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার নেতাদের পূর্ব সমর্থিত লীগের দিল্লির মুসলিম প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করল না, অধিকন্তু কংগ্রেস তাদের নির্ধারিত স্বাধীনতা প্রস্তাব বাদ দিয়ে শক্তিশালী এককেন্দ্রিক সরকার গঠনেরও দাবি জানায়।[৮৭] গান্ধী সব সময় হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা বলতেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তিনি কোনো ভূমিকা নিলেন না। কংগ্রেসের সব নেতাসহ গান্ধী হিন্দু মহাসভার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে রইলেন। মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, সর্বদলীয় সভায় জিন্নাহর আবেদনকে অগ্রাহ্য করা ছিল জাতীয় কংগ্রেসের অক্ষমতার পরিচয়। কারণ কংগ্রেস যৌথ নির্বাচন প্রয়োগের সুযোগ হারায়, যা ছিল এত দিন কংগ্রেসের প্রিয় বিষয়। কংগ্রেস জিন্নাহর দাবি না মেনে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল।[৮৮]

কলকাতা থেকে পরদিন খুব ভোরে জিন্নাহ দিল্লিতে ফিরে যান। জিন্নাহর একজন পারসি সুহৃদ রেলস্টেশনে আসেন জিন্নাহকে বিদায় জানাতে। জিন্নাহ তাঁর হাত ধরে

কেদে ফেললেন। সজল চোখে বললেন, জামশেদ, এবার আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল।' জিন্নাহর স্ত্রী রত্নাবাঈয়ের মৃত্যুর পর জিন্নাহকে সেই শেষবার কাঁদতে দেখা গিয়েছিল। কংগ্রেসের রাজনীতি হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত জিন্নাহকে ভারতের বিশিষ্ট একজন হয়ে ওঠা থেকে দূরে সরিয়ে দিল।

তথ্যসূত্র :

১. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য 'রাহমান চৌধুরী, জিন্নাহ কেন কংগ্রেস ত্যাগ করলেন?' : মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *ইতিহাস সম্মিলনী প্রবন্ধ সংগ্রহ-৬*, জুলাই সংখ্যা ২০১৮, পৃ. ২৯১-৩৩৮

২. হাসিনা আখতার, *জিন্নাহ-গান্ধী সম্পর্ক*, ঢাকা; অ্যাডর্ন পাবলিকেশন ২০১৩, পৃ. ১২৪

৩. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *জিন্না : পাকিস্তান নূতন ভাবনা*, কলকাতা; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. ডল. ১৩৯৪, পৃ. ৪২

৪. ওই

৫. সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস*, কলকাতা; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ২০১২, পৃ. ৭৮০-৭৮১

৬. ওই

৭. সরল চট্টোপাধ্যায়, *ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ*, কলকাতা; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ ১৯৯০, পৃ. ১৭৩

৮. সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০৩

৯. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৩

১০. হাসিনা আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

১১. সরল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

১২. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

১৩. জওহরলাল নেহরু, *অটোবায়োগ্রাফি অব জওহরলাল নেহরু*, বাংলায় অনূদিত, ঢাকা; নালন্দা ২০০৮, পৃ. ৬৮

১৪. ওই, পৃ. ৬৮-৬৯

১৫. ওই, পৃ. ৮৪

১৬. সরল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

১৭. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, *ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম*, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলী অনূদিত, ঢাকা; স্বপ্নীল প্রকাশনী ১৯৮৯, পৃ. ২৪

১৮. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১৯. সরল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০

২০. জওহরলাল নেহরু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

২১. ওই, পৃ. ৮৯

২২. নজরুল ইসলাম সম্পাদিত, *নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভাষণ সংগ্রহ*, ঢাকা; বর্তমান সময় ২০০০, পৃ. ৫৯

২৩. ওই, পৃ. ৫৯-৬০

২৪. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভয়া নস ফ্রডম*, আসমা চে ধুর ও লয়াকত আল অনূদিত, ঢাকা; স্বপ্নীল প্রকাশনী ১৯৮৯, পৃ. ২৪-২৫
২৫. হাসিনা আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪
২৬. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-২৬
২৭. হাসিনা আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪
২৮. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
২৯. জওহরলাল নেহরু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
৩০. ওই, পৃ. ১২০-১২১
৩১. ওই, পৃ. ১২১
৩২. ওই, পৃ. ১২২
৩৩. ওই, পৃ. ১২২-১২৪
৩৪. ওই, পৃ. ১২৩
৩৫. সরল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৪
৩৬. জওহরলাল নেহরু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫
৩৭. ওই, পৃ. ১২৪
৩৮. যশোবন্ত সিংহ, *জিন্না, ভারত, দেশভাগ ও স্বাধীনতা*, বঙ্গানুবাদ, কলকাতা; আনন্দ ২০০৯, পৃ. ১১০
৩৯. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩-৪৪
৪০. ওই, পৃ. ৪৬
৪১. হাসিনা আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮
৪২. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
৪৩. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, *আমার ধ্যানের ভারত*, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত, কলকাতা; বঙ্গীয় সর্বোদয় সাহিত্য ও সমাজ কল্যাণ সমিতি ২০১৪, পৃ. ৫৮
৪৪. ওই
৪৫. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
৪৬. চারজন মানুষ দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছে; একজন হেঁটে, একজন সাইকেলে চড়ে আর একজন গাড়ি নিয়ে, সেখানে প্রতিযোগিতায় কে জয়ী হবে? খরগোশ আর কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতার যে গল্প রয়েছে, সে সম্পর্কে সমালোচনা করে বলা হয়, কচ্ছপ তখনই জিতবে, যদি খরগোশ সত্যি ঘুমিয়ে পড়ে। না ঘুমালে? মূল কথাটি হচ্ছে, এই প্রতিযোগিতা অসম।
৪৭. শ্যামাপ্রসাদ বসু, *গান্ধীজী : আমার জীবন আমার বাণী*, কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং ২০১১, পৃ. ১২৭
৪৮. মওলানা আবুল কালাম আজাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭-২৮
৪৯. শ্যামাপ্রসাদ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭
৫০. জওহরলাল নেহরু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২
৫১. যশোবন্ত সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩
৫২. জওহরলাল নেহরু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
৫৩. যশোবন্ত সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০
৫৪. ওই, পৃ. ১১৪
৫৫. ওই, পৃ. ১১৪

৫৬. শ্যামাপ্রসাদ বসু, পূবোক্ত, পৃ. ১২৮
৫৭. জওহরলাল নেহরু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
৫৮. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭
৫৯. শ্যামাপ্রসাদ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯
৬০. মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়, *জাতীয়তাবাদী জিন্নাহ*, কলকাতা; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃ. ৭১
৬১. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
৬২. মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
৬৩. শ্যামাপ্রসাদ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২
৬৪. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, *খণ্ডিত ভারত*, কলকাতা; শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস ১৩৫৪, পৃ. ১৪৮
৬৫. হাসিনা আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০
৬৬. শ্যামাপ্রসাদ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১
৬৭. দ্রষ্টব্য, শ্যামাপ্রসাদ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২
৬৮. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২৪
৬৯. সরল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭
৭০. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২-৫৩
৭১. ওই, পৃ. ৫১
৭২. মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬
৭৩. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫১
৭৪. যশোবন্ত সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯
৭৫. ওই, পৃ. ১১৯-১২০
৭৬. স্মরণ রাখতে হবে, এর আগে যখন মুসলিম লীগ জিন্নাহর সভাপতিত্বে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য সবার সাড়া পেলেও কংগ্রেস তাতে যোগ দেয়নি। জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কিন্তু আগের কথা মনে না রেখে কংগ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। সংবিধান রচনার সুবিধার্থে মুসলমানদের সঙ্গে কথা বলে মুসলমানদের দাবিগুলো কংগ্রেসকে আগেভাগেই জানিয়ে দেয় এবং কংগ্রেস তা নীতিগতভাবে গ্রহণও করে।
৭৭. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪
৭৮. যশোবন্ত সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০
৭৯. ওই, পৃ. ১২০-১২১
৮০. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪
৮১. মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
৮২. যশোবন্ত সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২
৮৩. ওই, পৃ. ১২২
৮৪. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫
৮৫. ওই, পৃ. ৫৫
৮৬. যশোবন্ত সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২
৮৭. হাসিনা আখতার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০
৮৮. মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

পর্যালোচনা নিবন্ধ

মুসলিম লীগ কি বাংলার মুসলিমদের মুক্তিদাতা ছিল?

আসহাবুর রহমান

বঙ্গীয় মুসলিম লীগ, পাকিস্তান আন্দোলন, বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা ও বঙ্গবন্ধু;
হারুন-অর-রশিদ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮; পৃষ্ঠা ১১১

কুড়ি শতকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে লেখা গবেষণাগ্রন্থের ক্ষীণধারায় অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদের প্রকাশনাগুলো অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭—এই ১০ বছর আধুনিক বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সময় এবং এর পেছনের রাজনৈতিক কার্যকারণ তাঁর গবেষণার মুখ্য বিষয়। বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসিত বাংলার ইতিহাসের ক্রান্তিকালে চল্লিশের দশকের শেষে পাকিস্তান আন্দোলনের উত্তুঙ্গ সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কীভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, তার অনুসন্ধানী চিত্র এ বইটিতে তিনি তুলে ধরেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের উৎস সন্ধানে এটি তাঁর নতুন অবদান। অধ্যাপক হারুন একজন পরিশ্রমী গবেষক, যিনি দুর্লভ ও অগ্রন্থিত উৎস থেকে আহরিত নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংবেদনশীল দৃষ্টিকোণ দিয়ে ইতিহাসের ঘটনাবলির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করেন। এ দেশে এমন কাজের তুলনা পাওয়া কঠিন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত তালিকায় এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।

অধ্যাপক হারুনের বইটি নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে বাংলাদেশের ইতিহাসবিষয়ক লেখায় আদর্শবাদের প্রভাব সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। মতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা সামাজিক ইতিহাস ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ব্যাখ্যা-

বশ্লেষণে লেখকের বশ্বাসের প্রতফলন ঘে । বাংলাদেশের দার-সেক্যুলার মতাদর্শিক ধারার বাঙালি জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ ও অধ্যাপক-গবেষকদের লেখায় ওই উদার-সেক্যুলার চিন্তার প্রতিফলন আশা করা তাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাক্-১৯৪৭ বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের লেখায় বিস্ময়করভাবে তার বিপরীত মতাদর্শের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সেটি হলো, তাঁরা প্রায় সবাই তাঁদের লেখায় মুসলিম জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের লেখা বাংলার সমাজকাঠামোর হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের সরল তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসরণ করেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী লেখকেরা ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষক জনগণের মূল শোষক-নির্যাতক ব্রিটিশ শাসকদের চিহ্নিত না করে হিন্দুদের উল্লেখ করেন। এভাবে তাঁরা ঢালাওভাবে পুরো হিন্দু সম্প্রদায়কে মুসলিমবিদ্বেষী রূপে চিহ্নিত ও অভিযুক্ত করেন, যদিও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমানদের মতোই শোষিত নিপীড়িত কৃষক। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই মুসলিম জাতীয়তাবাদী ইতিহাস প্রাক্-১৯৪৭ বাংলার সমাজকাঠামোর রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক বিকৃত ব্যাখ্যা। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের রাজনীতি প্রাক্-১৯৪৭ কালে ওই হিন্দুবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক আদর্শবাদের বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়েছিল। এ ধরনের মুসলিম জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা রাজনৈতিক ইতিহাসের তিনটি বই এখানে উল্লেখ করছি: (১) আবুল আসাদ, *একশ বছরের রাজনীতি*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, চট্টগ্রাম-ঢাকা, ১৯৯৪; (২) গোলাম আহমাদ মোর্তজা, *চেপে রাখা ইতিহাস*, মদীনা পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০৭; (৩) মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মতিন, *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতা এবং প্রাসঙ্গিক কিছু কথা*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০০।

এ প্রসঙ্গে বাংলায় মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনের সামাজিক পটভূমির উল্লেখ করা অসমীচীন হবে না। প্রাক্-১৯৪৭ ব্রিটিশ শাসিত বাংলার সমাজ গঠনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে আধিপত্যশীল হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণি বাঙালি মুসলমানকে সমমর্যাদা দিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন। এ ছাড়া বর্ণহিন্দুদের কিছু অমানবিক ধর্মীয় সংস্কার ও আচার-আচরণ দুই সম্প্রদায়ের মাঝে দেয়াল তুলে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানকে এক ও অভিন্ন জাতিচেতনায় বাঁধার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে ওই সময় বাংলার মুসলমানরাও নিজেদের বাঙালি বলে গণ্য করত না। বাঙালি জাতিপরিচয় শুধু হিন্দুরাই বহন করত। হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণির মুসলিম অসূয়া এবং তা কীভাবে ১৯৪৭ সালের দেশভাগে অবদান রেখেছিল, সে বিষয়ে জয়া চ্যাটার্জির *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition* গবেষণাগ্রন্থটি সুবিদিত ও মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয়।[১]

হিন্দু মধ্যশ্রেণির ওই উন্নত সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক অবস্থান নবোত্থিত বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণির মনে ঈর্ষা ও বৈরিতার জন্ম দিয়েছিল। এই অসম সামাজিক গঠন মুসলিম লীগের হিন্দুবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক আদর্শবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে চল্লিশের দশকে মুসলমানদের মাঝে সহজে বৈধতা ও ন্যায্যতা দিয়েছিল। আরেকটি বিষয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে পুষ্ট করেছিল। গত শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা প্রয়োগ ও প্রতীক ব্যবহার করে গান্ধী জনগণকে ব্রিটিশবিরোধী গণ-আন্দোলনে সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর সমান্তরালে একই সময়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা মুসলমানদেরও উদ্দীপ্ত করে, যার বীজ আলিগড়খ্যাত সৈয়দ আহমদ আগেই বপন করেছিলেন। সৈয়দ আহমদের উত্তরসূরি পাঞ্জাবি কবি মুহম্মদ ইকবাল মুসলিম লীগের তাত্ত্বিক গুরুরূপে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতি, মুসলিম আত্মপরিচয় ও স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে উজ্জীবিত করেছিলেন। উত্তর ভারতের মুসলমানদের ওই স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক আদর্শবাদ বাংলার নবোত্থিত মুসলিম মধ্যশ্রেণিকে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রভাবিত না করলেও ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ বাংলায় সরকার গঠনের পর থেকে প্রথমে ফজলুল হক ও পরে সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমের তৎপরতায় অতি দ্রুত তা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং হিন্দু-মুসলিম সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিভাজনকে কাঠিন্য দান করে। তবে বাংলায় মুসলিম লীগের আধিপত্য অর্জনের পেছনে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভ্রান্ত নীতিও সমভাবে কাজ করেছিল। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস হাইকমান্ড সুভাষ বসুকে দল থেকে ১৯৩৯ সালে বহিষ্কার করার পর বাংলা কংগ্রেস মেরুদণ্ডহীন ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বশংবদ হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র ফজলুল হকই পারতেন কৃষক প্রজা পার্টিকে সংগঠিত করে মুসলিম লীগের বিজয়রথ থামাতে। কিন্তু তাঁর দ্বিচারিতা ও ব্রিটিশ শাসকের মুসলিম লীগ-তোষণ সে সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটিয়েছিল।[২]

কিন্তু প্রাক্-১৯৪৭ বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণির আধিপত্য ও হিন্দু জমিদার-মহাজনদের কৃষক শোষণ ছিল বলেই মুসলিম লীগের রাজনীতি ন্যায্য ও পাকিস্তান সমর্থনযোগ্য ছিল, এ চিন্তা মারাত্মক ভুল। তাই কোনো উদার-সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী যদি মুসলিম জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ধারণার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস লেখেন, তবে তাঁর গবেষণাকাজের বস্তুনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন হবে। অধ্যাপক হারুনের আলোচ্য বইটিতে আমরা তা-ই দেখি।

পাকিস্তান আন্দোলন প্রসঙ্গে যে কথাটি মুসলিম লীগপন্থীদের লেখায় অনুল্লেখিত থাকে, তা হলো ভারতে ইসলামি ধর্মীয় চিন্তা-দর্শনের মূলধারার

Ort o•ox যেসব ওলম ও প্রতঙ্ন ছল, তর কন্তু সয়দ অহমদ ও মুসলিম লীগ প্রচারিত মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য এবং স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সমর্থন করেনি, বরং তারা সক্রিয় বিরোধিতা করেছিল। তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা ও তার রাজনৈতিক সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এবং মওদুদীর জামায়াতে ইসলামি হিন্দ। মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন খাকসার তেহরিক এবং মজলিসে আহরার-এ-ইসলাম হিন্দ দল দুটি তো সর্বাত্মকভাবে মুসলিম লীগের রাজনীতি, ভারতভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু এই ওলামা গোষ্ঠী ও পাকিস্তানবিরোধী দলগুলো মুসলিম লীগের রাজনৈতিক প্রভাব ও বিস্তার ঠেকাতে পারেনি। পাঞ্জাব ও বাংলার মুসলিম মধ্যশ্রেণির কাছে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের আবেদন এমনই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল যে দেওবন্দের বিখ্যাত আলিম হুসেন আহমদ মাদানি, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও খাকসার তেহরিকের সম্মোহনী (Charismatic) নেতা আল্লামা ইনায়েতুল্লাহ্ মাশরেকির পাকিস্তান ঠেকানোর সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। তবে এ ক্ষেত্রে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর ফ্যাসিবাদী পদ্ধতিতে ব্যাপক হিন্দু ও শিখবিরোধী সহিংসতা, মুসলিম লীগের ছাত্রসংগঠন মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের ব্যাপক গণসংযোগ তৎপরতা, গ্রামাঞ্চলে পীরদের সমর্থন এবং ভাইসরয় ওয়াভেলের জিন্নাহকে অব্যাহত সমর্থনদান ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের নিরঙ্কুশ আধিপত্য নিশ্চিত করেছিল।[৩]

মুসলিম জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে বাংলার কৃষক জনগণ শুধু মুসলমান হিসেবেই উল্লিখিত হয় এবং তাদের দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে হিন্দু জমিদার-মহাজনদের শোষণ বলা হয়ে থাকে। অথচ পুরো বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা ছিল প্রায় সমান (৫৬ :৪৪) যদিও পূর্ব বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্য পশ্চিমের তুলনায় ছিল অনেকখানি স্ফীত (৬৪ শতাংশ)। কিন্তু পূর্ব বাংলার কয়েকটি জেলায় নমশূদ্র কৃষকেরা মুসলমান কৃষকের মতোই জমিদার-মহাজনশ্রেণির শোষণ-নির্যাতনের শিকার ছিল।

তবে বাংলার সার্বিক দারিদ্র্য ছিল মর্মস্পর্শী এবং তার মূল কারণ ছিল পলাশী-উত্তরকালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলার অকল্পনীয় শোষণ-লুণ্ঠন, যা হাজার বছর ধরে বিকশিত বাংলার অত্যন্ত সমৃদ্ধ কৃষি ও শিল্পোৎপাদনব্যবস্থাকে অভূতপূর্ব নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে ধ্বংস করেছিল। এ শোষণ-লুণ্ঠন ১৮৫৭ সালে কোম্পানির শাসন অবসানের পর ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ধারাবাহিকভাবে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। শুধু স্মরণ করুন কোম্পানির নিষ্ঠুর শাসনে ১৭৬৯-৭০ সালের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) মহামন্বন্তর এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের ব্রিটিশ সরকারসৃষ্ট

মহাদুভক্ষের কথা। দু দুভক্ষে বাংলার লাখ লাখ হতদরদ্র কৃষক অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-লুণ্ঠনের ভয়াবহ ইতিহাস কংগ্রেস নেতা শশী থারুর বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তাঁর *An Era of Darkness: The British Empire in India* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।[৪]

ইংরেজ বাংলার নবাবি শাসন উৎখাত করেছিল বলেই মুসলিম লীগের বুদ্ধিজীবীদের লেখা ইতিহাসে তাঁদের নিন্দা থাকে। কিন্তু এখানে যে শঠতা প্রচ্ছন্ন, তা হলো নবাবি শাসনকে মুসলমানি শাসন এবং এ ক্ষমতাচ্যুতির কারণে মুসলমানরা চরম দুঃখ-দুর্দশা ও স্থায়ী দারিদ্র্যের শিকার হয়েছিল বলে বর্ণনা করা। শুধু তা-ই নয়, হিন্দুরাই ষড়যন্ত্র করে ইংরেজকে ব্যবহার করে মুসলিম শাসন উৎখাত করেছিল এবং ইংরেজ রাজত্বের সব সুযোগ-সুবিধা হিন্দুরা মুসলমানদের বঞ্চিত করে একাই ভোগ করেছে এবং ইংরেজ আনুকূল্যে হিন্দুরা জমিদার হয়েছিল—এই হচ্ছে মুসলিম লীগীয় ইতিহাসের সাধারণ বয়ান, যা এ দেশের দুই বিরোধী জাতীয়তাবাদী ঘরানার বিদ্বানেরা তোতাপাখির নিষ্ঠায় তাঁদের লেখা বইগুলোয় বলে চলেছেন। কিন্তু এ বয়ান ইতিহাসের সরল মিথ্যাচার।

প্রথমত, ১৮ শতকে বাংলার শাসক মুর্শিদাবাদের নবাব বংশ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের শীর্ষ পদধারীরা বাঙালি নন, তাঁরা ছিলেন বহিরাগত অবাঙালি আফগান-মোগল নৃগোষ্ঠীভুক্ত। বিশেষ করে সেনাবাহিনী তাঁদের ও রাজপুত অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন ভাড়াটে, বিশ্বাসঘাতক ও নৈতিকতাহীন ব্যক্তি, দেশাত্মবোধ যাঁদের কাছে ছিল অজ্ঞাত।[৫] দ্বিতীয়ত, ১৭৫৭ সালে বাংলার মুসলিম শাসককে উৎখাতে বাঙালি হিন্দুর কোনো ভূমিকা ছিল না। রাষ্ট্রের রাজস্ব, ভূমি ও কর প্রশাসনে বাঙালি হিন্দুর একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল এবং আজ আমরা যাঁকে অর্থমন্ত্রী বলি, সেই সদর কানুনগো মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে বাঙালি হিন্দুর হাতে ছিল। কিন্তু এ প্রাধান্য সত্ত্বেও নবাব দরবারে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করার অথবা চাপ প্রয়োগের কোনো ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষমতা ছিল রাজপুত ব্যাঙ্কার ফতে চাঁদ পরিবারের হাতে, যারা নবাবের টাঁকশালের মালিক ছিল ও মুদ্রা তৈরি করত। নবাব এ পরিবারের প্রধানকে জগৎশেঠ উপাধি দিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, কলকাতাকে ১৬৯৬ সালে ইংরেজদের দান করেছিলেন বাংলার মোগল সুবাদার আজিম-উস-শান। সুতরাং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেওয়ার সূচনা মুসলমান শাসকেরাই করেছিলেন। বাংলার আফগান-মোগল শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ নবাব পরিবার ও মুর্শিদাবাদ দরবারের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রে দীর্ণ নবাবি শাসন নবাবের সভাসদ ও সেনাপতির সঙ্গে মিলিত ইংরেজের চক্রান্তে ও সামরিক আগ্রাসনে ধসে পড়ে। চতুর্থত, বাংলার জমিদারশ্রেণির সংখ্যাগুরু অংশ হিন্দু ছিল কিন্তু এ

জমিদারশ্রেণি ইংরেজসৃষ্ট নয়। ১৬ থেকে ১৭ শতকে বাংলায় মোগল আগ্রাসনের সময় বিশাল বিশাল জমিদারি বাঙালি হিন্দুর মালিকানায় ছিল, যেগুলো ছিল কয়েক শতাব্দী পূর্ববর্তী পাল, সেন, তুর্কি-আফগান সুলতানি আমলের সামন্ত রাজ্যগুলোর উত্তরসূরি। যেমন বর্ধমানের কীর্তিচন্দ্র, কৃষ্ণচাঁদ রায়, বিষ্ণুপুরের গোপাল সিংহ, বাঁকুড়ার বীর হাম্বীর, মেদিনীপুরের শোভা সিং, মহিষাদলের শুকদেব, যশোরের প্রতাপাদিত্য, পুঠিয়ার অনুপ নারায়ণ, নাটোরের রামজীবন, নবদ্বীপের রঘুরাম, ঘোড়াঘাটের বিশ্বনাথ, শ্রীপুরের কেদার রায়, বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, বাকলার রামচন্দ্র, খালসির মাধব রায়, তাহিরপুরের কংস নারায়ণ, ভূষণার সীতারাম, ভুলুয়ার অনন্তমাণিক্য, দিনাজপুরের রামনাথ, প্রাণনাথ, ত্রিপুরার রামমাণিক্য ও আরও কয়েকজন, যাঁরা বারোভূঁইয়াদের অন্যতম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মোগল বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের জমিদারি অক্ষুণ্ন থাকে এবং তাঁরা সম্রাটের কাছ থেকে মহারাজা উপাধি পেয়েছিলেন। পঞ্চমত, ব্রিটিশ আমলে যে নতুন হিন্দু জমিদারশ্রেণি দেখা যায়, তার সৃষ্টি হয়েছিল মুর্শিদাবাদের মুসলমান নবাবদের দ্বারা এবং এগুলো ছিল অত্যন্ত বিশাল। যেমন নাটোর, দীঘাপতিয়া, মুক্তাগাছা, গৌরীপুর, মুড়াপাড়া, কীর্তিপাশা, ভাগ্যকুল ইত্যাদি। নবাব মুর্শিদকুলি খান রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য পুরো বাংলায় মাত্র ২৫টি জমিদারি রেখেছিলেন। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বড় জমিদারিগুলো ভেঙে প্রায় ১ দশমিক ৫ লাখ ছোট জমিদারির পত্তন ঘটে। এগুলোর মধ্যে মাত্র ৫৩০টি জমিদারি ছিল ২০ হাজার একরের ওপরে। তারপরও বাংলায় মোগল ও নবাবি আমলের কিছু বড় জমিদারি ১৯৪৭ পর্যন্ত টিকে ছিল, যেমন নাটোর, বর্ধমান ও দিনাজপুর রাজ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে মোগল-পূর্ব সুলতানি আমলেও (১৩৩৮-১৫৩৮) বাংলায় হিন্দু সামন্ত রাজাদের সহায়তা ও সমর্থনে গৌড়ের মুসলমান সুলতানদের শাসন চালাতে হতো। তাঁরা এতই প্রতাপশালী ছিলেন যে তাঁদের একজন রাজা গণেশ সুলতান শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে কিছু সময়ের জন্য বাংলার শাসক হয়েছিলেন। গণেশ দিনাজপুরের ভাতুরিয়া পরগনার রাজা ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে এ কথাটিও মনে রাখা দরকার যে ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও ব্রিটিশ যুগ—এই ধর্মভিত্তিক কাল বিভাজনের সূচনা করেছিলেন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) তাঁর সুবিখ্যাত *History of British India* (১৮১৭) বইটিতে। অত্যন্ত প্রভাবশালী এই বই ছিল শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদ, ব্রিটিশ আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও দম্ভের তাত্ত্বিক বয়ান। ভারতের অধিবাসীদের তাদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়ের পরিবর্তে শুধু হিন্দু ও মুসলমান হিসেবে বর্ণনা করার দৃষ্টিকোণ ও রীতি মিলস থেকেই শুরু হয়েছিল।

সুতরাং বলা নষ্প্রয়োজন যে বাংলার জনগণকে মুসলিম লীগ বুদ্ধিজীবদের মতো শুধু হিন্দু-মুসলমান এই দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভাজিত করে ঢালাওভাবে হিন্দুদের মুসলমানদের শোষক-নির্যাতক রূপে চিহ্নিত করা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাসের বিকৃত সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা। এ ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হবে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণব্যবস্থার কাঠামোয় উৎপাদক শ্রেণি যথা, কৃষক ও তার বিপরীতে উদ্বৃত্ত আহরণকারী ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র—এই গঠন অনুযায়ী বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থা ও শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা করা। বাংলায় জমিদারেরা ছিলেন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও কৃষক উৎপাদকশ্রেণির মধ্যবর্তী শ্রেণি, যাঁরা উদ্বৃত্তের একটা অংশ অতিখাজনা (Rack-renting) আদায় করে আত্মসাৎ করতেন, কিন্তু তাঁরা মূল শোষক ও শাসকশ্রেণি ছিলেন না। এ ছাড়া হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের মানুষই জমিদারশ্রেণিভুক্ত ছিল যেমন কৃষকশ্রেণি নমশূদ্র, মাহিষ্য ও মুসলমান উভয় ধর্ম ও বর্ণের অনুসারী দ্বারা গঠিত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তথা বিদেশি ইংরেজের হাতেই ছিল শাসন, রাজস্ব/কর আদায় ও বলপ্রয়োগের একচ্ছত্র আইনি ক্ষমতা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিপরীতে মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার ও মূল উৎপাদক কৃষক, দুটি শ্রেণিই ছিল ব্রিটিশ শাসিত প্রজা, যদিও সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি জমিদারদের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কর্তৃত্বশালী করে তুলেছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে যেসব ইংরেজ বিদ্বান ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাগুলোয় ভারতবাসীকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় (Religious Community), বর্ণ (Caste), গোত্র (Clan), উপজাতি (Tribe), উপসম্প্রদায় (Sect) রূপে চিহ্নিত করেছেন, জাতিরূপে নয়। বিশিষ্ট ইংরেজ সিভিলিয়ান আলফ্রেড লায়াল (১৮৩৫-১৯১১) ভারতের সমাজ, ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর লেখা পাণ্ডিত্যপূর্ণ *Asiatic Studies : Religious and Social* (১৮৮২) বইটিতে যে বয়ান দিয়েছিলেন, তা ব্রিটিশ শাসকদের ভারত শাসননীতির বনিয়াদ তো ছিলই, এমনকি কুড়ি শতকের শেষেও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-গবেষকেরা তা অনুসরণ করেছেন। অথচ ভারতে বাঙালি, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, উড়িয়া, পাঞ্জাবি, মালয়ালি, অসমিয়া, অন্ধ্র, বিহারি প্রভৃতি ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার অস্তিত্ব থাকলেও ব্রিটিশ শাসক তাদের ধর্ম ও বর্ণ পরিচয়কেই প্রাধান্য দিয়েছে। ইংরেজের 'বিভক্ত করো শাসন করো' সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতি ভারতের জনগণকে কঠোরভাবে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, উপজাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি বর্গে ভাগ করে শেষ দিন পর্যন্ত অনুসৃত হয়েছিল। মুসলিম লীগের আদর্শবাদে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক জাতিভুক্ত (Nationality) মুসলমানদের এক ও অভিন্ন মুসলিম জাতি হিসেবে বর্ণনা করে তাকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করা তাই ব্রিটিশ শাসকের কাছে ন্যায্যতা পেয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আরেক বষয়ের ল্লেখ করা যেতে পারে, পূব বাংলার কৃষক দারিদ্র্য সম্পর্কে প্রচলিত বয়ানগুলো যে অনেকটাই অতিকথা, তা ইতিহাসবিদ ইফতেখার ইকবাল তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণাগ্রন্থে দেখিয়েছেন।[৬] তিনি ব্রিটিশ-পূর্ব বাংলার কৃষকসমাজের গঠন ও কৃষি উৎপাদন সেখানকার জৈব পরিবেশব্যবস্থার (Ecosystem) প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে দেখিয়েছেন যে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত তা উচ্চফলনশীল ছিল, যা কৃষককে পর্যাপ্ত শস্য ও পুষ্টি দিয়ে খাদ্যনিরাপত্তা দিয়েছিল। পাটের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক চাহিদা পূর্ব বাংলার পাটচাষিকে নগদ টাকা জুগিয়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিল এবং এই বাড়তি আয় আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কৃষক পরিবারকে জুগিয়ে মুসলিম মধ্যশ্রেণির বিকাশে সহায়তা করেছিল। কুড়ি শতকের শুরু থেকে রেলপথ, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ হাজার বছর ধরে বিকশিত পূর্ব বাংলার জৈব পরিবেশব্যবস্থার স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতাকে বিঘ্নিত করে বন্যা ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে কৃষি উৎপাদন স্থবির ও রোগবালাই মহামারির আক্রমণ বাড়িয়ে দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কচুরিপানার আগ্রাসন। এর ফল হয়েছিল একদা সমৃদ্ধ কৃষকের দারিদ্র্য ও ভূমিহীনতা বৃদ্ধি। শুধু অল্প জমির মালিক কৃষকেরাই কৃষিমজুর ও হতদরিদ্র হিসেবে কৃষিকাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরভুক্ত হয়েছিল, যাদের ভূমিহীন বলা হতো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কৃষক, পুরোনো গ্রামীণ পেশাজীবী গোষ্ঠীগুলো, শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি সবার আর্থিক অবস্থা মন্দার কারণে অবনতিশীল হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক উৎপাদনব্যবস্থায় বাংলার অর্থনীতির ক্রমসংকোচন ও প্রবৃদ্ধি হ্রাসের ফলে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছিল। বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর (১৯৪৪-১৯৪৬) রিচার্ড কেসির লেখায় বাংলার দুর্গতি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'Bengal has, practically speaking, no irrigation or drainage, a medieval system of agriculture, no roads, no education, no cottage industries, completely inadequate hospitals, no effective public health services; consequently there is no real attempt to deal with malaria, which is the province's principal scourge and killer, and no adequate machinery to cope with distress. There are not even plans to make good these deficiencies.'।[৭] কেসির এই বর্ণনা নিষ্ঠুর ঠাট্টা হিসেবেই ধরা উচিত, কারণ বাংলার এই পরিণতি দুই শ বছরের ইংরেজ শোষণের ফলেই ঘটেছিল এবং তিনি গভর্নর থাকাকালেই ৩০ লাখ বাঙালি কৃষক দুর্ভিক্ষে মরেছিল।

ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ভরকেন্দ্র উনিশ শতকের শেষ দশকেই কলকাতা থেকে বোম্বাই-আহমেদাবাদ (মারাঠা-গুজরাট) অঞ্চলে সরে গিয়েছিল।

যুদ্ধোত্তর অর্থনতক মন্দা বাংলার শহরবাস মধ্যশ্রেণ ও কৃষকসমাজকে একইভাবে চরম দুর্গতিতে ফেলেছিল। এ পরিস্থিতিতে নিদারুণ আর্থিক দুরবস্থায় পতিত বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণির কাছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আহ্বান তাদের কাছে মুক্তিসনদ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। বাঙালি হিন্দু মধ্যশ্রেণিও একই অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছিল। কিন্তু তারা সংগঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের গোপন সন্ত্রাসবাদী সহিংস তৎপরতায়, কংগ্রেস পরিচালিত প্রকাশ্য ব্রিটিশবিরোধী গণ-আন্দোলনে ও কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক সংগ্রামে। কুড়ি শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

মুসলিম জাতীয়তাবাদী ও মুসলিম লীগপন্থী ইতিহাসবিদেরা এমনকি জয়া চ্যাটার্জিও হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণির মুসলিমবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক আচরণ নিয়ে থিসিস লিখেছেন এবং তথ্য বিকৃতি ও কুযুক্তি দিয়ে বাংলাভাগের দায় তাদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। কিন্তু মুসলিম জাতীয়তাবাদী লেখকেরা ও জয়া চ্যাটার্জি যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লুকিয়েছেন তা হলো ওই ভদ্রলোকশ্রেণিভুক্ত তরুণদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাতের লক্ষ্যে অসাধারণ দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগ। ওই তরুণদের সহিংস আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ থেকে উদ্ভূত স্বদেশি আন্দোলনে।[৮] স্বদেশি আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা হিন্দুধর্মীয় প্রতীক, আচার-অনুষ্ঠান ও গান ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু সে কারণে তাঁদের তীব্র স্বাধীনতাস্পৃহা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সহিংস সংগ্রামের ন্যায্যতা ও মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ন হয় না। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার যে পথ তাঁরা নিয়েছিলেন, সুভাষ বসু অনেক বড় আকারে সেই পথেই দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা করেছিলেন। এ বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ যে হিন্দু ভদ্রলোকশ্রেণির ওই সন্ত্রাসবাদী তরুণেরাই ৪০ দশকে তাঁদের ব্রিটিশবিরোধী সন্ত্রাসবাদী সহিংসতার বিশ্বাস ত্যাগ করে মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হয়ে বাংলায় শক্তিশালী কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। রাজনীতি ও বৌদ্ধিক সৃষ্টির বাইরে সাহিত্য, সংগীত, নাটক, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, শিল্পকলার এসব মাধ্যমে নতুন নতুন পরীক্ষা ও সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছিলেন, যা আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতিকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করেছিল।[৯]

এ কথাও মনে রাখা দরকার যে ঔপনিবেশিক উৎপাদনব্যবস্থায় বাংলার ধনিকশ্রেণি কিন্তু বাঙালি জমিদারেরা ছিলেন না। ১৮ শতকে ও ১৯ শতকের শুরুতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালি কোটিপতি বণিক ও ধনিকের আবির্ভাব হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা টেকেনি। ১৮৪৭ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইউনিয়ন ব্যাংকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির ধনিক (Capitalist) হওয়ার উদ্যোগের সমাপ্তি ঘটে। ১৮৫৮ সালে কোম্পানির শাসনের অবসানের পর ১৯ শতকের

দ্বত য়াধ থেকে ব্র শ শল্পোদ্যোক্তা ও প্ল্যা ারর বাংলায় মূলধন ব নয়োগ শুরু করেন। রেলওয়ে, জাহাজ নির্মাণ, নীল ও চা খামারগুলোতে ছিল প্রাথমিক বিনিয়োগ। তাদের সঙ্গে পরে যোগ দেন মাড়োয়ারি, খোজা, পার্সি ও গুজরাটি বণিক বিনিয়োগকারীরা। কোম্পানির শাসনামলে বোম্বাইয়ের পারসি বণিকেরা চীনের আফিম-বাণিজ্যে কোম্পানিকে জাহাজ সরবরাহ করে বিপুল অর্থ লাভ করেছিলেন যে আফিম উৎপাদিত হতো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিভুক্ত বাংলা ও বিহার অঞ্চলে। কয়লা ও অভ্র খনি, পাট, চা, রেলওয়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইস্পাতশিল্প ছিল তাঁদের বিনিয়োগক্ষেত্র। এই বহিরাগত অবাঙালি শিল্পপতি ও বণিকেরাই ছিলেন ঔপনিবেশিক বাংলার ধনিকশ্রেণি (Capitalist Class), যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত অর্থনৈতিক শোষণকাঠামোয় প্রান্ত (Periphery) থেকে কেন্দ্রের (Metropolis) অধস্তন সহযোগীর ভূমিকা পালন করত। উল্লেখ্য যে প্রভাবশালী বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ও ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন সম্পূর্ণত ইংরেজ শিল্পপতি ও অবাঙালি বণিকদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।[১০]

বাংলার সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের ওপরে বর্ণিত পটভূমি মুসলিম লীগীয় মতাদর্শ প্রণোদিত ভুয়া ইতিহাস কীভাবে সেক্যুলার-উদারপন্থী বাঙালি জাতীয়তাবাদী বিদ্বানদের প্রভাবিত করে, তা দেখানোর জন্যই বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি। অধ্যাপক হারুনের বইটিতে প্রদত্ত বক্তব্য বুঝতেও উপর্যুক্ত আলোচনা সহায়ক হবে।

এবার দেখা যাক পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম লীগ সম্পর্কে অধ্যাপক হারুনের মূল্যায়ন কী। তিনি বলছেন, 'বাংলায় মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলন ছিল কৃষক-প্রজা আমজনতার (মুসলিম) জমিদার-মহাজনি (হিন্দু) শোষণ-নির্যাতন-নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির আন্দোলন' (পৃষ্ঠা ৭৭)। আরেক জায়গায় এরই সম্পূরক বক্তব্য, 'হিন্দু জমিদার-মহাজনদের শোষণ-নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির সংগ্রামে বাংলার কৃষক-প্রজা মুসলমানদের জন্য বাইরের স্বধর্ম সম্প্রদায়ের সমর্থন সহায়ক ছিল' (পৃষ্ঠা ৩৯)। ঠিক এই বয়ানই মুসলিম লীগ-লিখিত ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে মুসলিম জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস প্রথম লিখেছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুর রহিম।[১১] তাঁর সমসাময়িক মুহম্মদ মোহর আলী, আবদুল করিম, মুঈনউদ্দীন আহমদ খান প্রমুখ খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ মুসলিম জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে স্বতন্ত্রভাবে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখেছিলেন। তাঁদের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ পাকিস্তান আন্দোলন ও পরবর্তীকালের ভাষা আন্দোলন, গণ আজাদী লীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী রাজনীতিবিদ-বুদ্ধিজীবী কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর *Socio-Political History of Bengal and*

Birth of Bangladesh এবং *পূব বাংলার সমাজ ও রাজন* ত ব দু তে একজন উদার-সেক্যুলার অথচ বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের ইতিহাস লিখেছেন, যা পূর্বোক্তদের গোঁড়া পাকিস্তানবাদী চিন্তা-চেতনা থেকে স্বতন্ত্র।[১২] এ ছাড়া তিনি মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদের বাংলার স্বার্থবিরোধী চক্রান্তগুলো সবিস্তারে তাঁর উল্লিখিত বই দুটিতে চল্লিশ দশকের মুসলিম রাজনীতির একজন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

সাম্প্রতিক সময়ের মুসলিম জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ অধ্যাপক তাজুল ইসলাম হাশমি তাঁর *Pakistan As a Peasant Utopia : The Communalization of Class Politics in East Bengal, 1920-1947* বইটিতে কামরুদ্দীন আহমদের পাকিস্তান আন্দোলনের ভাষ্যই অনুসরণ করেছেন।[১৩] যেখানে হাশমি পূর্ব বাংলার মুসলমান (কৃষক) এবং হিন্দু (জমিদার) ধর্মসম্প্রদায়কে দুটি পরস্পরবিরোধী শ্রেণি হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলমান কৃষকের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণকে তাদের শ্রেণিসংগ্রাম হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'Communalization of class-struggle'। হাশমি তাঁর এই বাক্যটি কামরুদ্দীন আহমদের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন, কারণ কামরুদ্দীন আহমদের আগে তা কেউ ওভাবে বলেননি। হাশমি অবশ্য মুসলিম লীগীয় মতাদর্শের ব্যাখ্যাকাররূপে বাংলার সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হিন্দু ও মুসলমান দুটো স্বতন্ত্র জাতি রূপে আবির্ভূত হয়েছিল বলে মনে করেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, 'বাংলার জমিদার, পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত; আর কৃষক, জোতদার ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চাকরিজীবী শ্রেণির এক নগণ্য সংখ্যা ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই হিন্দু সংস্কৃতি বলতে যেমন উঁচু শ্রেণির বাঙালির সংস্কৃতি বোঝায়, তেমনি মুসলিম সংস্কৃতি বলতে প্রধানত বাংলার কৃষক, শ্রমিক, সর্বহারা ও জোতদার শ্রেণির সংস্কৃতি বোঝায়। বাংলাদেশের দুটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়, হিন্দু ও মুসলমান বহুদিন পাশাপাশি বাস করেও একটি অপরটিকে গ্রাস করতে পারেনি। ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে বাংলার শাসকবৃন্দ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হওয়ায় শাসকগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক কারণে শাসিত শ্রেণির সংস্কৃতি তথা চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়নি। তাই বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান এক অভিন্ন সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে এক জাতি সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। ফলে একে অপরের থেকে শুধু দূরে সরে যায়, তাই নয়, একে অপরের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে।'[১৪]

মুসলিম জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী রেজোয়ান সিদ্দিকীর বক্তব্যেও মুসলিম লীগীয় মতাদর্শ অনুযায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি মুসলমানের যোগদান হিন্দু নির্যাতনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে , '১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস যে

চরস্থায় বন্দোবস্ত করেন, তার সবকুকু ফল ভোগ করেন হিন্দু বত্তশাল সম্প্রদায়। তাদের সবাই প্রজা হিসেবে পান মুসলমানদের। ফলে জমিদারি নির্যাতনের সবটাই ভোগ করতে হয় প্রধানত বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের। এই নির্যাতনের ফলে নির্যাতিত মুসলমান সমাজের ভেতরে একধরনের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়—এই প্রেক্ষাপটেই বাঙালি মুসলমান নেতারা সাধারণভাবে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন এবং স্বতন্ত্র প্রাদেশিক কাঠামোর মধ্যে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্ন দেখেন, যা হিন্দু অভিজাত শ্রেণি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে যোগসাজশে হিন্দু অভিজাত শ্রেণি সংখ্যায় গরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের সেই আকাঙ্ক্ষা পর্যুদস্ত করে দেয়। এতে বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা আরও প্রচন্ড রূপ লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সালে এই অঞ্চলের মুসলমানগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে রায় ঘোষণা করেন'।[১৫] প্রফেসর হারুনের বাঙালি মুসলমানের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা হাশমি এবং রেজোয়ানের বয়ানই অনুসরণ করেছে।

হাশমির বয়ানটি বাংলাদেশের কিছু মার্ক্সপন্থী মুসলিম জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যের সঙ্গে তুলনীয়, যাঁরা আফগানিস্তানের আল-কায়েদা, তালেবান ও সিরিয়া-ইরাকের ইসলামিক স্টেটের জিহাদকে লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মুসলমানদের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রাম হিসেবে বর্ণনা করেন। কিন্তু একটি ধর্মসম্প্রদায় অথবা জাতিসত্তা একই সঙ্গে মার্ক্সীয় পদ্ধতিতত্ত্ব অনুযায়ী সামাজিক শ্রেণি হতে পারে না। বাংলায় তো নয়ই। কারণ বাংলার বাংলাভাষী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান—সব ধর্মাবলম্বী এক ও অভিন্ন নৃগোষ্ঠীর (Ethnic Group) অন্তর্ভুক্ত। বাঙালি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল বাঙালি মুসলমান কৃষক-জেলে-তাঁতি-কামার-কুমার শ্রমজীবীদের মতো উৎপাদক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তারা ছিল হিন্দু বর্ণব্যবস্থার সবচেয়ে নিচের স্তরের পঙক্তিভুক্ত নমশূদ্র ও মাহিষ্য নামে চিহ্নিত ও ব্রিটিশ Census Report-এ তফসিলি সম্প্রদায় নামে অন্তর্ভুক্ত। শুধু বাংলায় নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় এই তফসিলি বর্ণভুক্ত দলিতরা ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলায় তারা মুসলিম কৃষকদের মতোই মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার কর্তৃক অতিখাজনা ও মহাজনের ঋণ শোষণে জর্জরিত ছিল। পূর্ব বাংলার এই নমশূদ্ররা বরিশালের যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে পাকিস্তান দাবিকে সমর্থনও করেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত যোগেন মণ্ডলের সেই উদ্যোগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পাকিস্তানি শাসকদের ভয়াবহ হিন্দু উৎপীড়নের ফলে ব্যর্থ হয় এবং তাঁকে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। তাঁকে অনুসরণ করে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে নমশূদ্রদেরও পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিখ্যাত দলিত নেতা মারাঠি

আম্বেদকারও খুব জোরালো ভাষায় পা কস্তান দা ব সমথন করে *Pakistan or the Partition of India* (1940) বইটি লিখে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলো নিয়ে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। সুতরাং পাকিস্তান আন্দোলনকে মুসলমান কৃষকের হিন্দু জমিদারের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রাম ছিল—এই মুসলিম জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যার কোনো মার্ক্সবাদী, সমাজতাত্ত্বিক অথবা বাস্তব ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মার্ক্সবাদী সমাজতত্ত্ব প্রাক্‌ধনতন্ত্রী কৃষক উৎপাদনব্যবস্থায় (Peasant Mode of Production) উদ্বৃত্ত আহরণকারী শাসকশ্রেণি স্বধর্মীদের ছেড়ে শুধু ভিন্নধর্মীদের শোষণ করে এবং শ্রেণিসংগ্রাম স্বধর্মী শোষক ছেড়ে শুধু বিধর্মীদের বিরুদ্ধে চালিত হয়, এমন উদ্ভট ব্যাখ্যা দেয় না। অথচ হাশমি ও অধ্যাপক হারুনের উক্ত বক্তব্য ওই মুসলিম লীগীয় ব্যাখ্যারই অনুরূপ। বাংলার কৃষকেরা মুসলমান ও জমিদার-মহাজনেরা হিন্দু। সুতরাং মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন ন্যায্য ও সমর্থনযোগ্য—এ রকম মুসলিম লীগীয় ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কোনো প্রকৃত বাঙালি জাতীয়তাবাদী অনুসন্ধানী গবেষক দিতে পারেন না।

আরেকটি কথা, বাংলায় সংখ্যায় কম হলেও মুসলমান জমিদার ও জোতদার, বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, মালদা, রাজশাহী জেলাগুলোয় ছিল। আর মুসলমান জমিদারেরা তাঁদের মুসলমান প্রজাদের স্বার্থরক্ষার বেলায় কতটা অনাগ্রহী ছিলেন, অধ্যাপক বজলুর রহমান খান এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত তাঁর *Politics in Bengal, 1927-1936,* (1987) বইটিতে দেখিয়েছেন। উদ্বৃত্তভোগীর শ্রেণিস্বার্থ কখনো উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারী স্বধর্মীকে রেহাই দেয় না।

মুসলিম লীগ শোষিত-নিপীড়িত খুদে কৃষক ও বর্গাচাষিদের জমিদার-জোতদার-মহাজনবিরোধী সংগ্রামে সমর্থন তো দূরের কথা, তার ধারেকাছেও কখনো ছিল না এবং সব সময় তার চরম বিরোধী ছিল। বাংলা মুসলিম লীগের প্রধান নেতারা কৃষক স্বার্থের পক্ষে যেসব নেতা-কর্মী কথা বলতেন, তাঁদের কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে দল ও দলের বিভিন্ন কমিটি থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা করতেন। এ ব্যাপারটি বাংলা মুসলিম লীগের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা যথা মওলানা আকরম খাঁ, নাজিমুদ্দিন, হাসান ইস্পাহানি, নুরুল আমিন প্রমুখ যাঁকে কমিউনিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই দলের মহাসচিব আবুল হাশিম তাঁর *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা (১৯৮৭) বইটিতে, কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, এবং আবুল মনসুর আহমদ তাঁর *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৪ বইটিতে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।[১৬] মার্ক্সবাদ অনুযায়ী একটি রাজনৈতিক দল সমাজে বিদ্যমান উৎপাদনব্যবস্থায় তার শ্রেণিস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। মুসলিম লীগ খুদে কৃষক, ভূমিশ্রমিক ও বর্গাচাষিদের শ্রেণিস্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো দল ছিল না

যে তাদের শ্রেণস্বার্থে লড়বে বরং মুসলম লগের নেতৃত্ব প্রথম থেকে উৎপাদনবিযুক্ত (Non-producing) উদ্বৃত্তভোগী (Surplus Appropriating) জমিদার-জোতদার, ধনিক, বণিক ও পেশাজীবী শ্রেণির দল ছিল।

প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে, চল্লিশের দশকে বাংলার ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাচাষিদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছিল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৩৬ সালে গঠিত কৃষক সংগঠন বঙ্গীয় কিষান সভা। তবে এর সূচনা হয়েছিল কিছু আগে ১৯২৫ সালে আবদুল হালিম, কুতুবউদ্দিন আহমদ, হেমন্ত সরকার, শামসুদ্দিন হোসেন, মুজফফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের উদ্যোগে শ্রমিক স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কিছুদিন পরে দলের নাম পাল্টে শ্রমিক ও কৃষক পার্টি রাখা হয় এবং নজরুল সম্পাদিত *লাঙ্গল* দলের পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় চল্লিশ দশকের শেষ থেকে কমিউনিস্ট নেতা মনসুর হাবিবুল্লাহ, মণি সিংহ, অজয় ভট্টাচার্য, নাঈমউল্লাহ, জোয়াদ আলী, আবদুস সোবহান, শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য, খোকা রায়, নগেন সরকার, প্রমথ গুপ্ত, ভবানী সেন, অজিত রায়, জিতেন ঘোষ, ফণি গুহ, বিভূতি গুহ, মণি বাগচী, রূপনারায়ণ রায়, হাজী দানেশ, আবদুল্লাহ্ রসুল, গুরুদাস তালুকদার প্রমুখ কমিউনিস্ট কর্মীর নেতৃত্বে খুদে কৃষক ও বর্গাচাষিরা সংগঠিত হয়ে জমি ও ফসলের ওপর নিজেদের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে সিলেট, শেরপুর, নেত্রকোনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর অঞ্চলে নানকার, টঙ্কপ্রথা বিলোপ ও তেভাগার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন, যা ব্যাপক সহিংসতায় রূপ নিয়েছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুটি দলই কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক সংগঠন কিষান সভা ও বর্গাচাষিদের জমিদার-জোতদারবিরোধী আন্দোলনের প্রবল বিরোধিতা করেছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ সরকার ভয়াবহ দমন-পীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে কৃষক-বর্গাচাষিদের আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দেয়। কমিউনিস্ট নেতাদের অধিকাংশ হিন্দু হওয়ায় নানকার-টঙ্ক বিলোপ ও তেভাগা দাবিভিত্তিক কৃষক অভ্যুত্থানকে পাকিস্তান ধ্বংসের হিন্দু ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে তা দমনে মুসলিম লীগ সরকারের সুবিধা হয়েছিল। ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডে গুলি চালিয়ে তেভাগা আন্দোলনের ৭ জন কমিউনিস্ট কর্মীকে হত্যা ও ৩২ জনকে আহত করার মাধ্যমে কৃষক সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে। এর কিছু আগে ৫ জানুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে তেভাগার দাবিতে কমিউনিস্ট কর্মী ইলা মিত্র সংগঠিত সাঁওতাল কৃষকদের উত্থান পুলিশ ব্যাপক নৃশংসতা চালিয়ে শেষ করে দিয়েছিল।[১৭] কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই ব্যর্থ কৃষক আন্দোলনের ট্র্যাজিক-পূর্ব দৃশ্য এই ছিল যে পার্টি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে ন্যায়সংগত বলে মুসলিম লীগকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল।[১৮]

সুতরাং মুসলমান কৃষক হিন্দু জমিদার-মহাজনের শোষণ অবসানের আকাঙ্ক্ষায় পাকিস্তান দাবির পেছনে সমবেত হয়েছিল, এ বক্তব্যের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। বরং তা ছিল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির মুসলিম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কামনা। উল্লেখ্য যে মুসলিম লীগের উর্দুভাষী হাইকমান্ড বাংলায় জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ সমর্থন করলেও উত্তর প্রদেশে তা করার বিরোধিতা করেছিল, কারণ সেখানে তারাই ছিল জমিদার-তালুকদার। সুতরাং বাংলায় জমিদারি বিলোপের মুসলিম লীগীয় সমর্থনের প্রকৃতপক্ষে কোনো আদর্শগত ও নৈতিক ভিত্তি ছিল না। তা ছিল শুধু তাদের পাকিস্তান দাবির পেছনে বাংলার মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে বুলিবাগিশি। প্রকৃতপক্ষে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের দাবি প্রথম তোলে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি। কিন্তু বাংলায় মুসলিম লীগের ১০ বছরের শাসনকালে (১৯৩৭-১৯৪৭) মুসলিম লীগ তা বাস্তবায়ন করেনি।[১৯] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চার বছর পর ১৯৫১ সালে মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলায় জমিদারি বিলোপ আইন জারি করে। তত দিনে হিন্দু জমিদারেরা তাঁদের বাড়িঘর, জমিজমা, সম্পত্তি ফেলে সপরিবার ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন।

উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষী মুসলমান জমিদারেরা মুসলিম লীগ ও তার পাকিস্তান দাবির পক্ষে সমবেত হয়েছিলেন এই আশঙ্কা থেকে যে কংগ্রেস শাসিত ভারতে তাঁরা তাঁদের নিজ বাসভূমিতে অভিজাত সামাজিক মর্যাদা, জমিদারি, অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি হারাবেন, কারণ তাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘু। যদিও তাঁরা তাঁদের জনসংখ্যানুপাতের (১৪ শতাংশ) তুলনায় জমির মালিকানা ও সরকারি চাকরিতে হিন্দুর থেকে ভালো অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান সেসবের সুরক্ষা দিতে যে অক্ষম, এ বিষয়টি জেনেও পাকিস্তান দাবির পেছনে মুসলিম অভিজাত শ্রেণি সমবেত হয়েছিল।[২০] জিন্নাহ ছিলেন গুজরাটি ও ইসমাইলি খোজা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত আইনজীবী। উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষী সুন্নি মুসলমানদের চেয়ে আহমেদাবাদ-বোম্বাইয়ের হিন্দু বানিয়া, ইসমাইলি, মেমন, বোহরা ও পারসি বণিক-ব্যবসায়ীরাই ছিলেন তাঁর কাছের মানুষ। কলকাতার অবাঙালি বণিক-ব্যবসায়ীরাও ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন। তিনি বিয়েও করেছিলেন অন্য ধর্মের পারসি নারী। তাই জিন্নাহর উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের মতো মাটিতে কোনো শিকড় ছিল না, হারানোরও কিছু ছিল না। একজন দক্ষ আইনজীবী যেমন তাঁর মক্কেলের মোকদ্দমা জিতিয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালান, জিন্নাহও সে রকম উত্তর প্রদেশের মুসলমান জমিদারদের মামলা [পাকিস্তান] জিতিয়ে দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ আদালতে লড়তে দাঁড়িয়েছিলেন। ইতিহাসের ট্র্যাজেডি এই যে মামলায় জিতলেও উত্তর প্রদেশ ও হায়দরাবাদের মুসলমান ভূস্বামীরা তাঁদের মাতৃভূমিতে বিশাল জমিদারি, রাজপ্রাসাদ, সামাজিক মর্যাদা, অর্থ-বিত্ত সবই খুইয়েছিলেন এবং

এক বস্ত্রে তাঁদের স্বদেশ ছেড়ে করাচি ও লাহোরে মোহাজির হতে হয়েছিল।

জিন্নাহর বেলায়ও তা-ই ঘটেছিল। বোম্বাই হাইকোর্টের আইন ব্যবসা ও মালাবার হিলসের প্রাসাদোপম বাসভবন ছেড়ে পাকিস্তানের গভর্নর-জেনারেল হলেও তা হয়েছিল ক্ষণস্থায়ী এবং তাঁর মৃত্যুও হয়েছিল অবহেলায় অসম্মানে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর উত্তর প্রদেশের বিশাল জমিদারি কারনালের নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের পরিণতি ছিল আরও নৃশংস। জিন্নাহর বোন ফাতিমাও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কাছে ছিলেন অপাঙ্‌ক্তেয় এবং তাঁরও মৃত্যু হয়েছিল অবহেলায়। সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বাধীন আজকের ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তান জিন্নাহর কাঙ্ক্ষিত ছিল কি না, সে প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হলেও পাকিস্তানের ইসলামি মৌলবাদী রাষ্ট্রে ক্রমবিকাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল। পাকিস্তানের গণপরিষদে ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান উত্থাপিত 'Objectives Resolution'-এ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ইসলামের বিধিবিধান অনুযায়ী প্রণীত হবে বলা হয়েছিল। ১৯৫০ সালে সংবিধান রচনার মূলনীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশে আইন প্রণয়নে উলামার মতামত নেওয়ার বিধান অন্তর্ভুক্ত করে তা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

এ ছাড়া ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের জনপ্রিয় স্লোগান 'পাকিস্তান কা মতলব কেয়া, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাকিস্তানের ধর্মতাত্ত্বিক উৎস নির্ধারণ করেছিল। এ স্লোগান আজও পাকিস্তানে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে স্বদেশবিচ্যুত মোহাজিররা ভিটেমাটি হারালেও তাদের মাতৃভাষা উর্দুকে মুসলমানদের জাতীয় ভাষা হিসেবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে চাপিয়ে দিতে সফল হয়েছিলেন। পৃথিবীতে পাকিস্তানই একমাত্র দেশ, যেখানকার জনগণ আপন মাতৃভাষা বিসর্জন দিয়ে একটি বিদেশি ভাষাকে নিজের মাতৃভাষা হিসেবে সানন্দে গ্রহণ করেছে। ভাষার কোনো ধর্ম নেই, কিন্তু উত্তর প্রদেশের মুসলমানরা উর্দুকে ভারতীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়েছে। পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান তা অবশ্য মেনে নেয়নি। তাই তারা খাঁটি মুসলমান নয়। এই তকমা পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে পেয়েছিল।

পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম লীগের সব শীর্ষ নেতাই ছিলেন উর্দুভাষী হিন্দুস্তানি, হায়দরাবাদী ও বোম্বাই-কলকাতাবাসী জমিদার-নবাব ও ব্যবসায়ী (নবাবজাদা, সাহিবজাদা, খানজাদা, রাজা)। কিন্তু তাঁদের স্বদেশ উত্তর প্রদেশ ও হায়দরাবাদে তাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘু। মুসলমানদের অনন্য ধর্ম, বিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতি (দ্বীন, ইমান ও আকিদা, তাহজিব ও তমদ্দুন) রক্ষার দাবি ও আবেদন ছিল প্রকৃতপক্ষে উর্দুভাষীদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ভারতের সব ভিন্নভাষী মুসলমানকে সংস্কৃতি থেকে উন্নততর ও শ্রেষ্ঠতম হিসেবে দাবি করে তাদের আধিপত্য বজায় রাখা, যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পূর্ব বাংলায় চাপিয়ে

দেওয়ার মাধ্যমে প্রকটিত। মুসলিম লীগ হাইকমান্ড যদি সত্যি সত্যি বাঙালি মুসলমানদের প্রতি আন্তরিকভাবে দরদি হতো, তাহলে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নিত এবং জোর করে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত না।

প্রকৃতপক্ষে উর্দুভাষী হিন্দুস্তানি ও পাঞ্জাবি মুসলমানদের বাঙালি মুসলমানদের প্রতি বর্ণবাদী ঘৃণা, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য বাঙালি বর্ণহিন্দুদের চেয়েও গভীর ও ব্যাপক ছিল। এমনকি তাদের স্বগোত্রীয় উর্দুভাষী খাজা নাজিমুদ্দিনও পূর্ববঙ্গবাসী বলে তাদের টিটকারি থেকে রেহাই পাননি এবং শেষাবধি তাঁকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অপদস্থ হয়ে বিদায় নিতে হয়েছিল। পাকিস্তানের মোহাজির-পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব বাংলাকে বঞ্চনার কুটিল ষড়যন্ত্রের কাহিনি কামরুদ্দীন আহমেদ তাঁর *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, আবুল মনসুর আহমদ তাঁর *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* এবং ১৯৭১ সালে আল বদরের হাতে নিহত সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন তাঁর *ইতিহাস কথা কও* (১৯৭৪) বইগুলোতে তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া পাকিস্তানের মোহাজির-পাঞ্জাবি শাসকেরা বাঙালি মুসলমানকে যে মানুষ বলেই কখনো গণ্য করেনি, ১৯৭১ সালে তার প্রমাণ তারা রেখেছে।

বাংলায় ১৯৩৭-উত্তরকালে মুসলমান কৃষকশ্রেণির মাঝে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির মূল আবেদন অধ্যাপক তাজ হাশমি বা অধ্যাপক হারুন যা বলেছেন, সেই হিন্দু জমিদার-মহাজনদের শোষণ-বঞ্চনা থেকে পরিত্রাণের আশা নয় বরং তা ছিল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির হিন্দু আধিপত্যমুক্ত একটি দেশ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কারণ মুসলিম লীগের নেতারা সেভাবেই পাকিস্তানকে বাঙালি মুসলমানের মাঝে প্রচার করেছিলেন। এই আকাঙ্ক্ষা বিপুল শক্তি অর্জন করেছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদের দুর্নিবার আকর্ষণে, যা আজও বাংলাদেশে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণির সম্পৃক্তির পেছনের মূল আদর্শিক (Ideological) চালিকাশক্তিটি ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদ। আবুল হাশিম, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তান দাবিকে সেভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। সিরাজুদ্দীন হোসেনের বইটিতেও বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণির এ আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত। এ কারণেই জমিদারি উচ্ছেদ স্বাভাবিক দাবি হিসেবে বাঙালি মুসলমান কৃষক ও মধ্যশ্রেণির কাছে গৃহীত হয়েছিল।

পৃথিবীর সব প্রাক্-ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় কৃষকশ্রেণির মাঝে একটি সমতাবাদী সমাজ গঠনের আবেদন কার্যকর থাকে, যা ধর্মীয় ভাবাদর্শে চালিত হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা এই চেতনাকে Millenniarism নামে আখ্যায়িত করেন। তাই বাংলা মুসলিম লীগের মহাসচিব আবুল হাশিম পাকিস্তানকে সূচনাকালীন ইসলামের কল্পিত সাম্যভিত্তিক মুসলিম রাষ্ট্রের আদলে বাংলার মুসলমান মধ্যশ্রেণি ও কৃষকদের মাঝে প্রচার করার মাধ্যমে তাঁদের জিন্নাহ, মুসলিম লীগ ও

পাকিস্তানের পক্ষে সংগঠিত করতে সফল হয়েছিলেন। উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম কৃষকদের মাঝে ফরায়েজি ও তরিকায়ে মুহম্মদিয়া (ওয়াহাবি) আন্দোলনের পটভূমি পাকিস্তানের পক্ষে মুসলমান কৃষকদের সংগঠিত করতে আবুল হাশিমকে সহায়তা করেছিল। বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরায়েজি আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। উনিশ শতকের শুরুতে ওয়াহাবি প্রভাবে বহুসংখ্যক বাঙালি মুসলিম কৃষক জিহাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং সুদূর আফগানিস্তান সীমান্তে খাইবার পাখতুনখাওয়ার বালাকোটে গিয়ে প্রথমে শিখ ও পরে সিতানায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জিহাদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাই মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান আবুল হাশিমের প্রচারণায় সাম্যবাদী 'খিলাফত-ই-রাব্বুনিয়া' প্রতিষ্ঠার আবেদন হিসেবে বাংলার মুসলমান মধ্যশ্রেণি ও কৃষককে সহজে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল।

কিন্তু ইতিহাসের নির্মম কূটাঘাত এই ছিল যে ইসলামি সাম্যবাদী আবুল হাশিম, যিনি পাকিস্তানকে শোষণমুক্ত ন্যায়বিচারভিত্তিক কল্পরাজ্য 'খিলাফত-ই-রাব্বুনিয়া' বানাতে চেয়েছিলেন এবং যিনি ১৯৪৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে প্রস্তাবিত স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন তিনি উত্তর প্রদেশ, কলকাতা ও বোম্বাইয়ের উর্দু ও গুজরাটিভাষী অভিজাত জমিদার, বণিক ও ধনতন্ত্রীদের বাঙালি কৃষক শোষণ-শাসনের স্বর্গরাজ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা রেখেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ব্যর্থ-বিধ্বস্ত যোগেন মণ্ডলের মতোই হাহাকার বুকে নিয়ে আবুল হাশিমকে পিতৃভূমি ছেড়ে স্বপ্নভঙ্গের পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আবুল হাশিম খাজা নাজিমুদ্দিন, নুরুল আমিন ও আকরম খাঁর এতই চক্ষুশূল ছিলেন যে শেষোক্তরা আবুল হাশিমের বাড়ি বর্ধমান বিভাগ পাকিস্তানের বাইরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা ভাগ তাই তাঁদের কাছে শাপে বর হয়েছিল। যাঁর অসাধারণ অবদানে পূর্ব বাংলার পাকিস্তানভুক্তি সম্ভব হয়েছিল, তাঁকে পাকিস্তানে খাজা নাজিমুদ্দিন ও মাওলানা আকরম খাঁর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে জেলও খাটতে হয়েছিল। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাভোগের সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত ও বহিষ্কৃত হয়ে এবং উপরি হিসেবে পাকিস্তানি শাসকদের বর্ণবাদী ঘৃণা ও লাঞ্ছনার শিকার হয়ে বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণি তাই পাকিস্তানকে পূর্ব বাংলা থেকে উৎখাতের নতুন সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এই সংগ্রাম সংগঠিত করেছিলেন এবং তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

মুসলিম লীগের নেতৃত্ব যেমন প্রতিষ্ঠার মুহূর্ত থেকে উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষী অভিজাত মুসলিম জমিদারশ্রেণির কুক্ষিগত ছিল, তেমনি বাংলা মুসলিম লীগের নেতৃত্বেও ছিল ঢাকার নবাব হিসেবে খ্যাত অবাঙালি জমিদার খাজা পরিবার, যারা নিজেদের আফগান-ইরানি বংশোদ্ভূত ও উর্দুভাষী বলেই গর্ববোধ করত। খাজা

পরিবারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও জিন্নাহর আস্থাভাজন কলকাতার ধনী ব্যবসায়ী উর্দুভাষী মির্জা হাসান ইস্পাহানি ছিলেন মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা। উর্দুভাষী সোহরাওয়ার্দীও ছিলেন অভিজাত। তাঁদের নিচে যাঁরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতা-কর্মী ছিলেন, তাঁরা সচ্ছল বাঙালি কৃষক ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণিভুক্ত। অধ্যাপক হারুনের ভাষায়, 'কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম ছাত্র তরুণেরাই ছিল বাংলায় মুসলিম লীগ/পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান সংগঠক বা অগ্রসেনানী' (পৃষ্ঠা ২২)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন এই শ্রেণির প্রতিনিধিত্বশীল মুসলিম লীগের কর্মী (কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র)। ফজলুল হক ও বাংলা মুসলিম লীগের মহাসচিব (১৯৪৪-১৯৪৬) আবুল হাশিমও ছিলেন ওই একই শ্রেণিভুক্ত। উল্লেখ্য যে ফজলুল হক মুসলিম লীগে তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরু করলেও কৃষক-প্রজা পার্টিকে (কৃপ্রপা) বাংলার কৃষকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার দল হিসেবে তিনি সংগঠিত করেছিলেন এবং কৃপ্রপার হয়ে খাজাদের ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির জমিদার প্রার্থীর বিপক্ষে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জিতেছিলেন।[২১] ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদানের ফলে তাঁর জনপ্রিয়তার বদৌলতে মুসলিম লীগ বাংলায় ঘাঁটি গাড়তে সক্ষম হয়। তাঁরাসহ বাংলা মুসলিম লীগের সব নেতা-কর্মীর চিন্তা-চেতনায় পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্ররূপেই দৃঢ়মূল ছিল, যার রূপরেখা পাঞ্জাবি কবি ও 'পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা' মুহম্মদ ইকবাল তাঁর রচনা ও বক্তৃতায় বর্ণনা করেছিলেন এবং এসবের মাধ্যমে শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। যদিও ওই স্বপ্নদ্রষ্টার ১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বরে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের ২৫তম বার্ষিক সভায় প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণে প্রস্তাবিত মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম বাংলা অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

উনিশ শতকের শেষ দশকগুলোয় এবং কুড়ি শতকের শুরু থেকে বাঙালি মুসলমান আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে শুরু করে এবং তাদের মাঝে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। কিন্তু জাতি হিসেবে তাদের আত্মসচেতনতা ও আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে মুসলিম রূপে, বাঙালি হিসেবে নয়। এ বিষয়টি রফিউদ্দিন আহমদ তাঁর *The Bengal Muslims, 1876-1906 : A Quest for Identity* নামক গবেষণাগ্রন্থে দেখিয়েছেন। রফিউদ্দিনের ভাষায়, 'মুসলিম আত্মপরিচয়ে তারা রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে সংগঠিত হয়েছিল।'[২২] খোন্দকার সিরাজুল হকও এভাবে বলেছেন, 'বাংলার মুসলমান সমাজ যখন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আত্মসচেতন হয়ে উঠল তখন মুসলিম জাগরণের পথটিই ছিল তাদের সম্মুখে খোলা' (পৃষ্ঠা ১১০)।[২৩] ব্রিটিশ শাসকেরা তাদের ভেদনীতি অনুযায়ী ১৯৩২ সালে Communal Award জারি করে। এর ফলে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে বাংলার

মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের পথ শুধু মুসলিম পরিচয়ে আবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ Communal Award অনুযায়ী ব্রিটিশ শাসননীতিতে আইন পরিষদে 'বাঙালি' নামে কোনো নির্বাচকমণ্ডলী ছিল না, ছিল মুসলমান, বর্ণহিন্দু, তফসিলি, খ্রিষ্টান, শিখ, ভারতীয় খ্রিষ্টান, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ইউরোপিয়ান ইত্যাদি ধর্মীয় ও জাতিবাচক সম্প্রদায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক কুটিল ভেদনীতি প্রয়োগ করে এভাবে বাঙালির নৃগোষ্ঠীভিত্তিক (Ethnic) পরিচয় বিলোপ করে ধর্মভিত্তিক জাতি পরিচয় গঠনের বীজ বপন করেছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে মুসলিম লীগ Communal Award-কে সাদরে গ্রহণ করেছিল, কারণ তা উত্তর প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের সেখানকার আইন পরিষদে নির্বাচিত মুসলিম সদস্য প্রেরণ নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু বাংলায় যেখানে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগুরু, সেখানে তাদের এ ধরনের শাসনতান্ত্রিক সুরক্ষার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। মুসলিম লীগের বুদ্ধিজীবী লেখকেরা এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি লুকিয়ে রাখেন।

মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ তার বার্ষিক অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পর স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই বাংলার মুসলমানদের স্বাধিকার অর্জনের একমাত্র দাবি হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৭ সালের আগে বাংলা মুসলিম লীগ ও বাঙালি মুসলমানের মনে স্বতন্ত্র বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা তাই স্বাভাবিক কারণেই আসেনি। কারণ তারা নিশ্চিত ছিল যে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে অখণ্ড বাংলাই অন্তর্ভুক্ত হবে। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রস্তাবিত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে তাই অখণ্ড বাংলাসহ আসাম প্রদেশও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ চল্লিশ দশকের বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই চেয়েছিলেন, স্বাধীন বাংলা নয়। বঙ্গবন্ধুর পক্ষেও সেই সময় এ চিন্তার বাইরে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা সম্ভব ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিখা গোষ্ঠীর মাঝে সেক্যুলার দৃষ্টিকোণের ক্ষীণ আলো দেখা দিলেও তার কোনো সামাজিক অথবা আদর্শিক ভিত্তি সে সময়ের বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণির মাঝে ছিল না। মুসলিম লীগের উগ্র হিন্দু-বিদ্বেষের ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক সংস্কৃতিই ছিল সে সময়ের আধিপত্যশীল আদর্শবাদ। তাই পাকিস্তান আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কোনো নেতা-কর্মীর মনে সে সময় সেক্যুলার আদর্শনির্ভর বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা ঠাঁই পাওয়া অসম্ভব ছিল।

দ্বিজাতিতত্ত্ব ছিল পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তি এবং লাহোর প্রস্তাব দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রণীত ও গৃহীত হয়েছিল। তাই লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলা ও আসাম নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের বাইরে দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে তৃতীয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বাংলা মুসলিম লীগের আবুল হাশিমের অনুগামী প্রগতিশীল অংশ হয়তো কল্পনা করেছিলেন কিন্তু তা মুসলিম

রাষ্ট্র হিসেবেই তাঁরা কল্পনা করেছিলেন। এই কল্পিত মুসলিম রাষ্ট্রের নাম পূর্ব পাকিস্তান রাখার মধ্যেই তার স্বীকৃতি মেলে। অধ্যাপক হারুনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, 'লাহোর প্রস্তাব বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ ছিল' (পৃষ্ঠা ২৮)। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম জাতি ছাড়া কোনো ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার উল্লেখ নেই। তাই তাতে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্রচিন্তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এরপরেই তিনি বলছেন, 'লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর দ্রুত পাকিস্তান আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের চেতনামূলে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। বাংলায় তা আরও ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করে।' (পৃষ্ঠা ৩২) অধ্যাপক হারুনের পূর্বোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে পরবর্তী বক্তব্য তাই স্ববিরোধী।

বাংলা মুসলিম লীগের সব নেতা-কর্মীর মতো বঙ্গবন্ধুও লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে বাংলা ও আসাম নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হবে ভেবেছিলেন। লক্ষণীয় যে ১৯৪৬ সালের ৭-৯ এপ্রিল দিল্লিতে মুসলিম লীগ লেজিসলেটরস কনভেনশনে যখন মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্নাহ লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে এক অখণ্ড মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন, তখন কিন্তু বাংলা সরকারের মহাপ্রতাপশালী মুখ্যমন্ত্রী ও কনভেনশন সভাপতি সোহরাওয়ার্দী তা সমর্থন করেছিলেন এবং মুসলিম লীগের মহাসচিব আবুল হাশিম প্রতিবাদ করে তা ঠেকাতে পারেননি। জিন্নাহর নির্দেশ সোহরাওয়ার্দী জি হুজুরের মতো পালন করেছিলেন। আবুল হাশিমের প্রতিবাদ ছিল ক্ষীণ কণ্ঠে অথচ পুরো ভারতের মুসলিমদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে জিন্নাহর শক্তির প্রধান উৎস ছিল বাংলার মুসলিম লীগ সরকার। কারণ ভারতের আর কোনো প্রদেশে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করতে পারেনি। জিন্নাহর একনায়কতন্ত্রী নেতৃত্বের সামনে এর আগে ফজলুল হকের মতো বাংলার অসাধারণ জনপ্রিয় নেতা পরাস্ত হয়ে বাংলার স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ৩০ দশকের শেষে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখের মুসলিম লীগে যোগদান ছিল বাংলার সর্বনাশের ঐতিহাসিক বীজ বপন। তাঁরা মুসলিম লীগে যোগদান না করলে খাজা নাজিমুদ্দিন, নুরুল আমিন ও হামিদুল হক চৌধুরীর মতো মুসলিম লীগ হাইকমান্ডের অবাঙালি নেতৃত্বের পদলেহী দাসদের পক্ষে জিন্নাহর অপ্রতিরোধ্য কর্তৃত্ব সত্ত্বেও বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর হতো না। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম যদি সে সময়ই লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন মেনে না নিতেন, তবে হয়তো বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে (এপ্রিল ১৯৪৭) স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতো। বাংলার মুসলিম নেতাদের মধ্যে পাকিস্তানবাদী বন্যার প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে একমাত্র অটল দাঁড়িয়ে ছিলেন সৈয়দ নওশের আলী ও শামসুদ্দিন। সে সময়ে একমাত্র সৈয়দ নওশের আলী ছিলেন প্রকৃত বাঙালি

জাতীয়তাবাদী। তিনি আজ ইতিহাসে উপেক্ষিত।

অধ্যাপক হারুন ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে তৃতীয় রাষ্ট্র হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর অবিভক্ত বাংলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন (পৃষ্ঠা ৩৩-৩৮)। তাঁর মূল গবেষণাকর্মটিও ওই বিষয়ে যা *Foreshadowing of Bangladesh : Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1936-1947*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka নামে প্রকাশিত (১৯৮৭)। কিন্তু এ উদ্যোগ সফল হওয়ার কোনো বাস্তব পরিস্থিতি একেবারেই ছিল না। কারণ তার আগেই সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর প্রতি অতি আনুগত্য প্রদর্শন, পাকিস্তান আদায়ের উগ্র আতিশয্য ও মুসলিম লীগের ফ্যাসিবাদী শক্তিমত্তা প্রমাণের লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে Direct Action Day-কে কেন্দ্র করে যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন, তা দুই মাস পরে অক্টোবরে নোয়াখালীতে গোলাম সরওয়ারের নেতৃত্বে আরও পৈশাচিক আকার ধারণ করেছিল। উল্লেখ্য, ভারতের আর কোনো প্রদেশে Direct Action Day কলকাতা ও নোয়াখালীর মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেনি। এই Direct Action Day ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, বরং তা ছিল হিন্দুর বিরুদ্ধে। এই মর্মন্তুদ ঘটনাপ্রবাহ হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে একেবারে শূন্য করেছিল এবং তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা তিনি পুরোপুরি হারিয়েছিলেন। এ ছাড়া কিছুদিন আগে যাঁর সভাপতিত্বে মুসলিম লেজিসলেটরস সম্মেলনে অখণ্ড পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাঁর মুখে হঠাৎ অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার আহ্বান কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য হবে? Direct Action Day ছিল জিন্নাহর ব্রহ্মাস্ত্র, যা দাঙ্গাকে হাতিয়ার রূপে প্রয়োগ করে দেশভাগকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল। অবশ্য আবুল হাশিমের পুত্র কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী বদরউদ্দীন উমরের মতে, কলকাতার Direct Action Day-র দাঙ্গার মূল সংগঠক ছিলেন নাজিমুদ্দিন, সোহরাওয়ার্দী নন।[২৪]

হাজার বছর ধরে শত বিভেদ-বিরোধ ও অসম বিকাশ সত্ত্বেও বাংলার কৃষি উৎপাদনব্যবস্থার ওপরে যে সমসত্তামূলক কৃষকসমাজ ও সংস্কৃতি অভিন্ন বাঙালি জাতিসত্তা গঠন করেছিল, তা ১৯৪৬-১৯৪৭ সালের সংকটকালে মুসলিম লীগের মানবতাবিরোধী হিংস্র-দানবিক আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। হিন্দুরা যে বাংলার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনায় তারা মুসলমানদের থেকে অনেক অগ্রসর, তদুপরি রাজধানী কলকাতায় যে তারা আধিপত্যশীল, তা অসাধারণ মেধাবী ও কুশলী রাজনীতিবিদ সোহরাওয়ার্দী কেন অনুধাবন করেননি, তা আপাতদৃষ্টে প্রহেলিকা মনে হতে পারে। তবে অনুমান করা অসংগত হবে না যে সোহরাওয়ার্দী এবং বাংলা মুসলিম লীগের 'প্রগতিশীল' অংশ

এই অলীক বিভ্রমে আক্রান্ত ছিলেন যে বাংলা প্রদেশ অবিভক্ত আকারেই পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হবে। অধ্যাপক হারুনও বলেছেন, 'তবে ভারত বিভক্তির সঙ্গে যে বাংলারও বিভক্তি ঘটবে, এ জন্য বঙ্গীয় মুসলিম লীগের অন্তত সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম সমর্থক নেতা-কর্মীরা আদৌ প্রস্তুত বা তাঁদের ভাবনা-চিন্তায় ছিল না' (পৃষ্ঠা ৫৫)। অথচ এই সহজ-সরল হিসাবটি তাঁরা গায়ের জোরে বুঝতে চাননি যে, যে যুক্তিতে মুসলিম লীগ ভারতের বিভাজন দাবি করছে, কংগ্রেস, মহাসভা ও আকালি দল সেই একই যুক্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভাজন চাইবে। ব্রিটিশ সরকার জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের সব অন্যায় দাবি মেনে নেওয়ার ব্যাপারে অতিনমনীয় হলেও পাঞ্জাব ও বাংলাকে অবিভক্ত আকারে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি, কংগ্রেসের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের শর্ত অনুযায়ী মাউন্টব্যাটেনকে বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ সংখ্যাগুরু জেলাগুলো কেটে নিয়ে খণ্ডিত ভারত ইউনিয়নকে দিতে হয়েছে।[২৫] মুসলিম লীগ পাঞ্জাব ও বাংলা অখণ্ড রাখার সম্ভাবনা নিজেই নষ্ট করেছিল ১৯৪৭ সালের শুরু থেকে জিন্নাহর সম্মতিতে পাঞ্জাবে নাৎসি পদ্ধতিতে অব্যাহতভাবে হিন্দু ও শিখবিরোধী সন্ত্রাস ও দাঙ্গা চালিয়ে খিজির হায়াৎ খানের ইউনিয়নিস্ট সরকারের পতন ঘটানোর জন্য।[২৬] আর রণবিধ্বস্ত স্খলিত শক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হতোদ্যম শেষ গভর্নর মাউন্টব্যাটেন তড়িঘড়ি করে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য শতাব্দীর ভয়াবহতম মানবিক বিপর্যয়ের তোয়াক্কা না করে বাংলা ও পাঞ্জাবকে কসাইয়ের মতো দুই ভাগ করে জিন্নাহকে পাকিস্তান দিয়েছিলেন। অবশ্য মানব ইতিহাসের নৃশংসতম সাম্রাজ্যের শাসকদের কাছ থেকে পাঞ্জাব ও বাংলার জনগণের কোনো মানবিক আচরণ আশা করা অনুচিত ছিল। ১৯৪৭ সালের মাত্র তিন বছর আগেই ব্রিটিশ শাসকেরা বাংলার প্রায় ৩০ লাখ দরিদ্র কৃষককে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে হত্যা করেছিল। তা ছাড়া চার্চিলের কাছে বাঙালিরা ছিল পোকামাকড়তুল্য তুচ্ছ জীব, যাদের জীবনের কোনো দাম ছিল না এবং ব্রিটিশ রক্ষণশীল দল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে জিন্নাহকে পাকিস্তান দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল।

অধ্যাপক হারুন সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসু প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলা উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ৩৭), তা অবশ্যই যথার্থ। তবে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতির প্রকৃত মর্মবস্তু স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেননি। মুসলিম লীগের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল সংযুক্ত প্রদেশ (ব্রিটিশ শাসনে United Provinces of Agra and Oudh, বর্তমানে উত্তর প্রদেশ), হায়দরাবাদ (বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশ) ও বোম্বাইয়ের উর্দু ও গুজরাটিভাষী মুসলমান যারা ওই দুই প্রদেশে সংখ্যালঘু হলেও জমিদার ও ধনী বণিক-শিল্পপতি ছিল ওই সামন্ত ও ধনতন্ত্রী শ্রেণির অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করা। এই অবাঙালি মুসলিম অভিজাত ও

ধনিকশ্রেণির সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্রিটিশ শাসনোত্তর ভারতে সংরক্ষণই ছিল মুসলিম লীগের রাজনীতির মূল লক্ষ্য। এতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বসবাসকারী ভিন্ন ভিন্ন জাতিভুক্ত দারিদ্র্যপীড়িত মুসলমান কৃষক-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার কিছু ছিল না। এই রাজনীতির জন্মদাতা ছিলেন দিল্লির মোগল অভিজাতবংশীয় আলিগড় কলেজখ্যাত সার সৈয়দ আহমদ খান, যাঁকে আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে ব্রিটিশ শাসক Knight Commander of the Order of Star of India (KCSI) পদকে ভূষিত করেছিল। তিনিই ছিলেন দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভাবক। ভারতের মুসলমানদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল: ১. কখনোই ব্রিটিশের বিরোধিতা করবে না; এবং ২. সর্বদা হিন্দুদের সংসর্গ পরিহার করে চলবে। এই সৈয়দ আহমদীর নির্দেশ কুড়ি শতকের তৃতীয় দশকে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনের আদর্শবাদী বনিয়াদ হয়ে দাঁড়ায় এবং পাঞ্জাবি কবি মুহম্মদ ইকবাল, যাঁকে পাকিস্তানিরা 'পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা' উপাধিতে ভূষিত করেছিল, তিনি প্রথম সেটি একটি সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রকাঠামোয় ব্যাখ্যা করেন। জিন্নাহ ইকবালের দ্বারা মতাদর্শিকভাবে দীক্ষিত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে মুসলিম লীগের রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাসের সব গবেষকের মতো অধ্যাপক হারুনেরও মনোযোগ এড়িয়ে গেছে যে মুসলিম লীগের রাজনীতির মূল বনিয়াদ, 'ভারতের মুসলিম জনসাধারণকে হিন্দু শাসন-শোষণ, নির্যাতন ও আধিপত্য থেকে মুক্ত করার জন্য পাকিস্তান প্রয়োজন'—এই দাবিটি শুধু প্রযোজ্য ছিল উত্তর প্রদেশের মুসলমান ভূস্বামী ও গুজরাট-বোম্বাইয়ের ধনী ব্যবসায়ী ও উদীয়মান শিল্পপতিদের ক্ষেত্রে, যেখানে উত্তর প্রদেশের মুসলমানরা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৪ শতাংশ (১৯৪১), হায়দরাবাদে আরও অনেক কম। বাংলায় মুসলমানরা ১৮৭১ সালের পর থেকেই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশেও তা-ই। ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের হিন্দু শাসনে বাস করার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। উল্টো বাংলার হিন্দুরাই ১৯৩৭ সাল থেকে মুসলমান শাসনে বাস করছিল এবং এর বিপরীত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ভবিষ্যতেও হতো না। অর্থাৎ ওই অর্থে প্রাক্-১৯৪৭ সালের অখণ্ড বাংলা প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তান হয়েই ছিল। সুতরাং মুসলিম লীগের রাজনীতির কোনো বাস্তব ভিত্তিই বাংলায় ছিল না এবং এ রাজনীতির কোনো আবশ্যকতাও বাংলায় ছিল না। তাহলে কোন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বা কোন কারণে বাংলার মুসলমানরা মুসলিম লীগের কাতারে শামিল হয়েছিল? এর জবাবে অধ্যাপক হারুনের উল্লিখিত ব্যাখ্যা, 'পাকিস্তান আন্দোলন কৃষক-প্রজা আমজনতার (মুসলিম) জমিদার-মহাজনি (হিন্দু) শোষণ-নির্যাতন-নিষ্পেষণ থেকে

মুক্তির আন্দোলন' (পৃষ্ঠা ৭৭) শুধু ভুলই নয় বরং তা মুসলিম লীগের বহুল প্রচারিত ও উল্লিখিত বক্তব্যেরই পুনরুক্তি মাত্র। ওই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে, 'শুধু মুসলিম আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসের কারণে।'

পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণি আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের পরও নিজেকে বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করতে দ্বিধান্বিত ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কিছু বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ ছাড়া পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণি বাঙালি হিন্দুর পাশে দাঁড়ায়নি। কুচক্রী ইংরেজ শাসক যে বিভেদের বীজ বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে বাংলায় রোপণ করেছিল, তা মুসলিম লীগের প্ররোচনায় বাংলার মুসলমানদের উত্তর প্রদেশের উর্দুভাষী মুসলমানদের স্বজাতিভুক্ত হওয়ার আদর্শিক প্রেরণা দিয়েছিল। একটি আদর্শবাদ যখন জনগণের ব্যাপক সমর্থন লাভ করে, তখন তা সমাজে স্বয়ম্ভর শক্তি অর্জন করে। মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম জনগণের কাছে ইসলামি রাষ্ট্ররূপে কল্পিত হয়েছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে তাদের কাছে তাই 'পাকিস্তান কা মতলব কেয়া, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর স্বাভাবিক পরিণতি ছিল প্রবল মধ্যযুগীয় জিহাদি আবেগ ও উগ্র হিন্দুবিদ্বেষ। এই আদিম হিংস্র শক্তিকে উন্মুক্ত করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সোহরাওয়ার্দীর মতো পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইউরোপীয় বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে দীক্ষিত রাজনীতিবিদ এবং আবুল হাশিমের মতো মানবতাবাদীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁদের অসহায় দৃষ্টির সামনে বাংলা ভাগ হয়ে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল। এতে কোনো আনন্দ ছিল না। আবুল হাশিমের মতো ব্যর্থ-হতাশ সোহরাওয়ার্দী তাই পিতৃভূমি ছেড়ে ১৪ আগস্টের অনেক পরে পাকিস্তানে এসেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুও হয়েছিল বিদেশে করুণ ও উপেক্ষিত অবস্থায়। পাকিস্তানের মোহাজির-পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আপস করে প্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনি পূর্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালের মুসলিম বাংলার প্রধানমন্ত্রীর কোনো মূল্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কাছে ছিল না।

এ কথা ঠিক যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হলেও বাংলায় হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণি সমাজে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, চিন্তা-চেতনায়, বৌদ্ধিক অনুশীলনে ও অর্থনীতিতে মুসলমানদের তুলনায় অগ্রসর ও প্রতিপত্তিশীল ছিল। কিন্তু তাদের উন্নত অবস্থা তো বাংলাকে সারা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসু, সত্যেন বসু, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা, প্রশান্ত মহলানবিশ—তাঁদের সারা ভারত বাঙালি বলেই চিনত এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁদের অনেকে ছিলেন খ্যাতিমান। তাঁরা তো ছিলেন বাংলার প্রতিভা, বাংলার গৌরব, বাংলার সম্পদ। সুভাষ বসুর অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা ও কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আপসকামিতা ও

বাংলার স্বার্থবিরোধী রাজনীতি ও কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করে ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের সশস্ত্র সংগ্রাম তাঁকে বাংলার অন্যতম বিপ্লবী নেতার আসন দিয়েছিল। হিন্দু বিধায় তাঁদের অগ্রসর অবস্থান বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণির বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, এ চিন্তা ছিল অস্বাভাবিক। প্রাক্-১৯৪৭ বাংলা মুসলিম লীগের প্রগতিশীল নেতারা যে স্বাধীন মুসলিম বাংলা রাষ্ট্র বা স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান চেয়েছিলেন, তা হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই চেয়েছিলেন। কিন্তু সে চাওয়া ছিল আত্মঘাতী। কারণ ২০ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে এবং ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ বাংলায় সরকার গঠনের পর বাঙালি মুসলমান দ্রুত শিক্ষায়, সংস্কৃতিচর্চায়, রাজনীতিতে, চাকরিতে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হস্তগত হয়েছিল। হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির সঙ্গে এই নবোত্থিত মুসলমান ভদ্রলোক শ্রেণি মিলে বাংলায় বহুত্ববাদী সংস্কৃতির ভিত্তিভূমির ওপর একটি সমন্বিত আধুনিক বাঙালি জাতি গঠিত হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। বাঙালির ইতিহাসের এই ক্রান্তিকালে মুসলিম লীগ তার পাকিস্তান আন্দোলনের জাতিবিধ্বংসী খড়্গ চালিয়ে সে সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। শুধু তা-ই নয়, অধ্যাপক হারুনের বক্তব্য অনুযায়ী হিন্দু জমিদার-মহাজনের শোষণ-নির্যাতনের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য চল্লিশের দশকে বাঙালি মুসলমান যে পাকিস্তান চেয়েছিলেন, সেই চাওয়া ও পাওয়ার ভয়াবহ মূল্য তাদের ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দিতে হয়েছিল।

সুতরাং হিন্দু জমিদার-মহাজনদের শোষণ-নির্যাতনমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের কল্পনা প্রাক্-১৯৪৭ কালে লাহোর প্রস্তাবে নিহিত ছিল ও বাংলা মুসলিম লীগের প্রগতিশীল নেতারা এ রকম একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যই মুসলিম লীগে সক্রিয় হয়েছিলেন—অধ্যাপক হারুনের এই সিদ্ধান্ত অলীক বৈ কিছু নয়। হিন্দু আধিপত্যমুক্ত স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের রাষ্ট্র ছিল। প্রথমটি মুসলিম জাতীয়তাবাদের দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক ও দ্বিতীয়টি উদার গণতান্ত্রিক বাঙালি নৃগোষ্ঠীভিত্তিক। প্রথমটি মধ্যযুগীয় আদর্শভিত্তিক ধর্মরাষ্ট্র, দ্বিতীয়টি আধুনিক মানবিকতাবাদী রাষ্ট্র।

অধ্যাপক হারুনের সব বিভ্রান্তির পেছনের কারণটি হলো তাঁর প্রাক্-১৯৪৭ ভারতে জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করা এবং পাকিস্তান আন্দোলন বাঙালি মুসলমানের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল এ মতে বিশ্বাস করা। শুধু এটুকু নয়, এ বিভ্রান্তি আরও গভীর হয়ে দাঁড়ায় যখন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে তিনি সামাজিক শ্রেণির সঙ্গে এক করে দেখেন। যদিও তাঁর এ বক্তব্য, 'বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান সমন্বয়ে অভিন্ন জাতিসত্ত্বাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা ছিল কিন্তু ব্রিটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত, দুটি সম্প্রদায়ের অসম বিকাশ, ব্রিটিশের বিভেদনীতির শাসন ও রাজনীতির সর্বভারতীয়করণ তা নষ্ট করে দিয়েছিল' (পৃষ্ঠা ৭৭) থেকে মনে হতে পারে, তিনি বোধ হয় সমন্বিত বাংলা রাষ্ট্রের অভিলাষী। হয়তো সেটি সত্য। কিন্তু লক্ষণীয় যে বাঙালি জাতিসত্তাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা নষ্ট হওয়ার চারটি হেতু উল্লেখ করলেও মূল কারণটি তিনি এড়িয়ে গেছেন। মুসলিম লীগের বাঙালিবিদ্বেষী ভূমিকা ৪০ দশকের বাংলার রাজনীতির অন্যতম নিবিড় বিশ্লেষক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েনি। অথচ সমকালীন মুসলিম লীগের কুশীলব কামরুদ্দীন আহমদ ও আবুল হাশিমের অকপট জবানিতে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের জন্ম ব্যর্থ হয়েছিল এ জন্য নয়, যা জয়া চ্যাটার্জি বলেছেন। তা হয়েছিল ফজলুল হক ও সৈয়দ নওশের আলী বাদে বাংলার সব মুসলমান নেতার ১৯৪২ সাল থেকে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ হাইকমান্ডের নির্দেশ ও আদেশ অন্ধের মতো পালনের কারণে। জিন্নাহর প্রতি অন্ধ আনুগত্য তাঁদের এতটাই বুদ্ধিবিচারহীন করেছিল যে মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ককাস All India Muslim League Council-এ বাংলার একজন বাঙালি নেতাকে যে তিনি কখনো ঢুকতে দেননি, তা দেখেও তাঁরা মুসলিম লীগের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে পারেননি ও জিন্নাহকে চিনতে পারেননি।

শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এবং প্রতিষ্ঠার পরেও রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ও পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবিদাওয়ার প্রশ্নে জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, খাজা নাজিমুদ্দিন, চৌধুরী মুহম্মদ আলী, গোলাম মুহম্মদ, নুরুল আমিনের যে চরম একনায়কতন্ত্রী আচরণ ও বাঙালিবিদ্বেষী কর্মতৎপরতা, তাতে মুসলিম লীগ সম্পর্কে কারও অণু পরিমাণ মোহ থাকার কথা নয়। যদি তা-ও থাকে, ১৯৭১ সালের পর তা অন্তত একজন বাঙালি জাতীয়তাবাদীর থাকার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে জিন্নাহ থেকে আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান ও জিয়াউল হক এক অভিন্ন ধারাবাহিকতা, এক অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা এবং বর্তমানের পাকিস্তানের সামরিক-অসামরিক শাসক চক্র তাদেরই বিশ্বস্ত অনুসারী, যারা বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলোপ করতে পারলে সবচেয়ে খুশি হবে।

জিন্নাহ ছিলেন 'কায়েদে আজম' অর্থাৎ 'সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা', দলের একক ক্ষমতাধর সর্বোচ্চ ব্যক্তি। এটি তুলনীয় জিন্নাহর সমসাময়িক জার্মান একনায়ক হিটলারের Fuhrer ও ইতালির একনায়ক মুসোলিনির Il Duce উপাধির সঙ্গে। Fuhrer ও Il Duce শব্দ দুটির অর্থও সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। হিটলার ও মুসোলিনির সহযোগী ছিলেন স্পেনের সামরিক একনায়ক ফালানিজস্ট দলের জেনারেল ফ্রাঙ্কো। তাঁরও উপাধি ছিল El Caudillo অর্থাৎ নেতা। জিন্নাহর মুসলিম লীগ হিটলারের নাৎসি

ও মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট পার্টি দুটোর মতোই একনায়কতন্ত্রী রাজনৈতিক দল ছিল। একই সময়ে রাশিয়ায় স্তালিন হিটলারের মতোই পার্টির চরম ক্ষমতাধর সেক্রেটারি জেনারেল রূপে রাষ্ট্রের একনায়ক হয়ে উঠেছিলেন। সমকালে চীনেও সামরিক একনায়ক Generelissimo চিয়াং কাই শেক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মিসর ও দক্ষিণ এশিয়ায় পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামের অনুষঙ্গে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, যার সঙ্গে জার্মানি, স্পেন, জাপান ও ইতালির নাৎসি, উগ্র জাতীয়তাবাদ, জাপানি সমরবাদ ও ফ্যাসিবাদের হিংসাত্মক মতাদর্শের তুলনা চলে। নাৎসিবাদ, ফ্যাসিবাদ ও জাপানি সমরবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাভূত হলেও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ আজও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাবশালী আদর্শবাদ হিসেবে কার্যকর রয়েছে। বিশ্বে দুটি রাষ্ট্র ওই আদর্শবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—ইসরায়েল ও পাকিস্তান। তবে উল্লেখ্য যে মিসরে ইঙ্গ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদও চল্লিশের দশকে শক্তিশালী মতাদর্শ রূপে জন্ম নিয়েছিল এবং সে মতাদর্শের অনুসারীরাই ১৯৫২ সালে মিসরে ও ১৯৬২ সালে আলজেরিয়ায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে।

পাকিস্তান জন্মের (১৪ আগস্ট, ১৯৪৭) অল্প কদিন পরেই জিন্নাহর মৃত্যু (১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮) হলেও ১৯৪৭-উত্তর পাকিস্তান সামরিক একনায়কদের শাসনকবলিত ছিল দীর্ঘকাল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে জিন্নাহ ছিলেন হিটলার ও মুসোলিনির মতোই একজন চরম একনায়কতন্ত্রী শাসক, যার লক্ষণগুলো তিনি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হওয়ার পর থেকেই দৃশ্যমান হয়েছিল। জিন্নাহর একনায়কতন্ত্রী চরিত্র আবুল মাল আবদুল মুহিত চমৎকারভাবে তাঁর *History of Bangladesh* গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন, 'The numerical superiority of the eastern leadership was undermined by two deliberate measures. First, the Hindus were sidetracked on the plea of of their earlier opposition to Pakistan. Second, a military bureaucratic coterie was forged to fight and suppress the Bengalis. This development unfortunately owes its origin to the dictatorial ways of Pakistan's father of the nation. The Governor General of Pakistan M A Jinnah acted as both head of the state and head of government. He was president of the ruling party, president of the Constituent Assembly and he presided over the Cabinet meetings.' (দেখুন, Abul Maal A Muhith, *History of Bangladesh : A Subcontinental Civilization*,

University Press Limited, Dhaka, 2016, পৃষ্ঠা, ১৬৫)। শুধু এটুকু নয়, ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী (১৯৪৫-৪৬) ও মন্ত্রিসভা মিশনের (মার্চ-মে, ১৯৪৬) সদস্য A V Alexander জিন্নাহর কুটিল মানসিকতার চমৎকার বর্ণনা তাঁর ডায়েরিতে এভাবে দিয়েছিলেন, 'I have never seen a man with such a mind twisting and turning to avoid as far as possible direct answers. I came to the conclusion that he [Jinnah] is playing this game, which is one of life and death for millions of people, very largely from the point of view of scoring a triumph in a legal negotiation by first making large demands and secondly insisting that he should make no offer reducing that demand but should wait for the other side always to say how much they would advance towards granting that demand." (Alexander Diaries, 16 April, 1946)।

জিন্নাহর আমলানির্ভর রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতির কারণে তাঁর মৃত্যুর পরপরই ক্ষমতা পাঞ্জাবি আমলাদের হাতে চলে যায় এবং তারা মোহাজির প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে হত্যা (১৬ অক্টোবর ১৯৫১) করে পাকিস্তানের শাসক হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তানে প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা অবশ্য ১৯৫৫ থেকে সামরিক বাহিনীর হাতেই রয়ে গেছে। পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী দেশের সবচেয়ে বড় সংগঠিত রাজনৈতিক দল এবং সম্পদশালী সংগঠন (দেখুন, Ayesha Siddiqa, *Military Inc., Inside Pakistan's Military Economy*, Pluto Press, 2007)।

আমরা আশা করব অধ্যাপক হারুন মুসলিম লীগ ও জিন্নাহ সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত ধারণার পুনর্মূল্যায়ন করবেন এবং ১৯৪৭ সালে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র আবির্ভাবের ব্যর্থতা থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সূত্রটি বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক কালপরিক্রমার কাঠামোয় ন্যস্ত করে আমাদের আরেকটি চমৎকার রাজনৈতিক ইতিহাসের বই উপহার দেবেন।

তথ্যসূত্র :

১. Joya Chatterji, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition, 1932-1947*; Cambridge University Press, 1994.

২. দেখুন Sana Aiyar, Fazlul Huq, "Region and Religion in Bengal: The Forgotten Alternative of 1940-43" *Modern Asian Studies*, Vol. 42. No. 6, Nov. 2008, pp 1213-1249; Dharitri Bhattacharjee, "Provincial Autonomy, Decolonization, War and Nationalism: Fazlul Huq's Chiefministership Tenure 1937-1943", *South Asian History and Culture*, Routledge, 2018.

৩. (দেখুন, Ian A Talbot, "The Growth of the Muslim League in the Punjab, 1937-46"; Mushirul Hasan (ed.) *India's Partition*, Oxford University Press, 1994; David Gilmartin, "Religious Leadership and Pakistan Movement in the Punjab" (পূর্বোক্ত)।

৪. Shashi Tharur, *An Era of Darkness: The British Empire in India*, Aleph, New Delhi, 2016.

৫. (দেখুন, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা, প্রথমা, ২০১৬)।

৬. Iftekhar Iqbal, *The Bengal Delta : Ecology, State and Social Change, 1840-1943*; Palgrave, 2010.

৭. Richard Gardiner Casey, *Personal Experiences, 1939-1946*, David McKay Co., New York, (1962), page 210.

৮. Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908* (New Edition), Permanent Black, Ranikhet, 2011.

৯. দেখুন, ধনঞ্জয় দাশ (সম্পা.), মার্ক্সবাদী সাহিত্য বিতর্ক, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

১০. (দেখুন, Tirthankar Roy, *The Economic History of India, 1857-1947*, Oxford University Press, 2000; A Z M Ifttkhar-ul-Awal, *The Industrial Development of Bengal, 1900-1939*, University Press Ltd., 1982.

১১. Md. Abdur Rahim, *Muslim Society and Politics in Bengal, 1757-1947*, University of Dacca, (1978).

১২. Kamruddin Ahmed, *Socio-Political History of Bengal and Birth of Bangladesh*, Inside Library, Dacca, (1975) এবং *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা, ইনসাইড লাইব্রেরি, (১৯৭৬)।

১৩. Tajul Islam Hashmi, *Pakistan As a Peasant Utopia : The Communalization of Class Politics in East Bengal, 1920-1947*, Westview, (1992)

১৪. তাজুল ইসলাম হাশমী, *ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি : ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ*, সুকান্ত একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৫৬-৫৭।

১৫. দেখুন, রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২৯-৩১)।

১৬. ১৯৪২ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন করার নীতি গ্রহণ করে এবং পার্টির কর্মীদের মুসলিম লীগে অনুপ্রবেশের অনুমতি দেয়। তাই আবুল হাশিমের সমাজতান্ত্রিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আহ্বান মুসলিম লীগের কট্টর দক্ষিণপন্থী নেতাদের কাছে অনুপ্রবেশকারী কমিউনিস্টের বক্তব্য হিসেবেই মনে হয়েছিল।

১৭. দেখুন, Badruddin Umar, *The Emergence of Bangladesh : Class Struggles in East Pakistan (1947-1958)*; Oxford University Press,

2004, chapters 16-17.

১৮. দেখুন, Habib Manzer, "The Communist Party and the Muslim League, 1937-1947", Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 64 (2003).

১৯. ১৯৩৭-১৯৪৭ দশকে ডিসেম্বর, ১৯৪১ থেকে মার্চ, ১৯৪৩ পর্যন্ত ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদের প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন সরকার মুসলিম লীগ শাসনের ১৫ মাসের সাময়িক বিরতি ঘটিয়েছিল।

২০. দেখুন, Lance Brennan, 'The Illusion of Security : The Background to Muslim Separatism in the United Provinces', in Mushirul Hasan (ed.), *Partition of India*, Oxford University Press, 1994.

২১. কৃষক প্রজা পার্টি সম্পর্কে দেখুন, Humaira Momen, *Muslim Politics in Bengal, A study of Krishak Praja Party and the Elections of 1937,* Sunny House, Dhaka, 1972; এবং Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal 1937-1947*, Impex India, 1976

২২. Rafiuddin Ahmed, *The Bengal Muslims, 1876-1906 : A Quest for Identity*, Oxford University Press, New Delhi, 1981.

২৩. খোন্দকার সিরাজুল হকও মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম, বাংলা একাডেমি, (১৯৮৪)।

২৪. (দেখুন, Rana Razzaque, "Abul Hashim as a Political Thinker", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. 51, 2006; কলকাতার ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে এবং পাঞ্জাবে ১৯৪৭ সালের দাঙ্গার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, G D Khosla, *Stern Reckoning: A survey of events leading up to and following the partition of India*, Oxford University Press, New Delhi, 1989; বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য দেখুন, Suranjan Das, *Communal Riots in Bengal, 1905-1947*, Oxford University Press, New Delhi, 1991; Anwesha Roy, *Making Peace, Making Riots: Communalism and Communal Violence, Bengal 1940-1947*, Cambridge University Press, New Delhi, 2018.

২৫. (বাংলা ও পাঞ্জাব দুভাগ করা নিয়ে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও আকালি দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের গোপন দর-কষাকষি ও ঐকমত্য সম্পর্কে দেখুন, V P Menon, *The Transfer of Power in India*, Orient Longman, Calcutta, 1957. আইসিএস মেনন ছিলেন মাউন্টব্যাটেনের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক উপদেষ্টা এবং সেই পদাধিকারবলে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের সময় ১৯৪৭ সালের মে-জুন মাসে উল্লেখিত গোপন দর-কষাকষির একজন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী। ব্রিটিশ শাসকদের জিন্নাহ তোষণ সম্পর্কে দেখুন, Anil Nauriya, "Some Portrayals of Jinnah: A Critique", in D. L. Sheth and Gurpreet

Mahajan (eds.), *Minority Identities and the Nation-State*, Oxford University Press, New Delhi, 1999, pp 73-112. অনলি নাউরিয়ার প্রবন্ধটি অবশ্য আয়েশা জালাল ও এইচ এম সিরভাইয়ের করা জিন্নাহর রাজনীতির মূল্যায়নের দীর্ঘ সমালোচনা।

২৬. দেখুন, Ishtiaq Ahmed, *Punjab Bloodied, Partitioned and Cleansed in 1947: How and Why?* India International Centre, 2013; Anita Inder Singh, *The Origins of the Partition of India, 1936-1947*, Oxford University Press, 1987, chapter 7.

মন্তব্য

হিন্দুত্ববাদ কি ভারতে টেকসই হবে?

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

২০১৯ সালের নির্বাচনে ভারতবর্ষজুড়ে গেরুয়া শিবিরের অপ্রতিরোধ্য উত্থান হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ফল বিপর্যয়ের পর অনেকে ভেবেছিলেন, দলটির ওপর জনগণের মোহ কাটতে শুরু করেছে। ফলে জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হলেও দলটির ভোট এবং আসনসংখ্যা দুটোই হয়ত কমে যাবে। কিন্তু সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিজেপি তার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি আসন ও ভোট নিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজয়ী হয়েছে। বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ (National Democratic Alliance) জোটের কট্টর হিন্দুত্ববাদী দল, শিবসেনাও গতবারের মতো ১৮টি আসন পেয়েছে।

হিন্দুত্ববাদ নয়, ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হলো সেক্যুলারিজম। ভারতের রাষ্ট্রধর্ম হিন্দু নয় এবং দেশটি হিন্দু রিপাবলিকও নয়। ভারত গঠিত হয়েছে সেক্যুলারিজমকে ভিত্তি করে। দেশটির জন্মলগ্ন থেকে দীর্ঘ সময় ধরে এ নীতির সঙ্গে সমন্বয় রেখেই লোকসভা নির্বাচনে সেক্যুলার দলগুলো সরকারি এবং বিরোধী দল হিসেবে নির্বাচিত হয়ে এসেছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেখা যায় যে সে রাষ্ট্রের মূলনীতির সঙ্গে একাত্মতা পোষণকারী দলগুলোই সাধারণত আইনসভায় নির্বাচিত হয়। ভিন্নমত পোষণকারী দলগুলো আইনগতভাবে সক্রিয় থাকলেও তারা সাধারণত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রান্তে অবস্থান করে। রাষ্ট্রীয় আদর্শের বিপরীতে অবস্থানকারী দল যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় চলে আসে বা দীর্ঘ সময় ক্ষমতাসীন থাকে, তাহলে তা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিকেই চ্যালেঞ্জ করতে বা বদলে দিতে পারে। তুরস্কের রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের এ কে পার্টি (Justice and Development Party) হলো এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।

বর্তমান বিশ্বে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, সেটি হলো ফ্যাসিবাদী এবং ধর্মভিত্তিক দলগুলো রাজনৈতিক উদারতার (political liberalism) সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চরমপন্থার রাজনীতির বিকাশ ঘটাতে চাইছে। লক্ষণীয় যে ফ্যাসিবাদী এবং ধর্মভিত্তিক দলগুলো উদারনৈতিক রাজনীতির রেটোরিক এবং প্রত্যয় ব্যবহার করে একধরনের ক্যামোফ্লেজের আশ্রয় নিচ্ছে। সমাজ কাঠামোয় তাদের মতাদর্শের বিকাশ ঘটানোর জন্য তারা একদিকে যেমন উদারনৈতিক দল এবং ব্যবস্থাকে ফ্যাসিস্ট বলে আক্রমণ করে নিজেদের অধিক গণতান্ত্রিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে সেক্যুলার বলেও দাবি করছে; আবার অপর দিকে অনেক সময় সেক্যুলার এবং উদারনৈতিকতায় বিশ্বাসীদের সমর্থনও পাচ্ছে—তাদের ব্যবহৃত রেটোরিক এবং প্রত্যয় দ্বারা বিভ্রান্ত হবার ফলে। ভারতের বিজেপি হচ্ছে এমন একটি দলের উদাহরণ, যারা হিন্দুত্ববাদকে শুধু তাদের দলীয় আদর্শ নয়, বরং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উৎস বলে ঘোষণা করার পরও ভারত ও বিশ্ববাসীর সামনে নিজেদের তুলে ধরে সেক্যুলার দল হিসাবে।

এখন ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্র, সরকার ও সমাজে হিন্দুত্ববাদ চর্চার মাধ্যমে বিজেপি এবং তার সহযোগী সংগঠনগুলো রাষ্ট্রীয় চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন করে সেক্যুলারিজমকে শুধু আনুষ্ঠানিক প্রত্যয় হিসাবে সংবিধানে রেখে দিতে চায়, নাকি হিন্দুত্ববাদকে শুধু রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করতে চায়? ভারতের মতো একটি দেশে, যেখানে স্বাধীনতা লাভের সময় থেকেই সেক্যুলারিজম হচ্ছে রাষ্ট্রের মূলনীতি, সে রাষ্ট্র, সমাজ, রাজনীতি এবং সরকারে হিন্দুত্ববাদী মোর্চার এ রকম নিরঙ্কুশ আধিপত্য কি টেকসই হবে, নাকি সেক্যুলার দলগুলো রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আবার মূলধারায় ফিরে আসতে সক্ষম হবে?

উপমহাদেশের দুটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দুটো জায়গায় মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এর একটি হলো গণতান্ত্রিক চর্চার ধারাবাহিকতা এবং আরেকটি হলো সেক্যুলারিজম। ভারতের বিপরীতে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান—এ দুটি রাষ্ট্র অনেকটা জন্মলগ্ন থেকেই গণতান্ত্রিক নীতি-নৈতিকতা এবং চর্চা থেকে নিজেদের দূরে রেখেছে, যার ফলে সেখানে এখন পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি। অপর দিকে ক্ষমতাসীন দলের অধীনে নির্বাচন এবং সে নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর বিজয়ী দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ট্র্যাডিশন এবং নির্বাচন কমিশনসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্বাচনে কখনোই কোনো পক্ষ না নেওয়ার ফলে ভারতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু একই সঙ্গে অনেকে মনে করেন, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করলেও ভারতের গণতন্ত্র হচ্ছে 'সমস্যাযুক্ত গণতন্ত্র'১। কেননা, দীর্ঘ গণতান্ত্রিক চর্চার পরও নির্বাচনে টাকার প্রভাব

পেশিশক্তির ব্যবহার, জাল ভোট, ভোটকেন্দ্র দখল, নির্বাচনপূর্ব এবং নির্বাচনোত্তর সহিংসতা থেকে ভারত বের হতে পারেনি। তবে গণতন্ত্রের চর্চার জায়গাটা সমস্যাযুক্ত হলেও অন্তত এখন পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রীয়ভাবে হলেও সেক্যুলারিজমকে তাদের দেশ পরিচালনার নীতি হিসেবে ধরে রেখেছে।

এ সেক্যুলার নীতির সঙ্গে সমন্বয় রেখেই ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় নির্বাচিত হয়ে এসেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এ সেক্যুলার শাসক দলের বিরুদ্ধে বিস্ময়করভাবে উপমহাদেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদী, 'ইসলামপন্থী' এবং বামপন্থীদের একই অভিযোগ। সেটি হলো, সেক্যুলারিজমের কথা বললেও কংগ্রেস মূলত সেক্যুলারিজমের ক্যামোফ্লেজে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক আদর্শ সেক্যুলারিজম হলেও চর্চার দিক থেকে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক দল, যার ফলে মুসলমানসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীরা ভারতে নানা বৈষম্যের শিকার। সমালোচনার বৈষম্যের দিকটি যে অমূলক, তা নয়। তবে এ সমালোচনার অন্তর্নিহিত যে বিষয় লক্ষণীয়, সেটি হলো ভারতের মতো রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন দলের একমাত্র সেক্যুলারিজমের প্রতি নীতিনিষ্ঠতাই মুসলমানসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে। দক্ষিণ, ডান এবং বামপন্থী—কোনো দলই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে সেক্যুলারিজম ব্যতীত অন্য কোনো মতাদর্শ ভারতের জন্য প্রস্তাব করতে পারেনি।

ফলে ১৯৮৪ সালের আগে কোনো ধর্মভিত্তিক দল সেখানে লোকসভার কোনো আসনে জিতে আসতে পারেনি। এর প্রথম ব্যত্যয় দেখা যায় ১৯৮৪ সালে। সেবারই প্রথম বিজেপি দুটো আসনে জয়লাভ করে। বিষয়টা অনেককে অবাক করলেও একে অনেকটা ব্যতিক্রম বলেই অনেকে ধরে নিয়েছিল। এ ধরে নেওয়ার মূল কারণ হলো দীর্ঘ সময় সেক্যুলার দল কংগ্রেসের শাসনের এবং বিরোধী রাজনীতিতে সিপিআই, সিপিআই (এম)-এর মতো কমিউনিস্ট দলগুলোর প্রাধান্যের ফলে ভারতের জনগণের মূল অংশের মানস কাঠামো সাম্প্রদায়িক বা ধর্মকেন্দ্রিক না হয়ে সেক্যুলার বলে অনেকের কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল। ১৯৭৭ সাল থেকে যখন একটানা দীর্ঘ সময় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন থাকে, তখন মনে করা হতো পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বোধ হয় ভারতের অন্যান্য অংশ থেকেও অধিক সেক্যুলার। এর বিপরীতে দেখা গেছে, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদের জাতীয়তা এবং রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয় যুক্ত করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। পাশাপাশি দুটি দেশই ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। পাকিস্তান আরও এক ধাপ এগিয়ে নিজেদেরকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকারসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ সাংবিধানিকভাবেই অমুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ

করেছে। অর্থাৎ দেশটিতে সাংবিধানিকভাবে অমুসলিমদের ঔপনিবেশিক শাসনের মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে।

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ, দুটি রাষ্ট্রেই জনগণের বড় একটা অংশের কাছে সেক্যুলারিজম একটি নেতিবাচক প্রত্যয়। সেক্যুলার দলগুলো যেমন এ প্রত্যয়কে ইতিবাচক হিসেবে তুলে ধরতে পারেনি, তেমনি জনগণের বড় একটি অংশ ইসলামি পরিভাষার বাইরে অন্য কোনো পরিভাষা দিয়ে নিজেদের জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় পরিচয় নিরূপিত হোক, সেটা মনস্তাত্ত্বিকভাবে গ্রহণ করতে নারাজ। 'ইসলামপন্থী' দলগুলো আবার সেক্যুলারিজম এবং নাস্তিকতাকে এক করে জনগণের সামনে তুলে ধরেছে, যা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্যও মনে হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান, এ দুই রাষ্ট্রে বামপন্থী দলগুলো ভারতের মতো তেমন কোনো আবেদন তৈরি করতে পারেনি, সেক্যুলারিজমের প্রশ্নে আপসের পথে না হাঁটার ফলে।

ভারতে যেখানে অনেক বড় বড় বাম নেতাকে ফরমে ধর্মীয় পরিচয়ের জায়গায় নাস্তিক লিখে নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গসহ অন্যান্য জায়গায় জিতে আসতে দেখা গেছে; সেখানে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে জনগণের মূল অংশটি নিজেদের বামপন্থীদের কাছ থেকে দূরে রেখেছে, শুধু তাঁদের সেক্যুলার নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণেই। মূলত সেক্যুলারিজম প্রশ্নে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের মূলধারার পার্থক্য রয়েছে বলে এত দিন পর্যন্ত রাজনীতি-বিশ্লেষকেরা মনে করে আসছিলেন। কিন্তু বিজেপিসহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো সমাজ এবং রাজনীতিতে কমবেশি সারা দেশেই মূলধারায় পরিণত হওয়ার ফলে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, সেটা হলো ভারতের গণমানসে কি তাহলে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? ভারতের জনগণও কি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মতো ধর্মীয় পরিচয়ে নিজেদের জাতীয়তাবাদের পরিচিতি গড়ে তুলতে চাচ্ছেন?

একটা বিষয় পরিষ্কার যে বিজেপি এবং তার সহযোগী দল ও সংগঠনগুলো জাতীয়তাবাদের নতুন ভিত্তি বিনির্মাণ করছে, যার উৎস হলো বিনায়ক দামোদর সাভারকারের চিন্তাধারা। ব্রিটিশ আমলে মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিপরীতে তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারণা সামনে আনেন চন্দ্রনাথ বসুর হিন্দুত্ববাদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ মুসলিম লীগের নেতারা মনে করতেন, ধর্ম হলো জাতি গঠনের মূল ভিত্তি। ঔপনিবেশিক ভারতে বসবাসকারী সব মুসলমান হলো এক জাতি এবং হিন্দুরা হলো ভিন্ন জাতি। এ দুই জাতির পক্ষে একই রাষ্ট্রে একসঙ্গে বসবাস করা সম্ভব নয়। চৌধুরী রহমত আলীর 'দ্বিজাতি' প্রত্যয়টি ধার করে জিন্নাহ একে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' বললেন। বস্তুত এ দ্বিজাতিতত্ত্ব হলো পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। জিন্নাহর মুসলিম জাতীয়তাবাদী তত্ত্ব গড়ে উঠেছে মুসলমানত্ব (Muslimness) ধারণাকে কেন্দ্র করে। তেমনি

সাভারকারের হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে উঠেছে হিন্দুত্বকে ঘিরে। এ ধারণার মূলমন্ত্র হচ্ছে, সম্মিলিত হিন্দু পরিচয়ই হলো ভারতের একমাত্র সত্ত্বা বা পরিচয়। অর্থাৎ যে ধর্ম বা রাজনৈতিক পরিচয়েই যিনি পরিচিত হন না কেন, তাঁর প্রথম পরিচয় হচ্ছে হিন্দু।

বিজেপি মনে করে, সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ নয়, এ হিন্দুত্ববাদ হচ্ছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। হিন্দুত্ববাদকে বাদ দিলে ভারতের জাতীয়তাবাদী এবং রাষ্ট্রীয় পরিচয় থাকে না। 'ইসলামপন্থী' এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা যেমন মনে করেন, তাঁদের নিজেদের রাষ্ট্র বিশ্বে পরিচিত হবে মুসলিম পরিচয়ে, সাভারকারের মতো বর্তমান বিজেপি নেতারাও মনে করেন, ভারত বিশ্বে পরিচিত হবে হিন্দু পরিচয়ে। ভারতের প্রেক্ষাপটে হিন্দুত্ববাদ এবং জাতীয়তাবাদ তাঁদের কাছে এক এবং অভিন্ন।

জিন্নাহর মুসলিম জাতীয়তাবাদ ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলমানরা যেসব অঞ্চলে সংখ্যাগুরু, সেখানে জনপ্রিয়তা পেলেও সাভারকারের হিন্দুত্ববাদ তখন হিন্দুসহ কারও কাছেই তেমন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে একটি প্রান্তীয় ধারণা হিসেবে এটি ভারতে ১৯৪৭ সাল থেকেই টিকে ছিল। ভারতীয় জনগণের মূল অংশটি প্রভাবিত হয়েছিল জওহরলাল নেহরুর জাতীয়তাবাদের চিন্তাধারা দ্বারা। ভারতে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী হলেও ভারত মূলত গড়ে উঠেছিল জওহরলাল নেহরুর পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং সোভিয়েত অর্থনৈতিক চিন্তাধারা প্রভাবিত সমাজতন্ত্রের ধারণা দ্বারা—যে ধারণার ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মানে ছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে অর্থনীতি পরিচালনা করে জাতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণির বিকাশের পরিবেশ তৈরি করা। পাশ্চাত্য এবং সোভিয়েত প্রভাবিত নেহরুর জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক চিন্তা, এ দুটোর সঙ্গে সেক্যুলারিজমের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সেক্যুলারিজমের এ ধারণার সঙ্গে একদিকে যেমন ধর্ম হতে রাষ্ট্র এবং সরকারের বিচ্ছিন্নতার ধারণা জড়িত; তেমনি অপর দিকে জাতি গঠন, জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং জাতীয় আত্মপরিচয় গঠন—এর কোনো স্তরেই ধর্মের কোনো ভূমিকা নেই। ধর্মকে ব্যক্তিপর্যায়ে রেখে নেহরু ভারতীয় জাতিসত্ত্বার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় সত্তার বিনির্মাণ করেছেন। নেহরুকে এ ক্ষেত্রে সফল বলেই মনে করা হতো। ইন্দিরা গান্ধী পরবর্তী কংগ্রেস, নেহরুর চিন্তার বিপরীতে গিয়ে বাজার অর্থনীতির পথে দেশকে নিয়ে গেলেও নেহরুর সেক্যুলার ধারণার ওপর ভিত্তি করেই ভারতের জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় পরিচয় বহাল থাকবে বলে এত দিন সবাই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি এখন ভারতীয় পরিচয়ের মূল ভিত্তিটিকেই পুনর্নির্মাণ করতে চাইছে। সেক্যুলারিজমকে বাদ দিয়ে ধর্মীয় পরিচয় যুক্ত করে পাকিস্তানের

মতো জাতি এবং জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে চাইছে। বিজেপির নিরঙ্কুশ বিজয় এ নির্মাণের প্রশ্নে জনগণের ম্যান্ডেট বলে বিজেপি মনে করছে।

বিজেপি সেক্যুলার প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি। বরং সেক্যুলার ধারণাটিকে নতুনভাবে বিনির্মাণ করছে। তাদের কাছে হিন্দুত্ববাদ হলো সেক্যুলার মতবাদ—যিনি হিন্দু, তিনিই সেক্যুলার। তাদের মতে হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে সেক্যুলারিজমের কোনো সংঘাত নেই। হিন্দুত্ববাদের মাধ্যমে তারা সমাজের একটা বড় অংশের মনোজাগতিক পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। তারাও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের জনগণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মতো সেক্যুলার পরিচয় বাদ দিয়ে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের আলোকে নিজেদের পরিচিত করাতে চাইছে। ভারতের জনগণের মনোজাগতিক এ পরিবর্তনের কারণ কী? পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রে জনগণের মানস কাঠামোতে এ ধরনের মৌলিক পরিবর্তন বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দেখা যায়নি। তবে দীর্ঘ সেক্যুলার শাসন—যা কিনা পাশ্চাত্যের চর্চিত সেক্যুলারিজম থেকেও অধিক সেক্যুলার—তুরস্কের জনগণের একটা বড় অংশকে 'ইসলামপন্থী' দলের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে, যদিও সে আগ্রহ সাময়িক কি না, সে প্রশ্ন রয়ে গেছে। তেমনি আজকে ভারতে হিন্দুত্ববাদের উত্থান কি সাময়িক, নাকি এটি ভবিষ্যতে দীর্ঘ সময় ভারতের রাজনীতির মূল নিয়ামক হয়ে থাকবে, এ প্রশ্ন অনেককে ভাবিত করছে।

হিন্দুত্ববাদ মূল নিয়ামক হবে কি না, সেটি দুটো উপাদানের ওপর নির্ভর করছে। এর একটি হলো অভ্যন্তরীণ আর অপরটি বহিঃস্থ। অভ্যন্তরীণ বিষয়টি আগামী দিনগুলোতে ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিজেপি কতটুকু ভূমিকা পালন করতে পারবে, তার সঙ্গে যুক্ত। পুরোনো মতবাদের জায়গায় জনগণ যখন নতুন মতবাদ রাষ্ট্র এবং সমাজে প্রতিস্থাপন করে, অথবা পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তখন এ মতবাদ বা ব্যবস্থা তাদের জীবনমানে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাবে, এ প্রত্যাশাও একই সঙ্গে ধারণ করে। গণমানুষের কাছে যেকোনো মতবাদের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম মাপকাঠি হলো, এটি তাদের নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা পালন করতে পেরেছে, এ দিকটি। সেটি কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম না হলে সেটিকে ব্যর্থ মতবাদ হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সমাজতন্ত্রের কথা। জীবনমানের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নে এটি ভূমিকা পালন করতে না পারার কারণেই একে ব্যর্থ মতবাদ হিসেবে অনেকে চিহ্নিত করেন। প্রায় কোনো দেশেই এটি এখন আর জনপ্রিয় মতবাদ নয়। কমবেশি সব মতবাদের ক্ষেত্রেই এ বিষয় প্রযোজ্য। জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে সে মতবাদ বা ব্যবস্থা খুব বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে এ সময় শাসকেরা ক্ষমতায় টিকে

থাকার জন্য ব্যর্থ মতবাদ আঁকড়ে বন্দুকের জোরে টিকে থাকার চেষ্টা করে যদিও পরিণতিতে তা সফল হয় না।

নরেন্দ্র মোদির প্রথম শাসন পর্বে কিছু কল্যাণমূলক পদক্ষেপের ফলে প্রান্তীয় জনগোষ্ঠী এর ব্যাপক সুফল পেলেও সার্বিকভাবে ম্যাক্রো অর্থনীতির অবনতি ঘটেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের দিক দিয়ে বাংলাদেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে ভারত। সাম্প্রদায়িক বিভাজন বিজেপির রাজনীতির মূলমন্ত্র। তবে বিভাজনের বা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি কোথাও জনগণের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারে না, এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, এটি সমাজে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা ক্রমাগত উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন করে থাকে, যার প্রভাব সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনীতির ওপর পড়ে। বর্তমান ভারতই হচ্ছে তার বড় উদাহরণ। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি ক্রমশই ভারতের অর্থনীতিকে একদিকে স্থবির করে দিচ্ছে, তেমনি সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ভারত ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে, এমনকি বাংলাদেশ থেকেও। নারীরা ব্যাপকভাবে বিজেপিকে ভোট দিলেও নারীর প্রতি যৌন নিপীড়ন এবং সহিংসতা মোদির প্রথম শাসনামলে না কমে বরং বেড়েছে। পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী শাসন কৃষকদের আত্মহত্যার হার (গড়ে বছরে ১৬ হাজারের ওপর) যেমন কমাতে পারেনি, তেমনি দরিদ্র মুসলমান, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিপতিত করেছে কঠিন অবস্থায়।

ভারতে হিন্দুত্ববাদের ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করছে বর্তমান মেয়াদের বিজেপি সরকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কতটা সাধন করতে পারবে, তার ওপর। সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ থেকে ভারতের পিছিয়ে পড়ার যে ধারা, বর্তমান মেয়াদেও তা যদি অব্যাহত থাকে, তা দেশের ব্যাপক জনমানসের মননে হিন্দুত্ববাদ নিয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। কেননা, জনমানসের বড় অংশের পক্ষে ভারতের 'সাহায্য' নিয়ে স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সূচকে ভারতকে পেছনে ফেলে দেবে, এটা মেনে নেওয়া কঠিন।

তবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হলে বিজেপিকে আরও অধিক মাত্রায় ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করতে দেখা যাবে, যেমন দেখা গিয়েছে এবারের নির্বাচনে। ব্যর্থতা ঢাকতে জোরেশোরে হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্লোগানের ওপর নির্ভর করে বিজেপি নির্বাচনী বৈতরণি পার হতে চাইবে। এ ক্ষেত্রে তার জন্য সবচেয়ে সহায়ক হবে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামপন্থার রাজনীতি। জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব গড়ে উঠে বহিঃস্থ শত্রুর ধারণার ওপর ভিত্তি করে। নেহরুর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়ায়। জিন্নাহর মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে উঠেছিল নেহরুর ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায়, যাকে মুসলিম লীগের নেতারা ছদ্মবেশী হিন্দু জাতীয়তাবাদ মনে করতেন। নেহরুর জাতীয়তাবাদ

মূলধারা না হয়ে সাভারকারের হিন্দু জাতীয়তাবাদ সে সময় মূলধারা হলে তা জিন্নাহর মুসলিম লীগের রাজনীতির জন্য আরও সুবিধাজনক হতো। আবার সাভারকারের হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা হিন্দুত্ববাদ গড়ে উঠেছে মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতিক্রিয়ায়। তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছাড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না।

বিজেপির হিন্দুত্ববাদ বা হিন্দু জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হলো পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও 'ইসলামপন্থার' রাজনীতি। এ দুটি দেশে এ দুই ধারার প্রবল উপস্থিতি যত দিন ধরে বিরাজ করবে, ভারতে হিন্দুত্ববাদ অভ্যন্তরীণ শত সংকটের মধ্যেও তার বেঁচে থাকার আদর্শগত রসদ পেতে থাকবে।

পাদটীকা

১. গণতন্ত্রের মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের যে শ্রেণিবিভাগ, সেটি বেশ গোলমেলে। এ শ্রেণিবিভাগগুলো করে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন চিন্তক গোষ্ঠী। সমস্যা হলো, বাংলাদেশের মতো ঔপনিবেশিকোত্তর দেশগুলোর সিভিল এবং বুদ্ধিজীবী সমাজের অনেকেই দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে মনোজাগতিকভাবে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারাকে শ্রেষ্ঠ ভাবেন। এ মনোজাগতিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁরা বিভিন্ন চিন্তক গোষ্ঠী কর্তৃক এ চিন্তাধারাগুলো প্রয়োগের রাজনৈতিক কূটকৌশলগুলো বুঝতে অক্ষম। তাঁরা অনেকটা অন্ধভাবেই এসব গোষ্ঠীগুলোর রাজনৈতিক সততায় বিশ্বাস করেন। আবার অনেক সময় তাদের এ দেশীয় এজেন্ট হিসেবেও কাজ করেন।

রাশিয়া, চীনের উত্থানসহ নানাবিধ কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাশ্চাত্যের প্রভাব ক্রমহ্রাসমান। এমতবস্থায়, অনেক ক্ষেত্রেই এ চিন্তক গোষ্ঠীগুলো আন্তর্জাতিক বিশ্বে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, The Economist Intelligence Unit (EIU)-এর কথা। ব্রিটেনভিত্তিক এ সংস্থা বিভিন্ন দেশকে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করে থাকে। তাদের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী ২০১৮ সালে গণতন্ত্রে বিশ্বে ভারতের অবস্থান ৪১তম এবং ভারত হলো 'সমস্যাযুক্ত গণতন্ত্রের' দেশ। অপর দিকে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের অবস্থান যথাক্রমে ৮৮ ও ১১২তম। এ দুটো দেশকেই তারা ফেলেছে হাইব্রিড রেজিম বা শঙ্কর ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগে। অর্থাৎ দেশ দুটিতে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র দুই ব্যবস্থার উপাদানই একই সঙ্গে বিদ্যমান।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর EIU মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যাঙ্ক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে 'সমস্যাযুক্ত গণতন্ত্রের' দেশে নামিয়ে এনেছে। এ পরিবর্তন বুঝতে হলে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে পাশ্চাত্য এবং মার্কিন এস্টাবলিশমেন্টের দ্বন্দ্বটা বোঝা জরুরি।

রাশিয়া এবং ভেনেজুয়েলাকে চীন, উত্তর কোরিয়া, সৌদি আরব, ইরানের সঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী গণচীন, রাশিয়া এর চেয়ে কম স্বৈরতান্ত্রিক। রাশিয়ার অবস্থান কেন চীনের পেছনে, এটা বুঝতে হলে ব্রিটেনসহ পাশ্চাত্যের সঙ্গে রাশিয়ার দ্বন্দ্বের স্বরূপের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। EIU-এর গণতন্ত্র সূচকের জন্য দেখুন, *The Economist Intelligence Unit* (8 January 2019). 'Democracy Index 2018: Me Too?'. Retrieved 11 June 2019.

আন্তর্জাতিক

ভেঙে যাওয়া সামাজিক চুক্তি ও আরেকটি আরব বসন্ত

মারওয়ান মাউশের

গত দশকে দুটি বড় বড় গণ-অভ্যুত্থানের ঝড় গোটা আরব বিশ্বকে প্রকম্পিত করে। ২০১১ সালে যাকে আপাত 'আরব বসন্ত' বলা হচ্ছিল, জনপ্রিয় সেই গণ-অভ্যুত্থান ওই গোটা অঞ্চলের স্বৈরাচারী শাসকদের উৎখাত করে। সবার মনে বড় আশা সঞ্চারিত হয়েছিল যে এই শান্তিপূর্ণ জন-আন্দোলন মধ্যপ্রাচ্যে গণতান্ত্রিক এক নতুন যুগের সূচনা করবে। কিন্তু তিউনিসিয়া ছাড়া অন্য সব জায়গায় সেটি হয় গোলযোগ, না হয় ভয়ংকর গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে।[১] এরপর ২০১৪ সালে ওই অঞ্চলের নেতারা আরও একটি 'মরুঝড়ে'র মুখোমুখি হন। তখন তেলের দাম কমে যায়।[২] এর ফলে তাঁদের মৌলিক শাসনব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ে যায়। কারণ, ওই অঞ্চলের শাসকদের ক্ষমতার মূল ভিত্তি হলো তাঁদের তেলসম্পদ।

তেলের নিম্নমূল্যের কারণে শাসকেরা বেশ কিছু কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। তাঁদের স্থূলকায় বাজেটে টাকা ঢালা, এলিটদের সন্তুষ্ট করা এবং দীর্ঘদিন ধরে দাবিয়ে রাখা সংস্কারের দাবিকে দমিয়ে রাখা কঠিন হয়ে ওঠে। এটা কোনো সাময়িক সমস্যা নয়। কারণ, তেলের দাম আবার সেই ২০১৪-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরবে, সেটির কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আপাতদৃষ্টিতে, অনেক আরব রাষ্ট্র এই দুটি ঝড় ভয়ে ভয়ে সামাল দেয়। যদিও সামনে আরও অনেক হাঙ্গামা রয়ে যায়। ২০১১ ও ২০১৪ সালের ধাক্কা ওই অঞ্চলে বড় ধরনের পরিবর্তনের উপসর্গ ছিল মাত্র। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে মৌলিক বিতর্কের জায়গা এখনো অমীমাংসিত। যদি মধ্যপ্রাচ্যের নেতারা দ্রুত নাগরিকদের

● অনুবাদ : **তরিকুল ইসলাম**

সামনে নতুন কিছু নিয়ে উপস্থিত না হন, তাহলে আরও বড় ধরনের ঝড় আসন্ন।

অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলো তেলসম্পদকে তাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছে। 'স্বত্বভাড়াজীবী রাষ্ট্র' (রেন্টিয়ার স্টেটস) হিসেবে পরিচিত এসব সরকার তাদের নাগরিকদের কাছ থেকে কর না নিয়ে বিদেশি মদদে বা রাজস্বের একটা বড় অংশ তাদের জাতীয় সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে সংগ্রহ করেছে। কিছু কিছু দেশ, যেমন সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত তাদের নিজস্ব তেলসম্পদ বিক্রি করে রাজস্ব আয় করেছে। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে সরকারগুলো তাদের তেলসম্পদকে চাকরি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার পেছনে ঢেলেছে। তার পরিবর্তে তারা পেয়েছে রাজনৈতিক আনুগত্য। যেহেতু তেলের দাম আর বাড়েনি এবং ওই অঞ্চলের জনসংখ্যাতত্ত্বও পাল্টে গেছে, ফলে তা প্রচলিত ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তোলে। প্রয়োজনীয় রাজস্ব ছাড়া সরকারগুলো তাদের ফাঁপা ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পারছে। তারা তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে খাবি খাচ্ছে। তাদের রাজনীতিকে বৈধতা প্রদানের প্রধান হাতিয়ার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

যদি তারা এই পরিবর্তিত ভাগ্যকে টিকিয়ে রাখতে ক্ষমতার মুঠো আরও শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হয় এবং একই সঙ্গে কার্যকরী সংস্কার আনতে ব্যর্থ হয়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলো নতুন আরেকটি সামাজিক আন্দোলনের ঝুঁকিতে পড়বে। সে আন্দোলন আগের সব আন্দোলনকে ছাপিয়ে যাবে, যা আগে কখনো ঘটেনি। সমাধানের একমাত্র পথ হলো সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার, যা মধ্যপ্রাচ্যে মৌলিকভাবে এক নতুন সামাজিক চুক্তির উদ্ভব ঘটাবে। 'স্বত্বভাড়া' দেওয়ার মডেলের দিকে না ঝুঁকে, তাদের উচিত হবে উৎপাদনশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা—যার ভিত্তি হবে মেধা, আনুগত্য নয়; এবং সেটি সরকারি নয়, বরং বেসরকারি খাতের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে।

কারণ, এই ধরনের বড় কাঠামোগত পরিবর্তন করতে গেলে বাধা আসবে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও সমস্যার জন্ম দেবে। জনগণের সমর্থন ছাড়া তাদের অস্তিত্বও টিকবে না। আবার রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হবে না। সব মিলিয়ে বেশ নাটকীয় ঘটনা হবে। যদি সরকারগুলো অর্থনৈতিক সংস্কারের[৩] সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক রাজনীতিকে গ্রহণ করে, তাহলে দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের একটা সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে। যদি তারা সেটা না করে, তাহলে পরবর্তী সেই ঝড় শিগগিরই আসবে।

ভেঙে যাওয়া চুক্তি

যে সামাজিক চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যের সরকার ও তাদের নাগরিকদের একত্র করে রেখেছে, সেটি ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া—'টপ-ডাউন'। অংশগ্রহণমূলক

রাজনীতির পরিবর্তে এই কর্তৃত্ববাদী সওদায় শাসকগোষ্ঠী জনগণের পেছনে টাকা ঢেলে তাদের সমর্থন ও রাজনৈতিক বৈধতা নিশ্চিত করে। তেলসম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক আনুকূল্য দেখায় এবং ভর্তুকি, মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো, যেমন আলজেরিয়া, বাহরাইন, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত তেলসম্পদ বিক্রি করেই তাদের রাজস্ব সংগ্রহ করে। তেল আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে মিসর, জর্ডান, মরক্কো ও তিউনিসিয়া নির্ভর করে তাদের বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী প্রতিবেশীর বড় মাত্রার অনুদান এবং বিদেশের তেল কোম্পানিতে কর্মরত তাদের নাগরিকদের বৈদেশিক মুদ্রার ওপর। উপসাগরীয় সরকারগুলো তাদের তেল আমদানিকারী প্রতিবেশী, বিশেষ করে মিসর ও জর্ডানকে সহায়তা দেয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে। যেন ওই দেশগুলো মোটামুটি তাদের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং তাদের সস্তা জনশক্তির জোগান অব্যাহত রাখে। এই শতাব্দী শেষে দেখা যায়, ওই অনুদান ও বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল মিসর ও জর্ডানের মোট জিডিপির ১০ শতাংশের বেশি। এই স্বত্বভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। মোদ্দা কথা, এই তেলের রাজস্ব মধ্যপ্রাচ্যের তেল আমদানিকারক দেশগুলোকে তাদের সাধ্যের বাইরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে ফেলেছে।

রাষ্ট্রগুলো আশা করেছিল, নাগরিকেরা যদি অর্থনৈতিক সুবিধা পায়, তাহলে ক্ষুদ্র এলিটদের মাধ্যমে শাসন তারা মেনে নেবে। ফলে এই ক্ষুদ্র এলিট গোষ্ঠী ধীরে ধীরে আরও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এসবের মধ্যে সোনায় সোহাগা ছিল তাদের তেলসম্পদ। তেল তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক চক্রকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করেছে। কারণ, এই চক্রের আনুগত্য ও স্বার্থ তাদের নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সরকারগুলো যত বেশি চাকরি ও ভর্তুকি দিতে পারবে, ততই তাদের জন্য মঙ্গল। তারা দেখেছে যে বেসরকারি খাতের মাধ্যমে মেধাভিত্তিক চাকরির ব্যবস্থা করার চেয়ে যদি সরকারি চাকরির ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের আনুগত্য ও জবাবদিহির দাবি মিলিয়ে দেওয়া যায়, তা হবে তাদের জন্য উত্তম। পৃথিবীর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় বেসরকারি চাকরির চেয়ে সরকারি চাকরির হার সবচেয়ে বেশি।

ভাড়াটে অর্থনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক চুক্তি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ দাপিয়ে বেড়িয়েছে। তখন নাগরিকেরা তাদের আনুগত্যের পরিবর্তে যে সেবাগুলো পাচ্ছে, সেটি মোটামুটি সন্তুষ্টমূলক হবে বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে রাষ্ট্রগুলো সে বৈশিষ্ট্য হারাতে থাকে। সরকারের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বড় হওয়া আমলাতন্ত্র ও এলিটদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তেলের

উচ্চমূল্য বজায় থাকা খুবই প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রগুলো চালানো তাদের সাধ্যের বাইরে চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ জর্ডানের সরকার ও সেনাবাহিনী এই শতাব্দীর শুরুতেই ৪২ শতাংশের মতো বিশাল জনশক্তি নিয়োগ দেয়। মিসরের সরকার নাগরিকদের তেলে যে পরিমাণ ভর্তুকি দেয়, সেটি ছিল সে দেশের মোট জিডিপির ১১ শতাংশ। সৌদিতে সেটি ছিল ১০ শতাংশ, লিবিয়ায় ৯ শতাংশ, বাহরাইনে ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবং কুয়েতে ৮ শতাংশ।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে তেলের মূল্যের বৃদ্ধির চেয়ে ওই দেশগুলোর আমলাতন্ত্র বেশি দ্রুত বড় হতে থাকে। সেই আমলাতন্ত্রকেও তখন তুষ্ট রাখা জরুরী হয়ে পড়ে। সরকারগুলোর তখন আর নতুন জনশক্তি নিয়োগ দেওয়া বা খাদ্যপণ্য ও তেলজাতীয় দ্রব্যের ওপর ভর্তুকি দেওয়ার সক্ষমতা থাকে না। ফলে ২০০০ সাল নাগাদ মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় গড়ে বেকারত্বের হার ১১ শতাংশে পৌঁছায়। তরুণদের মধ্যে সেটা ছিল ৩০ শতাংশ। যেহেতু সরকারগুলো বড় কলেবরের রাষ্ট্র দেখভাল করতে হিমশিম খেতে থাকে, তখন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানও নামতে থাকে। এ অবস্থা সামাল দিতে সরকারগুলো তাদের নাগরিকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে একনায়কতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে চাপ দিতে থাকে।

মধপ্রাচ্যের অনেক সরকার রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে পুরোনো সামাজিক চুক্তিতে[৪] যেই ভাঙন ধরেছে, তা ঠিক করার চেষ্টা করেছিল। যদিও এই সংস্কারের লক্ষ্য ছিল শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা আরও পোক্ত করা। তবে যদি কেউ সেটা করতে সফল হতো, সেটা নাগরিকদের জন্য কল্যাণকর হলেও হতে পারত। প্রকৃতার্থে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলো জবাবদিহি ও ভারসাম্য। সেটি যদি না থাকে, রাষ্ট্রীয় শিল্পকে বেসরকারি খাতে রূপান্তর, উদার ব্যবসাপদ্ধতি প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার মতো অনেক ভালো উদ্যোগও শেষমেশ বৃহত্তর জনগণের চেয়ে সেই এলিটদেরই বেশি উপকৃত করে[৫]।

সঠিক নজরদারি সংস্থা না থাকলে দুর্নীতি চরমে পৌঁছায়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির ধারণা সূচকে[৬] মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের অবস্থান উল্লেখযোগ্য হারে নামতে থাকে। জর্ডান ১৩৩ দেশের মধ্যে ২০০৩ সালের ৪৩তম অবস্থান থেকে ২০১০ সালে ১৭৮ দেশের মধ্যে ৫০তম হয়। একই সময়ে মিসর ৭০ থেকে ৯৮তম অবস্থানে নেমে যায় এবং তিউনিসিয়া ৩৯ থেকে ৫৯তম অবস্থানে গিয়ে ঠেকে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরোনো এই সামাজিক চুক্তি ওই সমাজের জন্য অনেক বেশি সুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছিল। যদিও ২০১১ সালে যে আরব বসন্তের সৃষ্টি হয়,

তার পেছনে সেটি কোনোভাবেই একমাত্র কারণ ছিল না। এটি অনেক সরকারের পতনে সহায়তা করে, বিশেষ করে যেসব দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দুর্বল ছিল। এঁদের মধ্যে প্রথমেই পতন হয় তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট বেন আলীর ও মিসরের হোসনি মোবারকের। লিবিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনের সরকারগুলো কখনো শক্ত প্রতিষ্ঠান তৈরির পক্ষেই ছিল না। সেখানে রাজপথের মিছিলই যথেষ্ট ছিল। এর ফলে বিরাজমান শাসনব্যবস্থার পতন ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত তা গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। বাহরাইনে সরকারবিরোধী আন্দোলনকারীরা শাসনব্যবস্থাকে আঘাত করতে সক্ষম হলেও তা তখন বড় হুমকি হয়ে ওঠেনি। জর্ডান ও মরক্কোতে প্রতিবাদ দেখা গেলেও সেখানে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি।

উপসাগরীয় সরকারগুলোর হাতে একটি আপাত-সমাধান ছিল। যেখানে সমস্যা দেখা যায়, তারা জনগণকে শান্ত করতে সেখানে টাকা ঢালে। সৌদির রাজা আবদুল্লাহ সৌদি নাগরিকদের উচ্চ বেতন-ভাতা, আবাসনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৩০ বিলিয়ন ডলারের[৭] এক বিশাল প্যাকেজের প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যান্য উপসাগরীয় সরকারও একই ধরনের প্যাকেজ নিয়ে হাজির হয়। সে সময় তেলের উচ্চমূল্যের কারণেই তা সম্ভব হয়েছিল। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাতার সরকার প্রত্যেক নাগরিককে ৩ হাজার ৫০০ ডলার সমমূল্যের ১ হাজার কুয়েতি দিনার প্রদান করে এবং এক বছরের বেশি সময়ের জন্য ফ্রি খাদ্যদ্রব্য জোগান দেয়। ওমান সরকার ৩০ হাজার চাকরি প্রদান করে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও ৪০ শতাংশ বেশি বৃত্তি প্রদান করে। জর্ডানের রাজা আবদুল্লাহ দ্রুত সাময়িক ভিত্তিতে সংস্কার কর্মসূচি নেয়। এই রাস্তার চাপ সামলাতে সব মিলিয়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ উপসাগরীয় বিভিন্ন সরকারকে স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে। ২০১৪ সালের দ্বিতীয় ঝড় আসার আগপর্যন্ত এই প্রণোদনা বিরোধীদের দমিয়ে রাখতে যথেষ্ট ছিল।

২০১১ সালের গণ-অভ্যুত্থান মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে যে শুধু অর্থনৈতিক সংস্কার নয়, শাসনব্যবস্থার সংস্কারই অনেক দিনের পাওনা। যখন বিপদ কেটে যায়, শাসকগোষ্ঠী খুব দ্রুত সেই আগের অভ্যাসে ফিরে যায়। লিবিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনে সহিংসতা ও মানুষের অসীম দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে তাদের কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মিসরে ইসলামপন্থীদের অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটার পর নাগরিকেরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আর কোনো বিবাদে জড়াতে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে।

ঠিক তখনই আসে দ্বিতীয় ঝড়। ২০০৮ সালে যে তেলের মূল্য প্রতি ব্যারেল ছিল ১৪০ ডলার, তা ২০১৪ সালের আগস্টে নেমে যায় ১০০ ডলারে। ক্রমশ ২০১৬ সালে তা নেমে ৩০ ডলারে পৌঁছায়। সেখান থেকে একসময় তেলের দাম ৭০

ডলারে উঠলেও আজ অবধি তেলের ব্যারেল ৭০ ডলারের বেশি হয়নি। নিজেদের ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট চালাতে ও আঞ্চলিক সরকারগুলোকে বিলাসী সহায়তা দেওয়ার জন্য সৌদির জন্য তেলের মূল্য সর্বনিম্ন ৮৫-৮৭ ডলারের মধ্যে রাখা প্রয়োজন ছিল। তেলের নিম্নমূল্য হয়ে যাওয়ার অর্থ ছিল সরকারকে দ্রুত তার ব্যয়ের অভ্যাস পরিবর্তন করতে হতো। অন্যান্য দানশীল দেশ, যেমন কুয়েত ও আরব আমিরাত তাদের আঞ্চলিক সহায়তার পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে কোনো দেশই তাদের কল্যাণরাষ্ট্রের খরচ বহন করতে সক্ষম ছিল না। অন্যদিকে তেল আমদানিকারক দেশগুলো তাদের অর্থনীতি সচল রাখার জন্য তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর অনুদান বা তাদের শ্রমিকদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার ওপর আর নির্ভর করতে পারছিল না।

তেলের নিম্নমূল্য নতুন আন্দোলনের সূচনা ঘটায়। ২০১৮ সালে সৌদি আরবে পরিবর্তনের দাবি ওঠে। একসময় ধর্মপ্রচারক, নারী ও রাজনৈতিক কর্মীরাও সে আন্দোলনে যোগ দেন। জর্ডানে প্রথমবারের মতো রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিল হয়। এই দুটি দেশ ওই অঞ্চলের 'স্বত্বভাড়াবাদের' পতনের প্রভাব থেকে বেশ ভালোভাবে বাঁচতে সক্ষম হয়। প্রথমত, সৌদির মতো একটি তেল উৎপাদনকারী দেশের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে তা এখন আর 'কল্যাণরাষ্ট্রের' ভূমিকায় নেই। দ্বিতীয়ত, জর্ডানের মতো একটি তেল আমদানিকারক দেশও বাইরের তেলের টাকার ওপর নির্ভর করতে পারছে না।

পরিবর্তনের হাওয়া

এই তেলের উচ্চমূল্যের যুগের অবসান হওয়ায় সৌদি আরব তার নতুন প্রজন্মের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের সূচনা ঘটায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান[৮], যিনি 'এমবিএস' নামেও পরিচিত। ২০১৫ সালের শুরুতে বড় ধরনের অর্থনৈতিক ঘাটতি বলে দেয় যে সৌদি এখন আর তার উদার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ভর্তুকি দিতে সক্ষম নয়। ২০১৭ সালে সৌদির বাজেট ঘাটতি ৬০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়, যা ছিল মোট জিডিপির ৯ দশমিক ২ শতাংশ। সৌদি আরব ২০২৩ সাল পর্যন্ত এই বাজেট ঘাটতিতে থাকবে। ফলে দেশটি তার ভর্তুকির পরিমাণ কমিয়ে আনে। এর ফলে সেবা পণ্যের খরচ বেড়ে যায়। সিরিয়া, ইয়েমেনসহ অন্যত্র আঞ্চলিক মাতব্বরি[৯] বজায় রাখার কারণে সৌদি আরবের খুঁড়িয়ে চলা অর্থনীতি আরও খারাপ অবস্থায় চলে যায়। শুধু ইয়েমেনের যুদ্ধে সৌদির ব্যয় প্রতি মাসে ছয় থেকে সাত বিলিয়ন ডলার।

সৌদি আরব এই নতুন বাস্তবতার মুখে একটি দুর্বল সংস্কারপ্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু তা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। দেশের

স্থবির অর্থনীতিকে সচল করতে সৌদি সরকার ২০১৮ সালের জন্য এক বিশাল বাজেট নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু কীভাবে সেটাকে অর্থায়ন করবে, সে ব্যাপারে কোনো আভাস ছিল না। সৌদি আরব তিন বছর জর্ডানের প্রতি সমর্থন বন্ধ করে দেয়। আবদেল ফাতাহ আল-সিসি ইসলামপন্থীদের উৎখাতের পর প্রতিবছর ১০ হাজার বিলিয়ন ডলারের এক প্রকল্প নেয়। সৌদি আরব এখন আর মিসরকে সেই সহায়তা দিতে সক্ষম নয়। সৌদি আরব দুর্দান্ত কিছু সামাজিক সংস্কার কর্মসূচিও হাতে নেয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি[১০], সিনেমা হলগুলো পুনরায় খুলে দেওয়া ও ইসলামপন্থী পুলিশের ক্ষমতা কমানো। এটি সম্ভবত নতুন জেনারেশনকে খুশি করা ও তাদের রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি থেকে দূরে রাখার জন্য করা হয়।

এই সংস্কার সৌদি যুবরাজকে তরুণদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় করে তুলেছে। কিন্তু তরুণদের বেকারত্বের হার সেখানে বেশ ভয়াবহই থেকে গেছে, যা ২০১৭ সালে ৩৫ শতাংশে পৌঁছায়[১১]। এখন প্রশ্ন হলো, নতুন প্রজন্ম কি এই অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং সুবিধা ও ভর্তুকির বঞ্চনা নীরবে মেনে নেবে? যদি ২০১১ সালের অভ্যুত্থানের দিকে তাকাই, তাহলে উত্তর হবে 'না'। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অর্থনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে ৩০ শতাংশ বেকারত্ব জর্ডানে নতুন প্রজন্মকে জাগিয়ে তুলতে পারে। তাদের দাবির মধ্যে একটি নির্বাচিত সংসদ করার দাবিও সংযুক্ত হতে পারে। সৌদি আরবে হলে সেটি হবে দেশটির ইতিহাসে প্রথম এমন কোনো ঘটনা।

উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরব একমাত্র দেশ নয়, যাকে তেলের এই নিম্নমূল্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। যদিও কুয়েতে একটি নির্বাচিত সংসদ রয়েছে, ২০১৪ সালে সেখানেও তেলের রাজস্ব ১৫ বিলিয়ন ডলার কমে যায়। ২০১৫ সালেও সেই একই অবস্থা ছিল। কুয়েত প্রধানত তার বিশাল ৬০০ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ ফিস্কালের ওপর নির্ভর করে। কুয়েত সরকার এখন ভর্তুকির পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে ও মধ্যম মানের অর্থনৈতিক সংস্কারের দিকে এগোচ্ছে, যা কুয়েতকে তার অর্থনীতির জন্য তেলের ওপর নির্ভরতা থেকে সরিয়ে আনবে। ওমান তেলের দাম কমার কারণে একই ধরনের পদক্ষেপ নেয়; ভর্তুকি কমিয়ে ফেলে, সরকারি খাতের কর্মীদের সুবিধা কমিয়ে দেয় ও ট্যাক্স বৃদ্ধি করে।

অনিশ্চিত শান্তি

প্রতিবেশী তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর প্রদত্ত অর্থনৈতিক সহায়তা এবং বৈদেশিক মুদ্রা কমে যাওয়ায় জর্ডান সরকারের পক্ষে আনুকূল্যের অর্থনীতিকে চালিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। যদিও জর্ডানে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং সমাজ সেটি মেনেও নিয়েছে, তবু সাম্প্রতিক আন্দোলন থেকে আঁচ করা যায়

যে অনেকেই যা ধারণা করছে, জর্ডানের রাজতন্ত্র তার চেয়েও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। জনগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাজতন্ত্র সাময়িক পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে সরকারের আইন ও বিচার বিভাগের সঙ্গে সত্যিকারের ক্ষমতা ভাগাভাগি হচ্ছে না। উপসাগরীয় দেশগুলোর আর্থিক সহায়তার কারণে জর্ডান সরকার একটি অদক্ষ ও সহায়তাভিত্তিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালানোর সুযোগ পেয়েছে। সরকার টাকা দিয়ে এলিটদের সমর্থন কিনে নিয়েছে। সেই টাকা সরকার এমন একটি ফাঁপা আমলাতান্ত্রিকতার পেছনে ঢেলেছে, যা মেধার চেয়ে আনুগত্যকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষোভ থেকে ২০১১ ও ২০১২ সালে পুরো জর্ডানে বড় ধরনের আন্দোলন হয়। রাজা আবদুল্লাহ ধারাবাহিক কিছু রাজনৈতিক সংস্কার আনলে আন্দোলনকারীরা থেমে যায়। আঞ্চলিক অস্থিরতার কারণে তাদের মনোযোগও অন্যদিকে চলে যায়। একাধিক প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়া, সংবিধানে পরিবর্তন, মাত্র ১৮ মাসে ৩ বার সরকার পরিবর্তনের মতো রাজা আবদুল্লাহর একাধিক পদক্ষেপ বড় ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই আন্দোলনকারীদের শান্ত করে দেয়। ২০১৬ সাল নাগাদ জর্ডানের রাজনৈতিক এলিটরা অনেকটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা ভাবেন, এই গণ-অভ্যুত্থান তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। তখন তাঁরা সংবিধান সংশোধন করে রাজাকে আরও বেশি ক্ষমতা প্রদান করেন এবং কার্যনির্বাহী বিভাগের ওপরও তাঁদের হাত আরও শক্ত করেন।

কিন্তু এই আপাত স্থিতাবস্থা গভীর সমস্যাগুলো আড়াল করে দেয়। জর্ডান এই মুহূর্তে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা অর্থনৈতিক সমস্যার জালে আটকানো। সেটির মূল কারণ ক্রমবর্ধমান পাবলিক ঋণ, যা এই মুহূর্তে জিডিপির ৯৫ শতাংশ; নিম্ন প্রবৃদ্ধি, যা এই মুহূর্তে দুই শতাংশ এবং উচ্চ বেকারত্ব, যেটির হার এই মুহূর্তে ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ আর যুবকদের মধ্যে সে হার ৩০ শতাংশ। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো থেকে আসা সহায়তা কমে যাওয়ার অর্থ হলো, এই দেশগুলো তাদের ঋণ পরিশোধ ও ঘাটতি মেটানোর জন্য এখন আর অনুদানের ওপর নির্ভর করতে পারছে না। সৌদি আরব ২০১১ সালের আন্দোলনের পর জর্ডানকে ৫ বিলিয়ন ডলার দেয়। ২০১৫ সালে এসে সৌদি জর্ডানের ভর্তুকির ওপর তিন বছরের স্থগিতাদেশ দেয় (সাম্প্রতিক আন্দোলনের পর কুয়েত, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত জর্ডানকে নতুন করে ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ প্রদানের ঘোষণা দেয়, যা মূলত তাদের ঋণের জামিন হিসেবে। কিন্তু তা আগের সহায়তার সমতুল্য নয়)।

পরবর্তী সময়ে জর্ডানে যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে, তারা এ ধরনের সমস্যাগুলোকে কেবল টেকনিক্যাল সমস্যা বলে মনে করে। জনগণের দাবি

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চাহিদাকে ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৮ সালের মে মাসে পুরো জর্ডানজুড়ে, বিশেষ করে পশ্চিম আম্মান যেখানে মূলত ধনীদের আবাস, সেখানে আবার আন্দোলন শুরু হয়[১২]। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় মধ্যবিত্তরা। সে আন্দোলনে ২০১১ ও ২০১২ সালে নেতৃত্ব দেওয়া ইসলামপন্থীদের দেখা যায় না। তাদের আন্দোলনের দাবি ছিল বিতর্কিত আয়কর আইন উঠিয়ে নেওয়া, পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া ও সরকার পরিবর্তন। স্পষ্টত, ২০১১ ও ২০১২ সালে রাজা আবদুল্লাহর নেওয়া পদক্ষেপ আন্দোলনের মূলোৎপাটনে ব্যর্থ হয়। জর্ডানের সামাজিক চুক্তি ভেঙে পড়েছে। আন্দোলনকারীদের দাবির মুখে কোনো প্রতীকী সমাধান নয়, বরং স্থায়ী সমাধান হলো মৌলিক একটি নতুন সামাজিক চুক্তি।

বিপ্লবের কারণে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল এবং সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছ থেকে যে বড় ধরনের সহায়তা পেত, তা কমে যাওয়ার কারণে মিসর এখনো ভুগছে[১৩]। উপসাগরীয় সহায়তা কমে যাওয়ার পর মিসর তার অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখতে ২০১৬ সালে তাদের মুদ্রার পরিমাণ বাড়ায় এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) দেওয়া ১২ মিলিয়ন ডলারের সহায়তার ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়।

এমতাবস্থায় তিউনিসিয়া হলো একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী উদাহরণ। ২০১১ সালের বিপ্লবের পর তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার সমাধান না হলেও সে দেশের নেতারা নতুন একটি সামাজিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন[১৪]। তিন বছরের ঝড়ঝঞ্ঝার পর একটি নির্বাচিত গণপরিষদ মধ্যস্থতা করে এবং একটি নতুন সংবিধানের ব্যাপারে সম্মত হয়। সেখানে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের মূলনীতি গ্রহণ করা হয়, নারীদের মোটামুটি সব অধিকার দেওয়া হয় এবং তিউনিসিয়ায় সবার জন্য সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত অধিকার নিশ্চিত করা হয়। তিউনিসিয়া কোনোভাবেই বিপদের বাইরে নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য তারা একটি শক্ত ভিত্তি অর্জন করেছে।

একটি নতুন সামাজিক চুক্তি

রাজপথের ওই বার্তা যদি আরব নেতাদের মধ্যে ২০১১ সালেই হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করার জন্য বল প্রয়োগ করতে না পারার ব্যর্থতা কিছুটা হলেও ওই আন্দোলনের ওপর বর্তায়। তবে স্বত্বভাড়াবাদের অবসানের কারণে সেই দিকে মনোযোগী হতে মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলো আরেকটি সুযোগ পাচ্ছে। অর্থনৈতিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কারও হতে হবে। এ থেকে জনগণ তাদের দেশ পরিচালনায় একটি অর্থবোধক বার্তা পাবে।

আরও কার্যকর অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিকে গেলে তার গতি হবে ধীর আর

সে পথ হবে অমসৃণ। যারা এই স্থিতাবস্থা থেকে লাভবান, তারা বড় বাধা সৃষ্টি করবে। দশক দশক ধরে টিকে থাকা এই পুরোনো স্বত্বভাড়াজীবী পদ্ধতি একটি কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহল তৈরি করেছে। মেধাভিত্তিক এই নতুন পদ্ধতি তাদের সেসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবে।

জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য একটি ধারাবাহিক, আন্তরিক ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার জন্য প্রথমে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হলে বাস্তবিক অর্থেই একটি নির্দিষ্ট সময় পরিশ্রম করতে হবে। অতীব প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিকেরা স্বল্পমেয়াদি এই ত্যাগ গ্রহণ করবে। তারা তখনই সেটা করবে, যখন তারা সে প্রক্রিয়ার অংশ হবে এবং তাদের সামনে একটি বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্ব থাকবে।

মধ্যপ্রাচের সরকারগুলো নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে। ওই অঞ্চলে কর্মশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ বিশ্বের সবচেয়ে কম (২০০৯ সালে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী যেখানে বিশ্বে গড়ে ৫৮ শতাংশ, সেখানে ওই অঞ্চলে মাত্র ৩২ শতাংশ[১৫])। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকারগুলোকে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগোতে হবে। ব্যক্তি খাত শক্তিশালীকরণ ও পাবলিক-প্রাইভেট যৌথ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে রাজস্বের উৎসগুলোতে দ্রুত বৈচিত্র্য আনতে হবে। তাদের অবশ্যই আইনের শাসন ও নাগরিকদের মধ্যে সমতার সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে কাজ করতে হবে, যা নতুনত্ব আনতে সহায়তা করবে। এ ছাড়া নারী ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আইনি বৈষম্য দূর করতে হবে।

মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলো তাদের দেশের প্রধান চাকরিদাতা হিসেবে থাকতে পারবে না। ব্যক্তি খাত, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সঠিক আইনি ও অর্থনৈতিক পরিবেশ থাকতে হবে, যা কোম্পানিগুলোর কলেবর বাড়াতে ও সরকারি খাতের চাকরি প্রতিস্থাপন করতে সহায়তা করবে। এটা বলা সহজ, কিন্তু করা কঠিন। কারণ, মান্ধাতা আমলের শিক্ষাব্যবস্থা ও অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা মধ্যপ্রাচ্যের একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে ব্যক্তি খাতে কাজ করার অনুপযোগী করে রেখেছে। বেকারত্ব ও পরিশ্রম কমাতে ব্যক্তি খাতভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অবশ্যই বড় পরিবর্তন আনতে হবে। বিশেষ করে, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, উদ্ভাবন ও ভিন্নমতের গ্রহণযোগ্যতা উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

সরকারগুলো যদি এখনই শুরুও করে, তবু এর ফলাফল আসতে এক থেকে দুই প্রজন্ম লেগে যাবে। তবে, ২০১১ সালের গণ-অভ্যুত্থান থেকে বোঝা যায় যে এর জন্য সময় বেশি নেই। রাস্তার এই দুর্দশা কমাতে, কষ্টকর হলেও তাদের

অবশ্যই কঠিন এই অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নেতারা সেটা পছন্দ করুন আর না-ই করুন, স্বত্বভাড়াজীবী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে একটি উৎপাদনশীল পদ্ধতিতে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। নাগরিক ও নেতাদের অবশ্যই এই নতুন সামাজিক চুক্তিতে সম্মত হতে হবে।

তবে এই নতুন সামাজিক চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একদল স্বপ্নচারী নেতার প্রয়োজন হবে, যাদের অন্তত তাদের দেশের এলিটদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ইচ্ছা আছে, যারা জানে কীভাবে ক্ষমতা ভাগাভাগির মাধ্যমে সেটি টিকিয়ে রাখতে হয়। যারা তাদের জনগণকে এ-ও বোঝাতে সক্ষম যে তারাই তাদের জনগণের উত্তম ভবিষ্যতের দিকনির্দেশক। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এখন সেই মাপের নেতা সেখানে নেই (শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, সব জায়গায় এমন নেতাদের অভাব রয়েছে)। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলোর কোনো বিকল্প পথ নেই। যদি তারা এই পরিবর্তনের দাবিকে অবজ্ঞা করতেই থাকে, তাহলে বড় কোনো ঝড় এসে নিজে নিজেই সেই পরিবর্তন করে দেবে।

[মূল লেখাটি ১৫ অক্টোবর ২০১৮ সালে *ফরেন অ্যাফেয়ার্স* সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে]

তথ্যসূত্র

১. https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-08-13/new-arab-order
২. https://www.foreignaffairs.com/articles/saudi-arabia/2017-03-13/saudi-arabias-failed-oil-war
৩. https://carnegieendowment.org/2017/12/01/nascent-hopes-pub-74887
৪. http://menaviz.worldbank.org/new_social_contract/index.html
৫. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/03/muasher.htm
৬. https://www.transparency.org/cpi2010
৭. https://www.nytimes.com/2011/06/09/world/middleeast/09saudi.html
৮. https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-03-19/fresh-prince
৯. https://www.newyorker.com/news/news-desk/the-catastrophe-of-saudi-arabias-trump-backed-intervention-in-yemen
১০. https://www.newyorker.com/news/news-desk/why-saudi-women-driving-is-a-small-step-forward-not-a-great-one
১১. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=SA

১২. https://www.nytimes.com/2018/06/04/world/middleeast/jordan-strike-protest.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FJordan
১৩. https://www.nytimes.com/reuters/2018/10/01/business/01reuters-egypt-economy-analysis.html
১৪. https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-08-07/quiet-threat-human-rights-tunisia
১৫. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:22063881~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:256299,00.html

রাজনীতি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিলীন সীমানা এবং তরুণদের মধ্যে অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিকাশ

ম্যাটস একস্ট্রম ও অ্যাডাম শেহাতা

সারসংক্ষেপ

অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে লেখাজোখায় 'বিলীন সীমানা' (porous boundaries) ও 'নড়বড়ে রক্ষণ' (low thresholds) ধারণাগুলো প্রায়ই দেখা যায়। বলা হয়ে থাকে যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বৈশিষ্ট্যই হলো অরাজনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে সীমানা থাকে, তা অস্পষ্ট হয়ে যায়। ফলে রাজনীতিতে না জড়াতে মানুষের যেই রক্ষণ থাকে, সেটাও নড়বড়ে হয়ে যায়। এই প্রবন্ধে এ যুক্তিটি বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি গবেষণালব্ধ পদ্ধতিতে খতিয়ে দেখা হয়েছে। এটা করতে গিয়ে সুইডেনের কিশোর-কিশোরীদের ওপর পাঁচ দফায় প্যানেল গবেষণা করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে অনলাইনে রাজনৈতিক তথ্য, মিথস্ক্রিয়া, সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি ও সামষ্টিক পদক্ষেপে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার মাত্রা ও বিকাশ বিষয়ে অনন্য এক পরিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সংক্ষেপে, ফলাফলে দেখা যায় বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সামাজিক আন্তযোগাযোগ আর রাজনৈতিক তথ্য ও মিথস্ক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়া একই সঙ্গে ঘটে। কেউ কেউ আবার সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি ও সামষ্টিক পদক্ষেপের সঙ্গেও সম্পৃক্ত হয়। দ্বিতীয়ত, মনে করা হয় যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নড়বড়ে রক্ষণ থাকার ফলে সময়ের আবর্তে একধরনের ভাসা-ভাসা (tune-in, tune-out) রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা তৈরি হয়, যে সম্পৃক্ততা হঠাৎ আছে, আবার খানিক বাদে থাকে না। আমাদের গবেষণায় এই ধারণার পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়নি। সব শেষে অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ওপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে, যা রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ উপাদানগুলোকে ছাপিয়ে যায়।

● অনুবাদ : **খলিলউল্লাহ্**

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

কিশোর-কিশোরী, সামষ্টিক পদক্ষেপ, দীর্ঘ সময়ব্যাপী প্যানেল গবেষণা, অনলাইন গণমাধ্যম, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা, বিলীন সীমানা, সামাজিক গণমাধ্যম, তরুণ নাগরিক।

ভূমিকা

অনলাইন গণমাধ্যম রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার শর্তগুলো বদলে দিয়েছে। ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে সামাজিক আন্দোলন ও সক্রিয়তায় নতুন গতিশীলতা যুক্ত হয়েছে (বেনেট ও সেগেরবার্গ, ২০১২; ডেনিক ও লেইস্টের্ট, ২০১৫), এবং জনসমক্ষে মতপ্রকাশ ও সামষ্টিক পদক্ষেপে অংশগ্রহণের নাগরিক সুযোগ নিশ্চিতভাবেই এর ফলে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের বৈশিষ্ট্য কী এবং এ প্রেক্ষাপট নাগরিকদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? এই গবেষণায় আমরা ক্রিটিক্যালি দেখার চেষ্টা করেছি এ-বিষয়ক গবেষণার একটি প্রধানতম যুক্তিকে। তা হলো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল ও জনপরিমণ্ডলের মধ্যে, সম্পৃক্ততার ধরনগুলোর মধ্যে এবং রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে সীমানা হয়ে থাকে বিলীন ও অস্পষ্ট। এর ফলে প্রথাগত রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ধরন নির্ধারণ করে দেওয়া যেই রক্ষণ মানুষের থাকে, তা কমে যায় (বিম্বার ও অন্যান্য, ২০১২; ব্রুনডিজে, ২০১০-এ; কারলিসলে ও প্যাটন, ২০১৩; জেনস ও অন্যান্য, ২০১৪)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যারা প্রায়ই সম্পৃক্ত থাকে, তাদের জন্য রাজনৈতিক বিষয়ে এক কদম ফেলা খুব সহজ ও প্রাসঙ্গিক ধরে নেওয়া হয়, যদিও ক্রিটিক্যাল সিদ্ধান্তে সম্পৃক্ত হওয়া একই রকম সহজ ও প্রাসঙ্গিক ধরা হয় না। এর ফলে রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত অবস্থার মধ্যে যে ফারাক, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এসে সেটা মিলিয়ে যায়। এই ফারাক সাধারণত গণতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত (নরিস, ২০০১; শ্লোজম্যান ও অন্যান্য, ২০১০)। যদি এটা সত্য হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় একটি র‍্যাডিক্যাল রূপান্তর। কারণ, এর ফলে বোঝা যায় যে অনলাইন মিডিয়া এখন আর শুধু বিকল্প নয়, বরং রাজনীতিতে নাগরিকদের সম্পৃক্ততার কেন্দ্রীয় পরিবেশ প্রদান করছে।

রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিভিন্ন দিকের ওপর অনলাইন গণমাধ্যম ব্যবহারের প্রভাব বিষয়ে যেসব গবেষণা আছে, সেখানে বিলীন সীমানা ও নড়বড়ে রক্ষণের ধারণা প্রায়ই উল্লেখ করা হয় (ব্রুনডিজে, ২০১০বি; কারলিস ও প্যাটন, ২০১৩; জেনস ও অন্যান্য, ২০১৪)। ব্যাপকভিত্তিক গবেষণায় অনলাইনে শক্তিশালী সক্রিয়তার বিষয় উঠে এসেছে, যেসব সক্রিয়তায় শুধু তরুণদেরই আকৃষ্ট করে এমন নয় (ডেনিক ও লেইস্টের্ট, ২০১৫; ভেলাসকুয়েজ ও লারোজ, ২০১৪)। তবে

তরুণদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ধরনে এসব রূপান্তরের প্রভাব কী, সে বিষয়টি গবেষণালব্ধ পদ্ধতিতে খুব একটা খতিয়ে দেখা হয়নি এখন পর্যন্ত। সেই কাজটি করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, বিলীন সীমানার তিনটি সম্ভাব্য প্রভাব বা তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে আমরা একটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী করা পাঁচ দফায় প্যানেল জরিপ ব্যবহার করেছি। অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার পৌনঃপুনিকতা ও ধরনের সঙ্গে প্রথম দুটি প্রভাব সম্পর্কিত। আর তৃতীয় প্রভাবটির সম্পর্ক রয়েছে ব্যক্তির সম্পৃক্ততাকে প্রভাবিত করে বলে যেসব পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে।

প্রথম ও সবচেয়ে র‍্যাডিক্যাল যে প্রভাব, তা থেকে দেখা যায় যে তরুণদের বহুলাংশের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বা যোগাযোগ ও রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা একই সঙ্গে ঘটে। এ বিষয়টি আরও বিস্তৃতভাবে খতিয়ে দেখতে আমরা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিভিন্ন ধরন বিশ্লেষণ করেছি। কোনো কোনো লেখক অনলাইন আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিলীন সীমানার উল্লেখ করলেও আরও বেশি ক্রিটিক্যাল যুক্তি পাওয়া যায় সামষ্টিক রাজনৈতিক কার্যক্রমে সংশ্লিষ্টতা বিষয়ে (বিম্বার ও অন্যান্য, ২০১২; আর্ল ও কিম্পোর্ট, ২০১১)। দ্বিতীয়ত, একটি বিকল্প প্রভাব থেকে দেখা যায় যে বিলীন সীমানার ফলে মাঝেমধ্যে ভাসা-ভাসা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা তৈরি হয়। এই প্রেক্ষাপটে আমরা একটি অনন্য দীর্ঘ সময়ব্যাপী করা গবেষণা নকশা ব্যবহারের সুবিধা নিয়েছি। উদ্দেশ্য ছিল কীভাবে নাগরিকেরা সময়ের আবর্তে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিভিন্ন ধরনে যুক্ত হয় এবং বের হয়ে যায়, তা খতিয়ে দেখা। তৃতীয়ত, বিলীন সীমানার ধারণার মানে এটাও দাঁড়ায় যে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা খানিকটা ব্যক্তির রাজনৈতিক আগ্রহ ও সংগতি থেকে মুক্ত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুধু সক্রিয় হয়েই এই মাধ্যম ব্যবহারকারী ব্যক্তি মাঝেমধ্যে রাজনীতিতে উদ্ভাসিত হয় এবং সহজেই করা যায় এমন সব রাজনৈতিক কার্যক্রমে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এই ধারণা আমরা খতিয়ে দেখেছি। তা করা হয়েছে অনলাইন রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিভিন্ন ধরনের ওপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অনন্য ইতিবাচক প্রভাব গবেষণা করার মাধ্যমে।

সীমানা, রক্ষণ ও অনলাইন গণমাধ্যমে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা

অনলাইনে রাজনৈতিক কার্যক্রমের সম্প্রসারণের ফলে এসব কার্যক্রমের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে। থিওকারিস (২০১৫) বলেন, অনলাইন কার্যক্রম একই সঙ্গে 'অফলাইনে রাজনৈতিক কাজের সমান' ও 'রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার সম্পূর্ণ নতুন এক পন্থা' (পৃ. ২)। ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা থেকে ধারণা করা হয় যে অনলাইন ও অফলাইন রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা শুধু স্বতন্ত্র কার্যক্রমই

নয়, বরং এগুলো তরুণদের রাজনীতির প্রতি যে ঝোঁক, তার সঙ্গেও সম্পর্কিত (একস্ট্রম ও অন্যান্য, ২০১৪; কিম ও অন্যান্য, ২০১৬; ক্রুইকেমিয়ের ও অন্যান্য, ২০১৪)। এই গবেষণায় যে ধারণা উন্মোচন করা হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে রাজনীতিতে নাগরিকদের সংশ্লিষ্টতা নির্ধারণ করে দেয় যেসব সীমনা, সেগুলোর ক্ষেত্রে অনলাইন গণমাধ্যম বেশ আলাদা। রাজনৈতিক কার্যক্রমের কাঠামো তৈরি হয় কিছু সীমানা দিয়ে (সামাজিক, সাংগঠনিক, প্রকরণগত)। এসব সীমানা মানুষকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে যেমন সক্ষম করে তুলতে পারে, তেমনি সীমাবদ্ধও করে ফেলতে পারে। রাজনীতিতে পা ফেলতে গেলে কিছু সীমা অতিক্রম করতে হয়, যা অল্পবিস্তর কষ্টের কাজ। যেমন ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল থেকে জনপরিমণ্ডলে প্রবেশ করতে হয়, সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ ও তার অঙ্গীকার রক্ষা করতে হয়, নতুন সামাজিক গোষ্ঠী বা নেটওয়ার্কে যোগ দিতে হয়, অথবা কোনো রাজনৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তু বদল করে ফেলতে হয়। এ রকম কোনো একটি সীমা অতিক্রম করা সম্ভাব্য ঝুঁকির কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় (একস্ট্রম, ২০১৬)। রক্ষণ যত বেশি হয়, রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত হতে তত বেশি শক্তিশালী ব্যক্তিগত প্রেরণার দরকার হয়।

অনলাইনের পরিবেশ কীভাবে রাজনৈতিক তথ্যের প্রতি সংবেদনশীলতা বাড়ায় এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনায় সংশ্লিষ্টতা বাড়ায় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্যোগের সঙ্গেও সংশ্লিষ্টতা বাড়ায়, তা ব্যাখ্যা করার জন্য বিলীন সীমানার ধারণা ব্যবহার করা হয় (ব্রুনডিজে, ২০১০বি; কিম ও অন্যান্য, ২০১৩)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেসব নেটওয়ার্ক গঠিত হয়, সেগুলো থেকে তথ্যের ক্রমাগত প্রবাহ সৃষ্টি হয়, যার সঙ্গে যুক্ত হয় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির খবর ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ। পূর্ববর্তী গবেষণায় এ-সম্পর্কিত বেশ কিছু যুক্তি পাওয়া যায়। যেমন রাজনৈতিক তথ্য পাওয়ার কম খরচ (কারলিসলে ও প্যাটন, ২০১৩ : ৮৮৪; ভিসারস ও স্টোল, ২০১৪ : ৯৪০); রাজনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপক সম্ভাবনা (শাহ ও অন্যান্য, ২০০১); এবং রাজনৈতিক আলোচনা, সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি এবং সামষ্টিক প্রতিবাদে যোগ দেওয়ার সহজলভ্য উপকরণ (একস্ট্রম ও ওসটম্যান, ২০১৫; বাউলিয়ান, ২০০৯; ব্রুনডিজ, ২০১০বি; জেনকিনস, ২০০৬)।

তবে সামষ্টিক পদক্ষেপের সঙ্গে বিলীন সীমানার ধারণার সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। বিম্বার ও অন্যদের (২০১২) কাজে দেখা যায় যে সামষ্টিক পদক্ষেপের পরিবর্তিত রূপ বোঝার ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় হলো ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল ও জনপরিমণ্ডলের মধ্যকার সীমানা দুর্বল করা। 'ব্যক্তির দিক থেকে উদ্যোক্তা' হওয়ার এবং আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ ছাড়াই কম খরচে অবদান রাখার

অবকাঠামো করে দিয়েছে যোগাযোগ প্রযুক্তি। সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত ছাড়াই ব্যক্তিগত ক্ষেত্র থেকে সর্বজনীন বিষয়ে সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হয় : 'যখন মুক্তভাবে এবং বৃহৎ সামাজিক কাঠামো বা আনুষ্ঠানিক রীতিনীতি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়েই মানুষের পদক্ষেপ নেওয়ার বিরাট সক্ষমতা থাকে, তখন তাদের কোনো একটি সীমানার ব্যাপারে দর-কষাকষি করতে স্বাভাবিকভাবেই কম ভাবনা-চিন্তা বা হিসাব-নিকাশ করতে হয়' (বিম্বার ও অন্যান্য, ২০১২ : ৬২)। প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ওপর করা গবেষণাগুলোয় একই ধারণা আলোচিত হয়েছে। বেনেট ও সেগেরবার্গ (২০১২) একটি ধারণা দিয়েছেন। ধারণাটি হলো 'সংযোজক কার্যক্রম', যা দিয়ে একজন ব্যবহারকারী বা ব্যক্তি 'যেসব ধারণা, পরিকল্পনা, ছবি বা উপকরণ নিজে আত্মস্থ করেছে, সেগুলো অন্যদের নেটওয়ার্কের সঙ্গে স্বপ্রণোদিত (আত্মকেন্দ্রিক নয়) হয়ে ভাগাভাগি করে' (পৃ. ৭৫৩)। এই ধারণা তাঁরা দিয়েছেন উল্লিখিত সম্পৃক্ততার বৈশিষ্ট্য বোঝানোর জন্য। সামষ্টিক আন্দোলনের সঙ্গে ব্যক্তিগত, নমনীয় ও শিথিল ধরনের সংযোগ তৈরি করতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সক্ষম করে তোলে।

এ ছাড়া আর্ল ও কিমপোর্ট (২০১১) জোর দিয়েছেন যে বিষয়ের ওপর, তা হলো অনলাইন আবেদন, বয়কট আন্দোলন ও প্রচারণা সংগঠিত করা এবং তাতে অংশগ্রহণ করার খরচ কমে যাওয়া, যদিও অংশগ্রহণকারী ও আন্দোলনের ধরনভেদে সময় ও সম্পদে যে বিনিয়োগ, তা ভিন্ন ভিন্ন হয়। ক্ষণস্থায়ী (পাঁচ মিনিট) আন্দোলন বা সক্রিয়তার পৌনঃপুনিক ঘটনা এবং সমমনা নেটওয়ার্কগুলোয় সেগুলো পাঠানো থেকে বোঝা যায় কীভাবে ব্যক্তিগত মতামত সর্বজনীন পদক্ষেপে পরিণত হয় এবং এর ফলে নাগরিক অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় (আর্ল ও কিমপোর্ট, ২০১১ : ৭২-৭৬)। আর্ল (২০১৪) যুক্তি দেন যে এই ধরনের কম খরচের সক্রিয়তাও সম্ভাব্য গুরুত্ব বহন করে। তিনি বলেন, সবাই জানে যে 'বেশির ভাগ মানুষ কোনো পদক্ষেপ নেয় না এবং যদি নেয়, তাহলে সেটা তখনই নেয়, যখন পদক্ষেপ নেওয়ার খরচ কম থাকে' (আর্ল, ২০১৪ : ১৭৪)। যেসব কার্যক্রমকে হীনভাবে দেখানো হতো এবং 'ক্লিকটিভিজম' (clicktivism) ও 'স্ল্যাকটিভিজম' (slacktivism) হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো, এসব বিশ্লেষণে সেগুলোর পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে (হালুপকা, ২০১৪)।

সংক্ষেপে, বিদ্যমান গবেষণা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার রূপান্তরকারী প্রেক্ষাপটের তিনটি মাত্রার সঙ্গে বিলীন সীমানার ধারণা সম্পর্কিত। প্রথমত, অনলাইন গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত সামর্থ্যের কারণে সামাজিক নেটওয়ার্কিং, শেয়ারিং ও প্রকাশের একটি অবকাঠামো তৈরি করে দিয়েছে, যা ব্যাপকভাবে অবারিত, যদিও তা পেতে কিছু নির্দিষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। বিম্বার ও অন্যদের (২০১২ : ৬৪) করা কাজে বলা হয়েছে যে সীমানা অতিক্রমের যেই

পদ্ধতি প্রযুক্তির মাধ্যমে অনলাইন জগতে সৃষ্টি হয়, তা বাস্তব দুনিয়ার সেতুর মতোই সীমানা অতিক্রমের সুবিধা করে দেয়। সামাজিক যোগাযোগের সাইটগুলোয় বহু ধরনের উপকরণ থাকে, যা তৈরিই করা হয়েছে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও কার্যক্রমের মধ্যে বদল আনার সুবিধার্থে। দ্বিতীয়ত, অনলাইন গণমাধ্যমকে বলা হয় পরিমণ্ডল ও কর্মকাণ্ডের বাস্তবিক সম্মিলনের প্রেক্ষাপট। পাপাক্যারাসির (২০১০ : ৭৬, ১৪৪) যুক্তি মতে, এসব প্রেক্ষাপটের বৈশিষ্ট্য হলো আত্মকেন্দ্রিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এখানে একই বিন্দুতে মিলিত হয়। অন্যান্য প্রেক্ষাপটে যেসব কর্মকাণ্ড আলাদা থাকে, সেগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মে এসে একীভূত হয়ে যায়। ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যকার সম্পর্ক এখানে স্বতন্ত্র হওয়ার বদলে হয়ে যায় তরল। তৃতীয়ত, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপট প্রয়োজন, তার বৃহত্তর পুনর্গঠনের ব্যাপারে অনলাইন গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। এটা সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায় অভ্যন্তরীণ বিন্যাস ও গতিশীল গণমাধ্যমে যেসব কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়, সেগুলো আরও বেশি আত্মসংগঠিত হয়। এসব প্রবণতার মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়, যা আরও বেশি ব্যক্তিগত, উদ্দেশ্যমুখী এবং অ্যাডহক ধরনের সম্পৃক্ততার দিকে নিয়ে যায় (বেনেট, ২০১২; ডাল্টন, ২০০৯)। এভাবেই সুবিধামাফিক সময় ও স্থানে প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দের সঙ্গে অনলাইনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সহজেই একীভূত হয়ে যায়, কারণ সাধারণত এই ধরনের সম্পৃক্ততার জন্য সীমিত অঙ্গীকার থাকলেই চলে।

প্রভাব ও অনুসিদ্ধান্ত

ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা থেকে আমরা জোরালো যুক্তি খুঁজে পাই। দেখা যায় যে রাজনীতিতে নাগরিক সম্পৃক্ততার নতুন শর্তাবলি তৈরি করে দিচ্ছে অনলাইন গণমাধ্যম। ফলে এই সম্পৃক্ততা হয়ে ওঠে আরও সহজ ও কম খরচের। নড়বড়ে রক্ষণ ও বিলীন সীমানার ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলো হলো কম খরচ সম্পর্কে যুক্তিগুলোর একটি মিশ্রণ (কারলিসলে ও প্যাটন, ২০১৩; আর্ল ও কিমপোর্ট, ২০১১; ভিসারস ও স্টোল, ২০১৪); সহজলভ্যতা ও উন্মোচন (বাওলিয়ান, ২০০৯; ব্রুনডিজ, ২০১০বি); সম্পৃক্ততার শিথিল ধরন (বেনেট ও সেগেরবার্গ, ২০১২); এবং কম প্রেরণা ও অঙ্গীকারসম্পন্ন সম্পৃক্ততা (বিম্বার ও অন্যান্য, ২০১২)। যাহোক, অনলাইনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ধরনের যেসব প্রভাব ধরে নেওয়া হয়, সেগুলো নির্দিষ্ট করা হয়নি বা গবেষণালব্ধ পদ্ধতিতে খতিয়ে দেখা হয়নি। আমরা তিনটি আলাদা প্রভাব বা তাৎপর্যের কথা বলব। তা

করার আগে অবশ্য রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার একটি ধারণা তৈরি করা দরকার।

অনলাইন গণমাধ্যম কতগুলো প্রেক্ষাপট দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এগুলো হলো তথ্যের ব্যাপারে সহজাত উন্মোচন ঘটা, আলোচনা ও শেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত থেকে রাজনৈতিক বিষয়ে রূপান্তর ঘটা, সৃজনশীল উৎপাদন ও প্রকাশনার সহজ ও অবারিত সুবিধা এবং অনলাইন প্রতিবাদের সামষ্টিক কার্যক্রমে আত্মসংগঠিত ও কম খরচে ধরন। পূর্ববর্তী গবেষণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা চার ধরনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার মধ্যে পার্থক্য করেছি। এগুলো হলো, রাজনৈতিক তথ্য (রাজনৈতিক তথ্য পড়া ও খোঁজা); রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া বা আন্তযোগাযোগ (কমেন্ট করা, রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করা, রাজনৈতিক খবর ও ক্লিপ শেয়ার ও সংযোগ করা); সর্বজনীন বিষয় উৎপাদন (রাজনীতি বিষয়ে ব্লগে লেখা বা ভিডিও ক্লিপ তৈরি করা); সামষ্টিক কার্যক্রম (প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু করা ও যোগ দেওয়া)। এই ধারণার দুটি দিকের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ধরন বলতে বোঝায় এমন সব পন্থা, যেখানে নাগরিকেরা রাজনীতি ও সর্বজনীন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ও যুক্ত থাকতে পারে (একস্ট্রম ও অন্যান্য, ২০১৪; কোলড্রি ও অন্যান্য ২০০৭) এবং এর ফলে এটা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের চেয়েও বড় পরিসরের ধারণা (হুগি, ২০১৪; থিওকারিস, ২০১৫; অ্যান ডিথ, ২০১৪)। যেসব সম্পৃক্ততার ধরন আমরা গবেষণা করেছি, তার মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সাধারণ মানদণ্ড সবচেয়ে স্পষ্টভাবে পূরণ করে সামষ্টিক কার্যক্রম বা পদক্ষেপ। দ্বিতীয়ত, 'ধরন' বলতে কিছু বাস্তব কাজের প্রকারভেদ বোঝায়, যা বিভিন্নভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আন্তযোগাযোগমূলক কার্যক্রম, যেমন শেয়ারিং ও পোস্টিং হতে পারে রাজনৈতিক সক্রিয়তায় যুক্ত হওয়ার একটি পন্থা। তবে আমাদের ধারণায় আন্তযোগাযোগ বলতে মূলত বোঝানো হয়েছে বন্ধুবান্ধব ও নিজের নেটওয়ার্কের মধ্যে আন্তযোগাযোগ, যা রাজনৈতিক সক্রিয়তায় স্পষ্টভাবে প্রোথিত নয়। এর বাইরেও, ধরন বলতে সাধারণ কাজকর্মও বোঝায় (অবগত থাকা, আন্তযোগাযোগ ও মন্তব্য করা, কোনো কিছু বানানো এবং কোনো সংগঠনে যোগ দেওয়া বা সদস্য হওয়া)। এগুলো অনলাইন গণমাধ্যমে বিকশিত হয়, কিন্তু তা এই মাধ্যমের একচেটিয়া বিষয় নয়।

পূর্ববর্তী গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে নড়বড়ে রক্ষণের ধারণা বিভিন্ন ধরনের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে এই ধরনের রক্ষণে কেন পার্থক্য হয়, তা ধরে নেওয়ার কিছু কারণ আছে। ব্যক্তির প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে সম্পৃক্ততা ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং এর মাত্রাও ভিন্ন হয়, যেখানে কোনো একটি কর্মকাণ্ডের কারণে ব্যক্তিগত মতামত বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা সবার সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। অনলাইনের জন্য কোনো কনটেন্ট তৈরি করে প্রকাশ করার চেয়ে সেগুলো পড়া ও মন্তব্য করা

কম কষ্টের। পড়ার মধ্যেও ভিন্নতা আছে, তা নির্ভর করে সেটা ব্যক্তিগত নাকি সর্বজনীন। সর্বজনীন কাজের মধ্যে সামষ্টিক প্রতিবাদে সম্পৃক্ত হওয়ার তুলনায় শুধু মন্তব্য ও আলোচনা করা মানে হলো দুর্বল অঙ্গীকার। অন্যদিকে ধরে নেওয়া হয় যে প্রচেষ্টা, খরচ ও অঙ্গীকারের মতো বিষয়গুলো অনলাইন গণমাধ্যমে কম হয়। যেমন সমসাময়িক গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতিশীল ধরন হিসেবে অনলাইনে সামষ্টিক পদক্ষেপ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। এর অংশত কারণ হলো এসব গণমাধ্যম নাগরিকদের কম খরচে সহজেই অবারিত ও স্বল্পকাল স্থায়ী প্রতিবাদে যুক্ত করতে পারে। তাই বিভিন্ন সম্পৃক্ততার ধরন কত মাত্রায় রাজনীতির বিভিন্ন রক্ষণ চিহ্নিত করে, তা একটি গবেষণালব্ধ প্রশ্ন। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে আমরা বিলীন সীমানার সাধারণ ধারণা সম্পর্কে তিনটি সম্ভাব্য গবেষণালব্ধ প্রভাব ক্রিটিক্যালি খতিয়ে দেখেছি।

প্রথম প্রভাব বা তাৎপর্য অনুযায়ী, বেশির ভাগ তরুণ, যারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়, তারা রাজনীতিতেও সম্পৃক্ত। এটা খুবই সুদূরপ্রসারী প্রভাব। কারণ, তরুণদের মধ্যে খুব স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হলো রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। তবে যদি সীমানা সত্যিই বিলীন হয়, যা প্রায় তরল, তাহলে অনলাইন গণমাধ্যমে সামাজিক সম্পৃক্ততা আর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বহুলাংশেই একই রকম হয়ে যায়। রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিভিন্ন ধরনের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনায় নিয়ে দুটি অনুসিদ্ধান্ত বা হাইপোথিসিস দেওয়া হয়েছে, যেখানে দ্বিতীয়টির চেয়ে প্রথমটি বেশি র‍্যাডিক্যাল :

> হাইপোথিসিস ১ : সামাজিক আন্তযোগাযোগের লক্ষ্যে যেসব তরুণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, তাদের বেশির ভাগই অনলাইন রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়। আর এই সম্পৃক্ততা চার ধরনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
>
> হাইপোথিসিস ২ : সামাজিক আন্তযোগাযোগের লক্ষ্যে যেসব তরুণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, তাদের বেশির ভাগই অনলাইন রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়। তবে এটা শুধু তথ্য ও আন্তযোগাযোগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যার মানে হলো, তাদের কার্যক্রমগুলো কন্টেন্ট তৈরি ও সামষ্টিক পদক্ষেপের চেয়ে কম কষ্টের।
>
> বিকল্প দ্বিতীয় প্রভাব থেকে দেখা যায় যে বিলীন সীমানার কারণে অনলাইনে ভাসা-ভাসা ধরনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা তৈরি হয়। এই প্রভাব প্রথম প্রভাবের বিপরীত। রাজনীতিতে স্থায়ীভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়ার যে সাধারণ ধরন, তার বদলে এখানে নাগরিকেরা সময়ের আবর্তে রাজনীতিতে যুক্ত হচ্ছে, আবার চাইলে বিযুক্ত হয়ে পড়ছে :

হাইপোথিসিস ৩ : অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার সবচেয়ে স্বাভাবিক ধরন হলো ভাসা-ভাসা, মানে হঠাৎ আছে, হঠাৎ নেই। এ রকম সম্পৃক্ততার ধরন স্থায়ী সম্পৃক্ততা বা বিযুক্ততার বিপরীত।

সব শেষে বিলীন সীমানার ধারণা থেকে বোঝা যায় যে অনলাইনে রাজনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া মানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উপস্থিত থাকা, যা রাজনৈতিক আগ্রহ ও সামাজিকীকরণের উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। ধরে নেওয়া হয় যে এটা বিভিন্ন ধরনের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (বিম্বার ও অন্যান্য, ২০১২ : ৬২; ব্রুনডিজ, ২০১০বি : ৬৮৪)। নিচের অনুসিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমরা এই ধারণা পরীক্ষা করেছি : হাইপোথিসিস ৪ : অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ওপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সামাজিক আন্তযোগাযোগের একটি ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে, যা রাজনৈতিক আগ্রহ ও সামাজিকীকরণ উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

গবেষণাপদ্ধতি ও উপাত্ত

এই গবেষণার জন্য একটি দীর্ঘ সময়ব্যাপী করা প্যানেল জরিপের পাঁচটি বার্ষিক ধাপ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে দুটি দল যুক্ত করা হয়েছে : প্রথম উপাত্ত সংগ্রহে ১৩-১৪ বছর বয়সী হাইস্কুলের জুনিয়র শিক্ষার্থীদের যুক্ত করা হয়েছে, যাদের পাঁচ বছর/পাঁচ ধাপে জরিপ করা হয়েছে; ১৬-১৭ বছর বয়সী হাইস্কুলের সিনিয়র শিক্ষার্থীদের যুক্ত করা হয়েছে শুরুতে, যাদের চার দফায় জরিপ করা হয়েছে। গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে সুইডেনের একটি অঞ্চলে, যার জনসংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৭৫ হাজার। এই সংখ্যা জাতীয় জনসংখ্যার গড়ের কাছাকাছি। সংশ্লিষ্ট যেসব চলক রয়েছে, যেমন বেকারত্বের হার, আয়ের মাত্রা, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং রাজনৈতিক ঝোঁক, সেগুলোর সঙ্গেও এই সংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাছাইকৃত স্যাম্পলে যে বয়সের যেসব শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তারা সেই অঞ্চলের ২৬টি স্কুলের মধ্যে ১৩টি স্কুলের শিক্ষার্থী, যা প্রায় ৫০ শতাংশ হয়। সতর্কতার সঙ্গে স্কুল বাছাই করা হয়েছে, যেন তাত্ত্বিক ও কারিগরি দুই ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। স্কুলগুলো নেওয়া হয়েছে শহরের কেন্দ্র, শহরের উপকণ্ঠ এবং গ্রামীণ এলাকা থেকে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক পার্থক্যসমেত পার্শ্ববর্তী স্কুলও বাছাই করা হয়েছে। বাছাইকৃত স্কুলগুলোর সব শিক্ষার্থীকেই গবেষণায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। স্কুলের নির্ধারিত পাঠদান সময়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। এগুলো পরিচালনার দায়িত্বে ছিল প্রশিক্ষিত গবেষণা সহকারীরা। তারাই

শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্নমালা বিতরণ করেছে। তা করার আগে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বিষয়। যেমন গবেষণা সম্পর্কে, ব্যক্তিগত উত্তরের গোপনীয়তা এবং বলা হয়েছে যে এখানে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। স্কুলভিত্তিক জরিপে সহায়তা করতে ডাকযোগেও জরিপ করা হয়েছে (অনলাইনে প্রশ্নমালা সহজলভ্য ছিল)। ডাকযোগে করা জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে যারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছেড়ে দিয়েছে তাদের জন্য, যা আসলে দ্বিতীয় দলের জন্য উপাত্ত সংগ্রহের চূড়ান্ত দফায় প্রযোজ্য। এক নম্বর টেবিলে স্যাম্পল সাইজ এবং বিভিন্ন প্যানেলে বিভিন্ন দফায় দুটি দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অংশগ্রহণের হার বিষয়ে পূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

টেবিল ১ : প্রতিটি প্যানেলের জন্য স্যাম্পল ও অংশগ্রহণের হার

বছর	কোহর্ট ১ (১৩-১৪ বছর বয়সী)		কোহর্ট ২ (১৬-১৭ বছর বয়সী)	
	স্যাম্পল	অংশগ্রহণের হার	স্যাম্পল	অংশগ্রহণের হার
২০১০	৯৬০	৯৪% (N=৯০৪)	১০৫২	৮৫% (N=৮৯২)
২০১১	৯৮৭	৮৯% (N=৮৮৩)	৯৯৬	৮১% (N=৮০৭)
২০১২	৯৫৪	৮৮% (N=৮৪৩)	৯১৪	৮১% (N=৭৪০)
২০১৩	৯৩৪	৭৭% (N=৭২৩)	—	—
২০১৪	৯৩৫	৭৪% (N=৬৯৫)	৯৩৯	৫০% (N=৪৬৭)

অঞ্চলভিত্তিক গবেষণা নকশার প্রধান কারণ হলো বড় আকারে স্কুলভিত্তিক প্যানেল গবেষণার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা। এই গবেষণার শক্তির দিক হলো উপাত্ত সংগ্রহের পাঁচ দফার ক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক রকমে বেশি সাড়া পাওয়া গেছে। গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে নির্ধারিত স্থানেই, অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে। এটাও জরিপের গুণগত মানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। স্যাম্পল নেওয়ার ক্ষেত্রে র‍্যানডম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়নি। এটা একটা সীমাবদ্ধতা যা সাধারণীকরণের ব্যাপারে উদ্বেগের জন্ম দিতে পারে। তবে সাড়া প্রদানের হার এবং যেহেতু বাছাইকৃত স্যাম্পলের সামাজিক ও জনমিতি চলকগুলোর সঙ্গে জাতীয় গড়ের মিল রয়েছে, তাই আমাদের বিশ্বাস, র‍্যানডম স্যাম্পল নিলে যেই ফলাফল পাওয়া যেত, এ ক্ষেত্রেও সে রকম ফলাফল পাওয়া গেছে।

পরিমাপপদ্ধতি

কিশোর-কিশোরীদের অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বিশ্লেষণের জন্য আমরা ব্যাপকভিত্তিক জরিপের প্রশ্নমালার ওপর নির্ভর করেছি, যা প্যানেলের প্রতিটি

দফায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। উল্লিখিত পাঁচটি মাত্রাই অনলাইন কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে: সামাজিক আন্তযোগাযোগ, রাজনৈতিক তথ্য, রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ, সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি করা এবং সামষ্টিক পদক্ষেপ।

সামাজিক আন্তযোগাযোগ পরিমাপ করার জন্য তিনটি আইটেম বা পদ ব্যবহার করা হয়েছে। আর তা তুলে আনতে নিচের প্রশ্নটি করা হয়েছে: 'নিচের কাজগুলো করার জন্য তুমি কী পরিমাণে ইন্টারনেট/কম্পিউটার ব্যবহার করো?' নির্দিষ্ট আইটেমগুলো হলো: ১. এমএসএন, মাইস্পেস বা এই ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলা; ২. ফেসবুক বা এই ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ বা তাদের সম্পর্কে অবগত থাকে কি না এবং ৩. ফেসবুকে নিজের সম্পর্কে তথ্য ছড়ানো, অনলাইনে ছবির ডায়েরি দেওয়া বা এই ধরনের অন্যান্য কাজ করে কি না। এই আইটেমগুলোর জন্য উত্তর প্রদানের মাপকাঠি ছিল ১ থেকে ৫। ১ মানে প্রতিদিন আর ৫ মানে কখনোই না। যোগ করার জন্য নির্দিষ্ট সূচক থেকে উচ্চ মাত্রার নির্ভরযোগ্যতা পাওয়া যায় (ক্রোনবাক'স আলফা = .৭৭, ওয়েভ বা দফা ১)।

অনলাইনে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিমাপের জন্য আমরা অনেকগুলো আইটেম ব্যবহার করেছি। এ ক্ষেত্রে নিচের প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, 'বিগত দুই মাসে তুমি নিচের কোনো একটি কাজ করেছ কি না।' অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার প্রথম মাত্রা হলো রাজনৈতিক তথ্য। এটা পরিমাপ করতে চারটি আইটেম ব্যবহার করা হয়েছে: ১. কোনো রাজনৈতিক ওয়েবসাইট দেখেছে কি না; ২. ইন্টারনেটে রাজনীতি বা সামাজিক সমস্যা বিষয়ে তথ্য ঘেঁটেছে কি না; ৩. কোনো ব্লগে রাজনীতি সম্পর্কে পড়েছে কি না এবং ৪. রাজনীতি বা সামাজিক সমস্যা বিষয়ে কোনো ভিডিও বা ক্লিপ দেখেছে কি না (ক্রোনবাক'স আলফা =.৮১, ওয়েভ ১)। নিচের চারটি আইটেম ব্যবহার করে রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ পরিমাপ করা হয়েছে: ১. বন্ধুদের সঙ্গে কোনো খবরের সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে কি না; ২. অনলাইনে বন্ধুদের সঙ্গে সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছে কি না; ৩. রাজনৈতিক কন্টেন্টের কোনো ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়েছে কি না এবং ৪. রাজনৈতিক বা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো বার্তা আছে এমন কোনো গান শেয়ার করেছে কি না (ক্রোনবাক'স আলফা =.৭০, ওয়েভ ১)। তিনটি আইটেম ব্যবহার করে সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি পরিমাপ করা হয়েছে: ১. নিজের ব্লগ বা ওয়েবসাইটে রাজনীতি বা সামাজিক সমস্যা বিষয়ে কিছু লিখেছে কি না; ২. ইউটিউব বা এই ধরনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আছে, এমন কোনো ভিডিও তৈরি করে দিয়েছে কি না এবং ৩. কোনো অনলাইন পত্রিকায় কোনো লেখাজোখা, ছবি বা তথ্য দিয়ে অবদান রেখেছে কি না (ক্রোনবাক'স আলফা =.৬৫, ওয়েভ

১)। সব শেষে সামষ্টিক পদক্ষেপ পরিমাপ করার জন্য চারটি আইটেম ব্যবহার করা হয়েছে: ১. অনলাইনে কোনো প্রতিবাদ বা বয়কট আন্দোলন সংগঠিত করেছে কি না; ২. অনলাইনে কোনো প্রতিবাদে অংশ নিয়েছে কি না; ৩. সামাজিক সমস্যা বিষয়ে ফেসবুকে বা এই ধরনের কোনো মাধ্যমে যেসব গ্রুপ খোলা হয়, সেগুলোয় যুক্ত হয়েছে কি না এবং ৪. এবং উত্তরদাতার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে এমন কোনো সামাজিক সমস্যার জন্য ফেসবুক বা একই রকম মাধ্যমে কোনো গ্রুপ নিজে খুলেছে কি না (ক্রোনবাক'স আলফা =.৭৩, ওয়েভ ১)। এসব আইটেমের জন্য উত্তর প্রদানের মাপকাঠি ছিল ১ থেকে ৩, যেখানে ১ মানে 'হ্যাঁ' আর ৩ মানে 'না'।

প্রাথমিক আগ্রহের এই চলকগুলো ছাড়াও আমাদের বিশ্লেষণে কিছু নিয়ন্ত্রক চলক ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, মূল সামাজিকীকরণ প্রেক্ষাপট (পরিবার ও বন্ধুবান্ধব) ও প্রেরণার উপাদানগুলোর প্রভাব যেন দূর করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক আগ্রহ, যা পরিমাপ করা হয়েছে দুটো আইটেমের ওপর ভিত্তি করে: ১. 'রাজনীতিতে তুমি কতটা আগ্রহী?' এবং ২. 'সমাজে যা ঘটছে সে ব্যাপারে তুমি কতটা আগ্রহী।' উত্তর পরিমাপের জন্য ১ থেকে ৫ পর্যন্ত স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে। ১ মানে হলো একেবারেই আগ্রহী নয় আর ৫ মানে হলো খুবই আগ্রহী। এই আইটেমগুলোকে আবার পুনরায় কোড করা হয়েছে ০ ও ১ ব্যবহার করে। এর ফলে একটি একক রাজনৈতিক আগ্রহের স্কেলে গড় হিসেবে পরিমাপ করা গেছে (পিয়ারসন'স r=.৫৪, ওয়েভ ১)। পিতা-মাতা ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে রাজনৈতিক আগ্রহকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিকীকরণ উপাদান হিসেবে দেখা হয়। পিতা-মাতা ও বন্ধুবান্ধবের জন্য এই ধারণাগুলো পরিমাপের উদ্দেশ্যে একটি একমত-দ্বিমত প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন: ১. সমাজে যা ঘটে, সে ব্যাপারে আমার পিতা-মাতা (বন্ধুবান্ধব) আগ্রহী; এবং ২. আমার পিতা-মাতা (বন্ধুবান্ধব) বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর রাখেন। এটা পরিমাপের জন্য ১ থেকে ৪ পর্যন্ত স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে। ১ মানে হলো সম্পূর্ণ একমত আর ৪ মানে সম্পূর্ণ দ্বিমত। পিতা-মাতার (ওয়েভ ১ ক্রোনবাক'স আলফা =.৬৫, মিডিয়ান =০.৬৯, স্ট্যানডার্ড ডেভিয়েশন =০.১৮) এবং বন্ধুবান্ধবের (ওয়েভ ১, পিয়ারসন'স r=.৫৫, মিডিয়ান =০.৪৮, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন =০.২২) রাজনৈতিক আগ্রহ সূচকে গড় করার আগে এই পরিমাপগুলো আবার ০ ও ১ ব্যবহার করে পুনরায় কোড করা হয়েছে। সব শেষে পরিবারের আর্থরাজনৈতিক অবস্থা পাঁচটি আইটেমের ওপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়েছে। এগুলো হলো: ১. যদি তুমি এমন কিছু চাও (যেমন কম্পিউটার, স্কেটবোর্ড, সেলফোন), যার জন্য অনেক টাকা খরচ হবে, তাহলে কি তোমার পিতা-মাতা তা কিনে দিতে সক্ষম? ২. তোমার শ্রেণিকক্ষের অন্যদের

তুলনায় তোমার কোনো কিছু কেনার জন্য টাকা বেশি না কম? ৩. তোমার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অন্য পরিবারের তুলনায় তোমার পিতা-মাতার টাকাপয়সা কি বেশি না কম? ৪. তোমার পরিবারের আর্থিক অবস্থা কেমন? এবং ৫. তুমি ও তোমার পরিবার বাইরে ঘোরাফেরা কেমন করে? এসব প্রশ্নের উত্তরও ০ ও ১ ব্যবহার করে পুনরায় কোড করা হয়েছে, যাতে পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থার একটি একক সূচক তৈরি করা যায় (ক্রোনবাক'স আলফা =.৭৬, ওয়েভ ১)।

উপাত্ত বিশ্লেষণ

আমাদের বিশ্লেষণে বহুলাংশে বর্ণনামূলক উপাত্ত উপস্থাপন করা হবে। উদ্দেশ্য হলো, কিশোর-কিশোরীদের অনলাইনে সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাত্রা, সমন্বয় ও সময়গত স্থিতিশীলতাকে দৃষ্টিগোচর করা। এসব বর্ণনামূলক উপস্থাপনায় আমরা অনলাইনে রাজনৈতিক 'সম্পৃক্ততার' একটি উদার ও প্রায়োগিক সংজ্ঞা বাছাই করেছি: আর তা হলো, যেসব কিশোর-কিশোরী বলেছে যে তারা ১. যেকোনো একটি সম্পৃক্ততার ধরনে গত দুই মাসে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং ২. বিগত দুই মাসে এ রকম দুটি কাজে অন্তত একবার যুক্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করেছি সম্পৃক্ততার পৌনঃপুনিকতা নির্ধারণের ব্যাপারে উদার থাকতে (গত দুই মাসে অন্তত একবার) এবং একটি নির্দিষ্ট আইটেমের ব্যাপারে বেশি সংবেদনশীল না হতে। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখারও চেষ্টা করেছি।

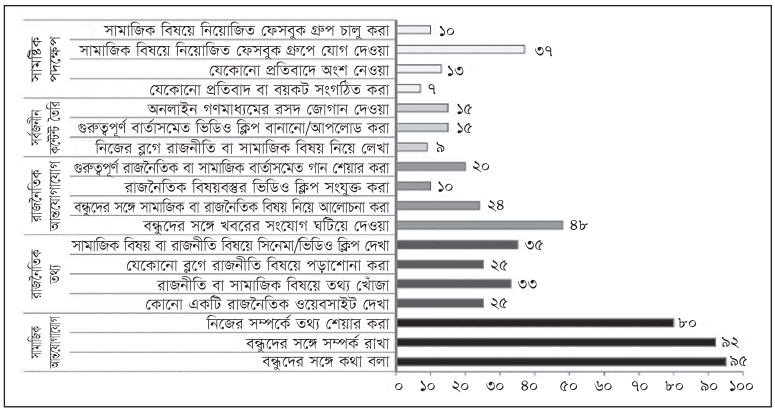

চিত্র ১ : সামাজিক ও রাজনৈতিক অনলাইন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা (%)
বিভিন্ন ধরনের অনলাইন সামাজিক আন্তযোগাযোগে (অন্তত 'মাসে একবার') সম্পৃক্ত উত্তরদাতা এবং যারা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রমে জড়িত যেমন রাজনৈতিক তথ্য, রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ, সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি এবং সামষ্টিক পদক্ষেপ (অন্তত 'বিগত ২ মাসে একবার') তাদের পরিমাণ। *N* (সর্বনিম্ন)= ১৭৩৭

বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়ার বাইরেও আমরা উচ্চতর প্যানেল রিগ্রেশন মডেল ব্যবহার করেছি। এটা করার উদ্দেশ্য ছিল বিলীন সীমানা ও নড়বড়ে রক্ষণের তৃতীয় অনুমিত প্রভাবের একটি যথাযথ পরীক্ষা পরিচালনা করা। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, প্যানেল জরিপের পাঁচটি দফার ওপর ভিত্তি করে আমরা দ্বিমুখী স্থির-প্রভাবযুক্ত প্যানেল মডেল ব্যবহার করেছি। বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে যদি অগোচরে কোনো বৈসাদৃশ্য থেকে থাকে (কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরিমাপ করা হয়নি এমন পার্থক্য), তাহলে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করবে এসব মডেল। আর এই কাজে এসব মডেল নির্ভর করেছে সময়ের আবর্তে ব্যক্তির মধ্যে যেসব ভিন্নতা তৈরি হয়, তার ওপর (অ্যালিসন, ২০০৯; ফিনকেল, ২০০৮)। সে জন্য প্রাক্কলন বা এস্টিমেশন প্রক্রিয়ায় সব স্থির বৈশিষ্ট্যই বিবেচনা করা হয়েছে এমনভাবে, যেখানে দেখা হয়েছে কীভাবে স্বাধীন চলকের ব্যক্তির মধ্যে যেসব পরিবর্তন আসে, তা অধীন চলকের ব্যক্তির মধ্যে যেসব পরিবর্তন আসে, তার সঙ্গে সম্পর্কিত। বর্তমান গবেষণায়, আমাদের আগ্রহের বিষয় বিলীন সীমানাবিষয়ক যুক্তিতে যেমনটা বলা হয়, যেমন অনলাইনে সামাজিক আন্তযোগাযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক আছে কি না, তা দেখা, যা ক্ল্যাসিক সামাজিকীকরণ (পরিবার ও বন্ধুবান্ধব) ও রাজনৈতিক প্রেরণাগত উপাদানের বাইরে। যেহেতু স্থির প্রভাববিষয়ক মডেল শুধু বাদ যাওয়া স্থির বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করে, তাই সময়গত ভিন্নতার উপাদানগুলো আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি, যা ব্যক্তির মধ্যে সময়ের আবর্তে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং কিশোর-কিশোরীদের পিতা-মাতা ও বন্ধুবান্ধবের রাজনৈতিক আগ্রহ।

ফলাফল

এই অধ্যায়ে তিনটি ধাপে আমরা গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করব। সেখানে উল্লিখিত সব অনুসিদ্ধান্ত বা হাইপোথিসিস নিয়ে আলোচনা করা হবে। তা করার আগে ১ নম্বর চিত্রে কিশোর-কিশোরীদের অনলাইনে কার্যক্রমগুলো একঝলক দেখার জন্য দেওয়া হয়েছে। সেটা করতে গিয়ে ২০১০ সালে করা প্রথম দফার প্যানেলে যেসব উত্তর এসেছে, তার ভিত্তিতে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমনটা দেখা যায়, অনলাইন কর্মকাণ্ডের মধ্যে সামাজিক আন্তযোগাযোগ সবচেয়ে বেশি ঘটে। বিস্ময়করভাবে বিরাটসংখ্যক উত্তরদাতা বলেছে যে তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলে (৯৫ শতাংশ), বন্ধুবান্ধবের সংস্পর্শে থাকে (৯২ শতাংশ) এবং নিজেদের সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করে (৮০ শতাংশ), অন্তত মাসে একবার। তবে পরিমাণের দিক থেকে এই সংখ্যার চেয়ে অনেক কম পাওয়া গেছে, যারা বলেছে যে তারা গত দুই মাসে অন্তত একবার অনলাইনে যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে

যুক্ত হয়েছে। সবচেয়ে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড হলো বন্ধুবান্ধবের কাছে খবরের লিংক পাঠানো (৪৮ শতাংশ) এবং ফেসবুকে কোনো একটি রাজনৈতিক গ্রুপে যোগ দেওয়া (৩৭ শতাংশ)। তবে সবচেয়ে কম পাওয়া যায় সামষ্টিক পদক্ষেপবিষয়ক কর্মকাণ্ড : কোনো প্রতিবাদ বা বয়কট আয়োজন করা (৭ শতাংশ)।

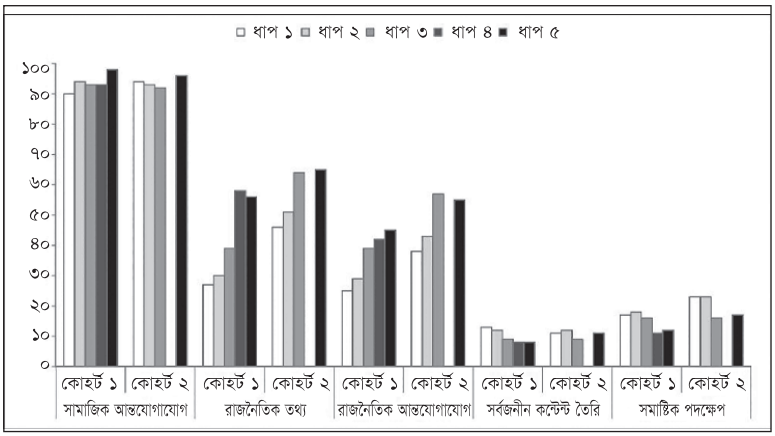

চিত্র ২ : অনলাইন কর্মকাণ্ডের পৌনঃপুনিকতা (%)

যেসব উত্তরদাতা অন্তত 'মাসে একবার' অন্তত দুটো কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে, তাদের পরিমাণ (সামাজিক কার্যক্রম); 'বিগত ২ মাসে কয়েকবার' একটি কার্যক্রম, বা 'বিগত ২ মাসে একবার' দুটো কার্যক্রমে যুক্তদের পরিমাণ (রাজনৈতিক কার্যক্রম)। *N* (সর্বনিম্ন) কোহর্ট ১= ৮৭৬ (ধাপ ১), ৮২২ (ধাপ ২), ৮১০ (ধাপ ৩), ৭০৮ (ধাপ ৪), ৬৭৮ (ধাপ ৫)' কোহর্ট ২= ৮৫২ (ধাপ ১), ৭৮০ (ধাপ ২), ৭৩৯ (ধাপ ৩), ৪৫৪ (ধাপ ৪)।

২ নম্বর চিত্রে যেসব কিশোর-কিশোরী সামাজিক আন্তযোগাযোগ এবং প্রতিটি অনলাইন রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ধরনের সঙ্গে যুক্ত, তার সংখ্যা দেখানো হয়েছে (হতে পারে গত দুই মাসে যেকোনো একটি কর্মকাণ্ড কয়েকবার করা অথবা গত দুই মাসে দুটি কর্মকাণ্ড অন্তত একবার করা)। চিত্রে দুটি দলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে, কারণ বয়সের প্রভাব স্পষ্ট। আরেকটি কারণ হলো আমরা পাঁচ দফায় প্যানেল জরিপ থেকে যেসব উপাত্ত নিয়েছি, সেগুলো কনিষ্ঠদের জন্য, বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য নয়। এখানে বেশ কয়েকটি ফলাফল উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, ২ নম্বর চিত্রে দেখা যায় যে দৈনন্দিন অনলাইন কর্মকাণ্ড হিসেবে সামাজিক আন্তযোগাযোগের গুরুত্ব রয়েছে। প্রায় প্রত্যেকেই সামাজিক আন্তযোগাযোগে সম্পৃক্ত এবং যদিও সময়ের আবর্তে কিছুটা বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু গবেষণার শুরু থেকেই এ ধরনটি স্পষ্ট ছিল। দ্বিতীয়ত, সবচেয়ে বেশি করা কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক তথ্য ও রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ। যেসব কিশোর-কিশোরী এসব

কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত তাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে অনেক বেড়ে যায়। এ ধারাটি দুই দলের ক্ষেত্রেই স্পষ্ট। ১ নম্বর দলের উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৭ শতাংশ বলেছে যে তারা ২০১০ সালে রাজনৈতিক তথ্য কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিল। চার বছর পর এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬ শতাংশ। একই বিষয় ২ নম্বর দলে ৪৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৫ শতাংশ হয়েছে। একই রকম ধারা দেখা গেছে রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে। তৃতীয়ত, একই চিত্রে দেখা যায় যে সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি ও সামষ্টিক পদক্ষেপ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা যথেষ্ট পরিমাণে কম। গত দুই মাসে সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বলে জানিয়েছে যারা, তাদের সংখ্যা ১৩ শতাংশের বেশি হবে না। তবে সামষ্টিক পদক্ষেপ বিষয়ে জড়িত থাকার সংখ্যা খানিকটা বেশি (দুটি দলেই সর্বোচ্চ সংখ্যা হলো ১৮ শতাংশ থেকে ২৩ শতাংশের মধ্যে)। এর বাইরেও রাজনৈতিক তথ্য ও রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ কর্মকাণ্ডের তুলনায় সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি ও সামষ্টিক পদক্ষেপ বিষয়ে সম্পৃক্ত থাকা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ার প্রবণতা পাওয়া যায়নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্পৃক্ত কিশোর-কিশোরীরা কি অনলাইন রাজনীতিতেও সম্পৃক্ত?

এতক্ষণ পর্যন্ত যা দেখা গেছে, তা থেকে বোঝা যায় যে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় অনলাইন কর্মকাণ্ড হলো সামাজিক আন্তযোগাযোগ। এ ছাড়া দেখা গেছে যে কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অন্যগুলোর চেয়ে বেশি জনপ্রিয়। তবে বিলীন সীমানা ও নড়বড়ে রক্ষণের ধারণা অনুযায়ী বলা হয় যে সামাজিক আন্তযোগাযোগ থেকে সহজেই রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা তৈরি হয়। বিলীন সীমানা বিষয়ে যুক্তির র‍্যাডিক্যাল প্রভাব অনুযায়ী ১ নম্বর অনুসিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে যেসব তরুণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে, তাদের বেশির ভাগই অনলাইন রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হবে। ১ নম্বর অনুসিদ্ধান্ত পরীক্ষা করতে ৩ নম্বর চিত্রে দেখানো হয়েছে যে যেসব তরুণ সামাজিকভাবে আন্তযোগাযোগপ্রবণ, তারা কী পরিমাণে অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিভিন্ন ধরনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এটা করা হয়েছে প্রথম দফার ক্রস সেকশনাল উপাত্তের ভিত্তিতে। সহজে বললে দাঁড়ায়, ১ নম্বর অনুসিদ্ধান্তের সমর্থনে সামাজিক আন্তযোগাযোগ ও রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার মধ্যে বহুলাংশে একটি একাকার পরিস্থিতি আমাদের প্রত্যাশা করা উচিত।

৩ নম্বর চিত্রের সবার ওপরের প্যানেলে দেখা যায় সামাজিক আন্তযোগাযোগ ও রাজনৈতিক তথ্য একাকার হয়ে গেছে। এসব ফলাফল থেকে দেখা যায় যে ১ নম্বর কোহর্ট বা দলের বেশির ভাগ (৬৬ শতাংশ) কিশোর-কিশোরী শুধু সামাজিকভাবে আন্তযোগাযোগপ্রবণ। আর খুব কমসংখ্যক (২৪ শতাংশ) দেখা যায় একই সঙ্গে

সামাজিকভাবে যেমন আন্তযোগাযোগপ্রবণ, তেমনি রাজনৈতিক তথ্যের উদ্দেশ্যে অনলাইন গণমাধ্যম ব্যবহার করে। ২ নম্বর দলের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সামাজিক আন্তযোগাযোগ ও রাজনৈতিক তথ্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একাকার অবস্থা বিরাজমান (৪৪ শতাংশ), যেখানে উত্তরদাতাদের প্রায় অর্ধেক সামাজিকভাবে আন্তযোগাযোগপ্রবণ (৪৯ শতাংশ)। তবে এটা প্রত্যাশিত যে 'শুধু সামাজিকভাবে আন্তযোগাযোগপ্রবণ' দলের আকার বেড়ে যায় যখন স্বল্পমাত্রায় করা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিবেচনায় নেওয়া হয়। যদি আমরা সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরির দিকে নজর দিই, তাহলে দেখা যায় প্রায় ৮০ শতাংশ কিশোর-কিশোরী শুধু সামাজিকভাবে আন্তযোগাযোগপ্রবণ। এই সংখ্যা আবার হয়ে যায় মাত্র ১১ থেকে ১২ শতাংশ, যখন সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরির সঙ্গে সামাজিক আন্তযোগাযোগ একত্র করা হয়। সামষ্টিক পদক্ষেপ বিষয়েও একই রকম ধাঁচ পাওয়া গেছে। এসব উপাত্ত থেকে তুলনামূলক স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে বিস্ময়করভাবে বেশির ভাগই অনলাইন গণমাধ্যম ব্যবহার করে সামাজিক আন্তযোগাযোগের জন্য। আর খুব কমসংখ্যক কিশোর-কিশোরী তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের সঙ্গে অনলাইনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মিশ্রণ ঘটায়। বিষয়টি সামষ্টিক পদক্ষেপ ও সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একদিকে রাজনৈতিক তথ্য ও আন্তযোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য আর অন্যদিকে সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি ও সামষ্টিক পদক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য আরও চমকপ্রদ হয়ে ওঠে, যদি সর্বশেষ প্যানেলের উপাত্ত ব্যবহার করে একই রকম বিশ্লেষণ করা হয়, অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীদের বয়স যখন আরেকটু বাড়ে, তখন (চিত্রে দেখানো হয়নি)। এই বিন্দুতে এসে দেখা যায় যে বেশির ভাগ (বা তার কাছাকাছি) উত্তরদাতা তাদের সামাজিক আন্তযোগাযোগের সঙ্গে রাজনৈতিক তথ্য ও আন্তযোগাযোগ সংমিশ্রণ করে থাকে। কিন্তু প্রথম দফার প্যানেল জরিপের তুলনায় সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি ও সামষ্টিক পদক্ষেপ দুটোই ধীরে ধীরে কম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে, ১ নম্বর অনুসিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট উপাত্ত পাওয়া যায়নি। তবে ২ নম্বর অনুসিদ্ধান্তের ব্যাপারে কিছু সমর্থন পাওয়া যায়। ২ নম্বর অনুসিদ্ধান্তের বিষয় হলো অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিভিন্ন ধরনের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে।

অনলাইনে ভাসা-ভাসা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা কি সবচেয়ে স্বাভাবিক ধরন?

ক্রস সেকশনাল উপাত্ত ব্যবহার করলে বিলীন সীমানা ও নড়বড়ে রক্ষণ ধারণার র‍্যাডিক্যাল প্রভাবের পক্ষে প্রমাণ তেমন বেশি নয়। বেশির ভাগ কিশোর-কিশোরী সামাজিক আন্তযোগাযোগে লিপ্ত হয়, কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে জড়িত হয় না। একই সঙ্গে যখন রাজনৈতিক তথ্য ও রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ কর্মকাণ্ডের কথা বিবেচনা করা হয়, তখন একাকার অবস্থা অনেক বেশি। তবে সর্বজনীন কন্টেন্ট

তৈরি ও সামষ্টিক পদক্ষেপ বিষয়ে একাকার অবস্থা তৈরি হওয়ার মাত্রা কম।

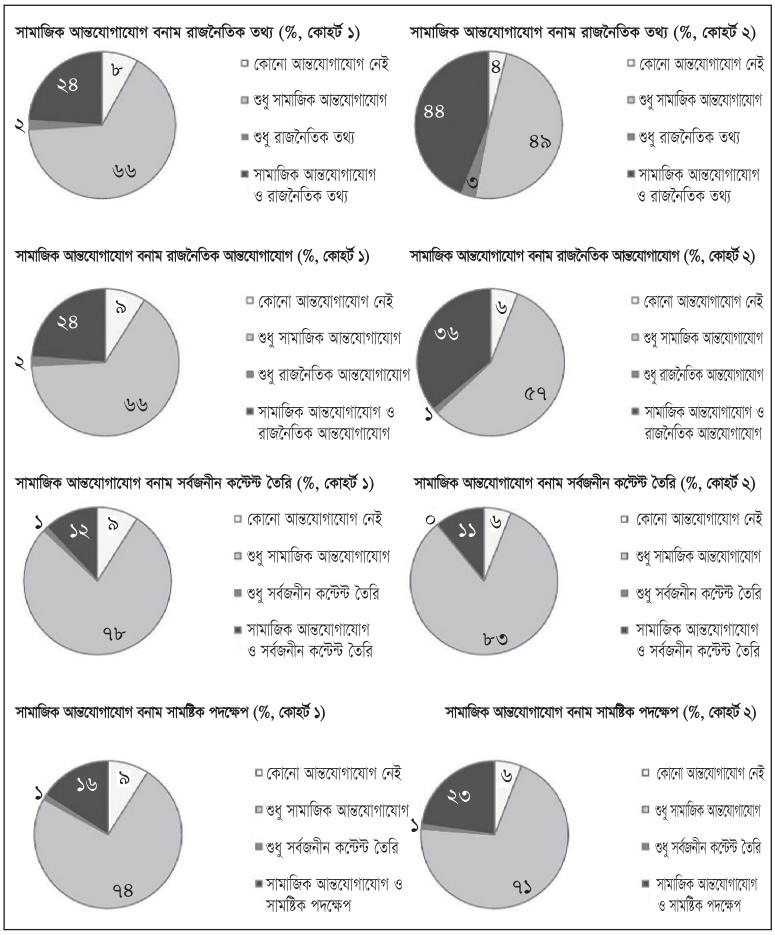

চিত্র ৩ : সামাজিক ও রাজনৈতিক অনলাইন কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ধরনের পৌনঃপুনিকতা (%)
অনলাইনে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে যুক্ত থাকা উত্তরদাতাদের পরিমাণ দেখানো হয়েছে চার্টে। এই চার্ট করা হয়েছে প্রথম দফার প্যানেল জরিপের উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে। N (সর্বনিম্ন)= ৮৬৪ (কোহর্ট ১) এবং ৮৪৮ (কোহর্ট ২)।

বিলীন সীমানা যুক্তির আরও পরিমিত ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে আমাদের তৃতীয় অনুসিদ্ধান্ত তৈরি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার একটি নির্দিষ্ট দীর্ঘমেয়াদি ধরন অনুসরণ করা হয়েছে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে দাঁড়ায়, ৩ নম্বর অনুসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধরে নেওয়া হয়েছিল যে

স্থায়ীভাবে যুক্ত বা বিযুক্ত থাকার তুলনায় সময়ের আবর্তে অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ভাসা-ভাসা ধরনই অনলাইনে সম্পৃক্ততার সবচেয়ে স্বাভাবিক ধরন।

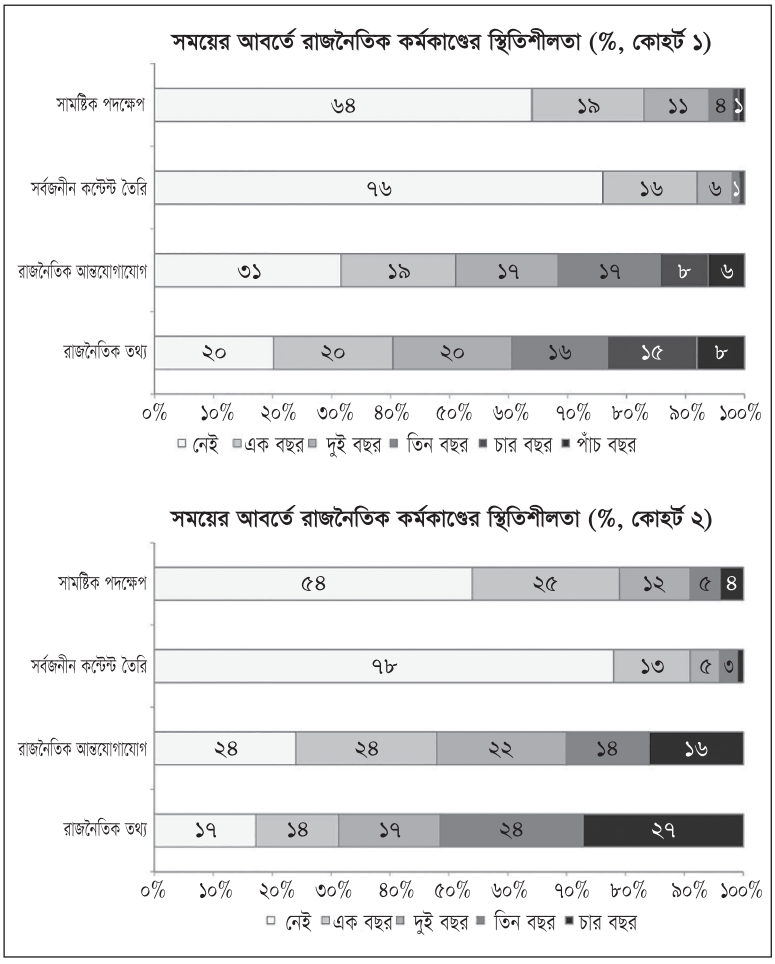

চিত্র ৪ : সময়ের আবর্তে অনলাইনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্থিতিশীলতা

পাঁচ দফায় করা জরিপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে ১ নম্বর কোহর্টের যেসব উত্তরদাতা বলেছে যে তারা অনলাইনে রাজনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত ছিল, তাদের পরিমাণ। N= ৪৪৩ (রাজনৈতিক তথ্য), ৪৩৬ (রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ), ৪২৯ (সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি), এবং ৪৩৮ (সামষ্টিক পদক্ষেপ)।

চার দফায় করা জরিপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ভিত্তিতে ২ নম্বর কোহর্টের যেসব উত্তরদাতা বলেছে যে তারা অনলাইনে রাজনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত ছিল, তাদের পরিমাণ। N= ২৭৪ (রাজনৈতিক তথ্য), ২৭৬ (রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ), ২৭২ (সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি), এবং ২৬৮ (সামষ্টিক পদক্ষেপ)।

এ বিষয়টি আমরা ৪ নম্বর চিত্রে আলোচনা করেছি। এখানে উপাত্তের প্যানেল উপাদান কাজে লাগানো হয়েছে। বারগুলোর মধ্যে তাকালে দেখা যাবে কিশোর-কিশোরীরা বছরের পর বছর কত সময় রাজনৈতিকভাবে যুক্ত থেকেছে বলে তারা জানিয়েছে। এখানে দুই পক্ষই দেখানো হয়েছে—যারা কখনোই কোনো কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিল না এবং যারা প্রতিটি প্যানেল জরিপেই জানিয়েছে যে তারা সক্রিয় ছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই বিশ্লেষণগুলোর ভিত্তি হলো সেসব উত্তরদাতা, যারা গবেষণার সব দফায় অংশ নিয়েছে। ১ নম্বর দলের সবচেয়ে বেশি করা কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে দেখা যায় ২০ শতাংশ কখনোই রাজনৈতিক তথ্য বিষয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করেনি, কিন্তু ৮ শতাংশ আবার প্রতিটি প্যানেল জরিপেই বলেছে যে তারা রাজনৈতিক তথ্যের উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করেছে। বেশির ভাগের (৭১ শতাংশ) ক্ষেত্রে দেখা গেছে সব বছর তারা সক্রিয় না থাকলেও কিছু বছর ছিল। এই ধাঁচ ২ নম্বর দলের কিশোর-কিশোরীদের জন্যও একই রকম। ৪ নম্বর চিত্রে তা দেখানো হয়েছে। সম্পৃক্ততার ধরন বিষয়ে ৪ নম্বর চিত্রে বেশ কিছু চমকপ্রদ ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রথমত, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার সবচেয়ে স্বাভাবিক ধরন হলো রাজনৈতিক তথ্য এবং বেশির ভাগ কিশোর-কিশোরী প্রতিনিয়ত তা করে থাকে। দ্বিতীয়ত, খুব কম কিশোর-কিশোরীই 'অবিরত যুক্ত' থাকে। বস্তুত খুবই কমসংখ্যক আছে, যারা দুই বছরের বেশি এই কাজে যুক্ত ছিল। তৃতীয়ত, কিছু কর্মকাণ্ড আছে, যেগুলো খুবই অনিয়মিত, বিশেষ করে সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি ও সামষ্টিক পদক্ষেপ। বেশির ভাগই কখনোই বা মাত্র একবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেছে এসব কাজে। যেমন ১ নম্বর দলের ৮৩ শতাংশ এবং ২ নম্বর দলের ৭৯ শতাংশ কিশোর-কিশোরী একবারের বেশি সামষ্টিক পদক্ষেপে যুক্ত হয়নি। সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে এই সংখ্যা আরও কম।

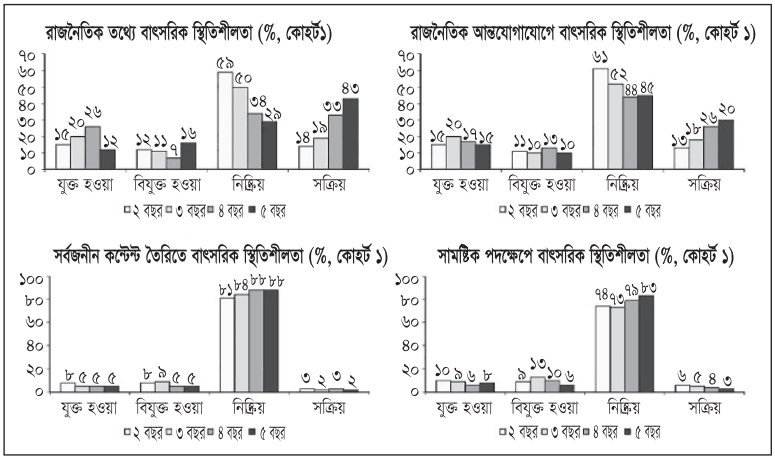

চিত্র ৫ : বিভিন্ন বছরের মধ্যে ভাসা-ভাসা ও স্থির থাকার পরিমাণ (%, কোহর্ট ১)

পাঁচটি প্যানেল দফার উপাত্তের ভিত্তিতে এক বছর থেকে পরের বছরে যেসব উত্তরদাতা অনলাইনে যুক্ত হয়েছে, আবার বিযুক্ত হয়েছে এবং সক্রিয় থেকেছে, অথবা নিষ্ক্রিয় থেকেছে, তাদের পরিমাণ। সর্বনিম্ন N= ৫৭৫ (রাজনৈতিক তথ্য), ৫৭২ (রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ), ৫৭৪ (সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি), এবং ৫৭৪ (সামষ্টিক পদক্ষেপ)।

টেবিল ২: চার ধরনের অনলাইন রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ওপর অনলাইন সামাজিক আন্তযোগাযোগের প্রভাব (দ্বিমুখী স্থির প্রভাবযুক্ত পয়সন [Poisson] মডেল থেকে নেওয়া হিসাব)

	রাজনৈতিক তথ্য	রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ	সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি	সামষ্টিক পদক্ষেপ
সামাজিক আন্তযোগাযোগ	.৩৬ (.২০)	.৮২*** (.২২)	.৯৬***(.৩৬)	১.৩৬***(.৩৩)
সময়ভিন্নতা নিয়ন্ত্রণ				
রাজনৈতিক আগ্রহ	১.৬১***(.২৫)	.৯৫***(.২৫)	.৮৪*(.৩৮)	১.১৩**(.৩৫)
রাজনৈতিক আগ্রহ (পিতা-মাতার)	.২০ (.২৯)	-.০৬ (.৩০)	-.৭৪ (.৪৭)	-.৫৭ (.৪৪)
রাজনৈতিক আগ্রহ (বন্ধুবান্ধবের)	.৪৫* (.২১)	.৪৯* (.২২)	.৬৭ (.৩৫)	.৩৯ (.৩১)
আর্থসামাজিক অবস্থা	-.৩০ (.৩৭)	-.১৮ (.৩৮)	-.১৮ (.৫৪)	-.৩৭ (.৫২)
সময় নিয়ন্ত্রণ				
দফা ২	.০৫ (.০৮)	.০৬ (.০৯)	-.০২ (.১৪)	-.০৬ (.১২)
দফা ৩	.৩২*** (.০৮)	.৪০*** (.০৯)	-.২৮ (.১৫)	-.২১ (.১৩)
দফা ৪	.৬৩*** (.১১)	.৩৮** (.১২)	-.৩৫ (.২১)	-.৪৬* (.২০)
দফা ৫	.৫১*** (.১১)	.৩৬** (.১২)	-.৬৪** (.২৩)	-.৬৯** (.২১)
লগ-সম্ভাব্যতা	-১১৪০.০৬৯	-৯৯৬.৩৭০০৯	-৩৮৮.৩৬৪৯৫	-৪৯১.৩২০২৬
N (ব্যক্তি/পর্যবেক্ষণ)	১৫০৮/৫১৭৩	১৫৫৬/৫৩২৪	৮২৯/২৮৮৯	১১০৭/৩৭৮৫

স্ট্যান্ডার্ড এররসহ আনস্ট্যান্ডার্ডাইজড বি-কোফিশিয়েন্ট রয়েছে ব্র্যাকেটে

*p<.০৫; **p<.০১; এবং p<.০০১

একই সঙ্গে ৪ নম্বর চিত্রে দেওয়া সংখ্যা দেখে বোঝার উপায় নেই কীভাবে কিশোর-কিশোরীরা ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিষয়ে অনলাইন কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয় বা বিযুক্ত হয়। ৫ নম্বর চিত্রে এই বিষয়ে সরাসরি বলা হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে কী পরিমাণ কিশোর-কিশোরী গবেষণার এক দফা থেকে আরেক দফায় যুক্ত হয় বা বিযুক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে যারা বিভিন্ন বছরে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় থেকেছে, তাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখানো হয়েছে। রাজনৈতিক তথ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দফার প্যানেল জরিপ অনুযায়ী ৫ নম্বর চিত্রে দেখানো হয়েছে যে ১ নম্বর দলের প্রায় ৩০ শতাংশ কিশোর-কিশোরী হয় যুক্ত থেকেছে বা বিযুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। মানে তারা স্থির থাকেনি। আবার ৭০ শতাংশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারা সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় থেকেছে। মানে স্থির থেকেছে। রাজনৈতিক

আন্তযোগাযোগের ক্ষেত্রেও এই সংখ্যা একই রকম। গড়ে ২৮ শতাংশ স্থির থাকেনি আর ৭২ শতাংশ স্থির থেকেছে। সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে প্রায় ১৩ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশ যুক্ত হয়েছে আবার বিযুক্ত হয়েছে, যেখানে ৮৮ শতাংশ থেকে ৮২ শতাংশ এক বছর থেকে পরের বছরে নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় থেকেছে (যদিও নিষ্ক্রিয় থাকার সংখ্যা খুবই বেশি)। যদিও ৫ নম্বর চিত্রে শুধু ১ নম্বর দলের উপাত্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সম্পৃক্ততার ধরনের ক্ষেত্রে ২ নম্বর দলের কিশোর-কিশোরীদের জন্য সংখ্যাটা একই রকম। এসব ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় ৩ নম্বর অনুসিদ্ধান্তের পক্ষেও তেমন বেশি প্রমাণ নেই। সময়ের আবর্তে বেশির ভাগের যুক্ত হওয়া থেকে বিযুক্ত হয়ে যাওয়ার চেয়ে অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে বেশির ভাগই ক্ষণস্থায়ীভাবে স্থির থাকে।

অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ওপর অনলাইনে সামাজিক আন্তযোগাযোগ প্রবণতার প্রভাব

সব শেষে বিলীন সীমানা যুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত আমাদের চতুর্থ অনুসিদ্ধান্ত পরীক্ষা করতে ২ নম্বর টেবিলে প্যানেল মডেলের দ্বিমুখী স্থির প্রভাবযুক্ত সিরিজের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। ৪ নম্বর অনুসিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ওপর সামাজিক আন্তযোগাযোগের একটি অনন্য প্রভাব রয়েছে। আগেও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে তাত্ত্বিক যুক্তি থেকে দেখা যায়, অনলাইনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার প্রতিটি ধরনের ওপরই সামাজিক আন্তযোগাযোগের একটি অনন্য প্রভাব রয়েছে, যা সামাজিকীকরণ ও প্রেরণাগত উপাদান থেকে মুক্ত। পুনরায় জোর দেওয়া প্রয়োজন যে এসব স্থির প্রভাবযুক্ত মডেলের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের মধ্যে পর্যবেক্ষণের বাইরে থাকা স্থিতিশীল বৈসাদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, যেখানে সময়ের আবর্তে শুধু ব্যক্তির মধ্যে ঘটা অভ্যন্তরীণ পার্থক্য দেখা হয়েছে। এর মাধ্যমে, অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার সঙ্গে সম্পর্কিত যেকোনো অপরিবর্তনীয় উপাদান এসব মডেলে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কয়েকটি রাজনৈতিক অনলাইন কর্মকাণ্ডে অতিরিক্ত সময়ের প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখতে সময়ের কৃত্রিম চলক তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক আগ্রহ, পিতা-মাতা ও বন্ধুবান্ধবের রাজনৈতিক আগ্রহ এবং আর্থসামাজিক অবস্থা আলাদাভাবে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আমরা সময়ের আবর্তে এসব চলকের ব্যক্তিপর্যায়ে যেসব পরিবর্তন আসে, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছি। আমাদের পরিমাপে সম্পূর্ণ পরিবর্তন কাজে লাগাতে আমাদের স্বাধীন চলক (সামাজিক আন্তযোগাযোগ) ও প্রতিটি অধীন চলকের (অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ধরন) মূল স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে। অধীন

চলকগুলোর বক্র বণ্টনের কারণে আমরা একটি পয়সন (Poisson) স্পেসিফিকেশন ব্যবহার করেছি। যেহেতু এসব মডেলের ভিত্তি হলো ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন, তাই যেসব উত্তরদাতা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়নি, তারা এমনিতেই বিশ্লেষণ থেকে বাদ পড়ে গেছে।

ফলাফল থেকে মৌলিক যুক্তির পক্ষে সামগ্রিকভাবে সমর্থন পাওয়া যায়। রাজনৈতিক তথ্যের ওপর অনলাইনে ঘন ঘন সামাজিক আন্তযোগাযোগের কোনো প্রভাব নেই ($b = 0.36, p > .05$)। তবে রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ ($b = 0.82, p < .001$), সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি ($b = 0.82, p < .001$) এবং সামষ্টিক পদক্ষেপের ($b = 1.36, p < .001$) ওপর বৈশিষ্ট্যসূচক প্রভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আগ্রহ, পিতা-মাতা ও বন্ধুবান্ধবের রাজনৈতিক আগ্রহ এবং আর্থসামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে সব ইউনিটের মধ্যকার স্থিতিশীল বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তির মধ্যে যেসব পরিবর্তন ঘটে, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ভিন্নভাবে বললে, গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণাগত উপাদান যা-ই হোক না কেন, যেসব কিশোর-কিশোরী অনলাইনে তাদের সামাজিক আন্তযোগাযোগ বাড়ায়, তাদের বেশ কিছু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশি থাকে। এসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সামষ্টিক পদক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত। ফলে উপাত্ত থেকে ৪ নম্বর অনুসিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়।

উপসংহার ও আলোচনা

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, তরুণদের অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে যেসব পূর্ববর্তী গবেষণা রয়েছে, সেখানে অবদান রাখা। বহু গবেষণায় অনলাইনে সক্রিয়তার গতিশীলতা দেখানো হয়েছে (বেনেট ও সেগেরবার্গ, ২০১২; কাভাডা, ২০১৫) এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপর অনলাইন গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব চিহ্নিত করা হয়েছে (বাওলিয়ান, ২০০৯, ২০১৫)। কিন্তু তরুণ নাগরিকদের অনলাইনে সম্পৃক্ততার প্রকৃত ধরন বিষয়ে বহু প্রশ্নই উত্তরহীন ছিল। আমাদের জানামতে, আমাদের এই গবেষণাই প্রথম বড় আকারে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা, যেখানে সামাজিক গণমাধ্যমে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততায় অনুমিত নড়বড়ে রক্ষণের প্রভাব খতিয়ে দেখা হয়েছে। বিভিন্ন অনলাইন কর্মকাণ্ডের ওপর সমৃদ্ধ উপাত্ত ও উচ্চমাত্রার ব্যতিক্রমী সাড়া প্রদানের হার থাকায় পাঁচ দফায় করা এই গবেষণার ফলে চারটি অনুসিদ্ধান্তের একটি জোরালো অনুসন্ধান সম্ভব হয়েছে।

প্রথমত, আমরা একটি র‍্যাডিক্যাল অনুসিদ্ধান্ত নিয়েছি (হাইপোথিসিস ১)। সেখানে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে বেশির ভাগের জন্য অনলাইন গণমাধ্যমে সামাজিক আন্তযোগাযোগ করা এবং চার ধরনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততায়

মাঝেমধ্যে যুক্ত হওয়া একই সঙ্গে ঘটে। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছে আরেকটু পরিমিত। সেখানে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ১ নম্বর অনুসিদ্ধান্তটি শুধু কম খরচের যেসব সম্পৃক্ততার ধরন রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে শুধু প্রযোজ্য। ১ নম্বর অনুসিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হলেও ২ নম্বর অনুসিদ্ধান্তের পক্ষে গবেষণালব্ধ প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং সময়ের আবর্তে সম্পৃক্ততার ধরনভেদে পার্থক্যগুলো আরও বেশি স্পষ্ট হয়েছে। এই গবেষণায় স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে রাজনীতিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে যেসব রক্ষণ থাকে, সেগুলো সম্পৃক্ততার ধরনভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। সহজে বললে, প্রায় প্রত্যেক কিশোর-কিশোরী সামাজিক আন্তযোগাযোগের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে থাকে। মোটামুটি একটি বড় ও ক্রমবর্ধমানসংখ্যক কিশোর-কিশোরীর জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার এবং রাজনৈতিক তথ্য (পড়া, দেখা ও খোঁজা) এবং রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ (আলোচনা করা, মন্তব্য করা ও ছড়িয়ে দেওয়া) একই সঙ্গে ঘটে। তবে খুব কমসংখ্যক কিশোর-কিশোরী তাদের সামাজিক আন্তযোগাযোগের সঙ্গে সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি (লেখা, ভিডিও ক্লিপ তৈরি করা ইত্যাদি) ও সামষ্টিক পদক্ষেপের (গ্রুপে, প্রতিবাদে এবং বয়কটে যোগ দেওয়া বা সংগঠিত করা) সংমিশ্রণ ঘটায়। সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি ও সামষ্টিক পদক্ষেপ বিষয়ে কর্মকাণ্ড সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা হারায়। বিষয়টি বেশ চমকপ্রদ, কারণ একই সময়ে আবার সাধারণ রাজনৈতিক আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, যা তাদের রাজনৈতিক তথ্য ও রাজনৈতিক আন্তযোগাযোগ কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এসব প্রবণতার পেছনের কারণ বিশ্লেষণের জন্য ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তবে এসব অগ্রগতি থেকে দেখা যায় কীভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংহতি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনসমক্ষে ব্যক্তিগত পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছাও একই সঙ্গে বাড়ছে (একস্ট্রম, ২০১৬)।

আমাদের দীর্ঘমেয়াদি উপাত্তের কারণে তৃতীয় অনুসিদ্ধান্তের একটি অনন্য অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হয়েছে। সেখানে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিলীন সীমানা ও নড়বড়ে রক্ষণের কারণে ধীরে ধীরে ভাসা-ভাসা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার ধরন তৈরি হয়। যদিও ৩ নম্বর অনুসিদ্ধান্তের পক্ষে সাধারণ সমর্থন মেলেনি, তবে বিভিন্ন সম্পৃক্ততার ধরনগুলোর মধ্যে যেসব পার্থক্য রয়েছে, সেগুলো এসব বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রায় ৩০ শতাংশ কিশোর-কিশোরী রাজনৈতিক তথ্য ও আন্তযোগাযোগ কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে আবার বিযুক্ত হয়ে পড়ে। তবে সর্বজনীন কন্টেন্ট তৈরি ও সামষ্টিক পদক্ষেপের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ২০ শতাংশ।

তবে আমাদের ৪ নম্বর অনুসিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ধরনের অনলাইন সম্পৃক্ততার ওপর অনলাইনের সামাজিক আন্তযোগাযোগের

গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানগত প্রভাব আমরা পেয়েছি। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আগ্রহ ও সামাজিকীকরণ উপাদানে ব্যক্তি পর্যায়ে যেসব পরিবর্তন ঘটে এবং ব্যক্তি পর্যায়ের স্থিতিশীল বৈশিষ্ট্য আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি। এর ফলে বোঝা যায় যে রাজনীতিতে নড়বড়ে বা দুর্বল রক্ষণ থাকায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নিয়মিত ব্যবহারকারীরা রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের আগ্রহের হিসাব-নিকাশের বাইরে গিয়ে যুক্ত হয়ে পড়ে। সবকিছু মিলিয়ে বলা যায়, এসব ফলাফল থেকে স্পষ্টত ধরা পড়ে যে বিলীন সীমানা যুক্তির পেছনে যেসব পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলো ব্যক্তি পর্যায়ে কাজ করলেও কিশোর-কিশোরীদের বড় কোনো গ্রুপকে রাজনৈতিকভাকে সক্রিয় নাগরিক বানাতে পারে না।

তবে তরুণ যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনীতি বিষয়ে পড়া, শেয়ার করা, মন্তব্য করায় বেশি যুক্ত হয় এবং কোনো কিছু লেখা বা ভিডিও ক্লিপ বানানো ও প্রকাশ করা, পিটিশন স্বাক্ষর করা এবং সামষ্টিক প্রতিবাদে কম যুক্ত হয়—এই ফলাফল সম্ভবত আশ্চর্যজনক নয়। মতামত ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা জনসমক্ষে ব্যক্ত করার দিকটি বিবেচনা করলে এর উল্টোটা করাই সহজ এবং কম খরচে ও অবধারিত বলে মনে হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অরাজনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে কম খরচের সম্পৃক্ততা ও বিলীন সীমানার সাধারণ ধারণার বিষয়টি বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়ই আলোচিত হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রতিবাদ ও সক্রিয়তাও রয়েছে। আমরা তাত্ত্বিকভাবে গোছানো একটি শ্রেণিবিভাজন তৈরি করে তা প্রয়োগ করেছি, যা থেকে অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার পৌনঃপুনিকতা ও ধরনগুলোর মধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে রাজনীতিতে বিভিন্ন ধরনের সীমানা নির্দেশিত হয়েছে। এখন ভবিষ্যৎ গবেষণার চ্যালেঞ্জ হলো এসব সীমানা এবং সীমানা অতিক্রম করা বিষয়ে আরও বিস্তর গবেষণা করা।

ডিজিটাল মিডিয়ায় রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার চলমান রূপান্তরের ক্ষেত্রে সক্রিয়তার নমনীয় কম খরচে সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত (বেনেট ও সেগেরবার্গ, ২০১২; ডেনিক ও লেইস্টার্ট, ২০১৫; আর্ল ও কিম্পোর্ট, ২০১১)। তবে আমাদের গবেষণায় স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে এসব কর্মকাণ্ডে কেবল অল্প কিছু কিশোর-কিশোরী যুক্ত হয়। এই ধরনের বৈসাদৃশ্য কীভাবে বোঝা যাবে? নিশ্চিত হতে বলা যায়, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে অনলাইনে প্রচারণা ও প্রতিবাদে বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ডিজিটাল নেটওয়ার্ক মিডিয়া অবদান রাখে। খুব সম্ভবত, এসব আপাত-বিপরীত চিত্রের সঙ্গে গবেষণার মাধ্যম ও উপাত্ত পার্থক্যের সম্পর্ক রয়েছে। আগের বেশির ভাগ গবেষণায় প্রতিবাদ

আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের গতিশীলতা ও সমষ্টির ওপর জোর দিয়েছে। কিন্তু আমাদের গবেষণায় জরিপের উপাত্ত ব্যবহার করে তরুণদের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। গবেষণাপদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকেই যে শুধু এটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নয়। এ ছাড়া সমাজে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার মাত্রা ও বণ্টনের কথা চিন্তা করলে অনলাইন মিডিয়ার গণতান্ত্রিক প্রভাব মূল্যায়ন করলেও এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের উপসংহার বিষয়ে একটি যৌক্তিক আপত্তি হতে পারে এই যে এই গবেষণায় নড়বড়ে রক্ষণ ধারণার প্রভাব বোঝা সম্ভব হয়নি। কারণ, 'রাজনৈতিক' শব্দটি সম্পর্কে তরুণদের সম্ভবত একটি রক্ষণশীল ধারণা আছে, যা জরিপে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাদের কম উত্তর থেকে বোঝা যায়। সে জন্যই নাগরিকেরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন গ্রুপে যোগ দিয়ে প্রায়ই সীমানা অতিক্রম করতে পারে। তার মানে এই নয় যে তারা এটাকে রাজনীতিতে পা ফেলা হিসেবে বিবেচনা করছে। এর মানে হলো, উত্তরদাতারা যে তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাকে কিছুটা খাটো করে দেখে থাকে, সেই সম্ভাবনা আমরা বাতিল করে দিতে পারি না। অন্যদিকে আমাদের জরিপের কিছু প্রশ্ন ছিল রাজনীতি ও সামাজিক বিষয় নিয়ে। আবার সামষ্টিক পদক্ষেপ পরিমাপের জন্য যেসব আইটেম ব্যবহার করা হয়েছে, সেখানে কোনোভাবেই 'রাজনীতি' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি (বলা হয়েছে প্রতিবাদ, বয়কট, সামাজিক বিষয় ইত্যাদি)।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে রাজনীতিতে এক পা ফেলার বিষয়টি শর্তসাপেক্ষ এবং সামাজিক ও অনলাইন গণমাধ্যমেও সীমানার গঠন অব্যাহত থাকে (সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত)। তবে ঘটনাবশত নিজেকে প্রকাশ করা, ব্যক্তিগত বিষয় থেকে সর্বজনীন বিষয়ে হঠাৎ রূপান্তর ঘটা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কম খরচে সম্পৃক্ততার বিষয়গুলোর গুরুত্বকে প্রশ্ন করার জন্য তা করা হয় না। তবে বিভিন্ন সামাজিক পটভূমি, অভ্যাস, প্রেরণা ও পরিচয়সম্পন্ন নাগরিকদের জন্য বিষয়টির মানে কী দাঁড়ায়, তা অনুসন্ধান করতে হবে।

বিশেষ করে তরুণদের সম্পর্কে যেমনটি বলা হয় যে ক্রমহ্রাসমান রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে ব্যাপক আকারে উদ্বেগ থাকাটা অতিরঞ্জিত। কারণ, এ ক্ষেত্রে শুধু প্রথাগত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ওপরই নজর দেওয়া হয়। কিন্তু যদি অংশগ্রহণের সাম্প্রতিক রূপ বিবেচনায় নেওয়া হয়, যেখানে অনলাইনের সক্রিয়তা ও প্রতিবাদ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তাহলে আরও আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যাবে বলে ধরে নেওয়া হয় (ডাল্টন, ২০০৯; লোডার, ২০০৭; শকুন্তলা ও বাকিংহাম, ২০১৩)। এই গবেষণা থেকে এমন ধারণা হতে পারে যে তরুণদের বিরাট একটি অংশ বৈশ্বিক প্রতিবাদ আন্দোলন বা স্থানীয় ফেসবুক

উদ্যোগে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয়। এই গবেষণায় দেখা যায় যে ব্যাপারটি আসলে সে রকম নয়।

এই গবেষণায় যেসব ধারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তা কী পরিমাণে সুইডেনের বাইরে প্রযোজ্য বলে আমরা ধরে নিতে পারি? এই প্রশ্নের স্পষ্ট জবাবের জন্য আন্তসাংস্কৃতিক উপাত্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান ও বাস্তব পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে তরুণদের অনলাইনে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন সুইডেনে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে এ রকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে সুইডেন অদ্বিতীয় কোনো দেশ, যার সঙ্গে এই অঞ্চলের বা ইউরোপের আর কোনো দেশের মিল থাকবে না। এটাও ভাবার কোনো কারণ নেই যে বিলীন সীমানার পদ্ধতি অন্যান্য জায়গায় ভিন্ন হবে।

তথ্যসূত্র

Allison P (2009) *Fixed Effects Regression*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Bennett L (2012) 'The personalization of politics: political identity, social media, and changing patterns of participation'. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 644: 30–38.

Bennett L and Segerberg A (2012) 'The logic of connective action: digital media and the personalization of contentious politics'. *Information, Communication & Society* 5: 739–768.

Bimber B, Flanagin A and Stohl C (2012) *Collective Action in Organizations: Interaction and Engagement in an Era of Technological Change*. New York: Cambridge University Press.

Boulianne S (2009) 'Does Internet use affect engagement? A meta-analysis of research'. *Political Communication* 26: 193–211.

Boulianne S (2015) 'Social media use and participation: a meta-analysis of current research'. *Information, Communication & Society* 18: 524–538.

Brundidge J (2010a) 'Encountering "difference" in the contemporary public sphere: the contribution on the Internet to the heterogeneity of political discussion networks'. *Journal of Communication* 60: 680–700.

Brundidge J (2010b) 'Toward a theory of citizen interface with political discussions and news in the contemporary public sphere'. *International Journal of Communication* 4: 1056–1078.

Carlisle J and Patton R (2013) 'Is social media changing how we understand political engagement? An analysis of Facebook and the 2008 presidential election'. *Political Research Quarterly* 66: 883–895.

Couldry N, Livingstone S and Markham T (2007) *Media consumption and public engagement*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Dalton R (2009) *The Good Citizen: How a Younger Generation Is Reshaping American Politics*. Washington, DC: QC Press.

Dencik L and Leistert O (2015) *Critical Perspectives on Social Media and Protest*. London: Rowman & Littlefield International.

Earl J (2014) Something old and something new: a comment on 'new media, new civics.' *Policy & Internet* 6: 169–175.

Earl J and Kimport K (2011) *Digitally Enabled Social Change: Activism in the Internet Age*. Cambridge, MA: MIT Press.

Ekström M (2016) 'Young people's everyday political talk: A social achievement of democratic engagement'. *Journal of Youth Studies* 19: 1–19.

Ekström M, Olsson T and Shehata A (2014) 'Spaces for public orientation: Longitudinal effects of Internet use in adolescence information'. *Communication and Society* 17: 168–183.

Ekström M and Östman J (2015) 'Information, interaction and creative production: The effects of three forms of internet use on youth democratic engagement'. *Communication Research* 42: 796–818.

Finkel S (2008) 'Linear panel analysis'. In: Menard S (ed.) *Handbook of Longitudinal Research: Design Measurement and Analysis*. Burlington, MA: Academic Press, pp. 475–504.

Halupka M (2014) 'Clicktivism: a systematic heuristic'. *Policy & Internet* 6: 115–132.

Hooghe M (2014) 'Defining political participation: how to pinpoint an elusive target?' *Acta Politica* 49: 338–341.

Jenkins H (2006) *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press.

Kavada A (2015) 'Creating the collective: social media, the occupy movement and its constitution as a collective actor'. *Information, Communication & Technology* 18: 872–886.

Kim Y, Hsu S, Gil De and Zuniga H (2013) 'Influence of social media use on discussion network heterogeneity and civic engagement: the moderating role of personality traits'. *Journal of Communication* 63: 498–516.

Kim Y, Russon S and Amnå E (2016) 'The longitudinal relation between online and offline political participation among youth at two different developmental stages'. *New Media & Society*. Epub ahead of print 4 March. DOI: 10.1177/1461444815624181.

Kruikemeier S, Van Noort G, Vliegenthart R, et al. (2014) 'Unraveling the effects of active and passive forms of political Internet use: does it affect citizens' political involvement?' *New Media & Society* 16: 903–920.

Loader B (ed.) (2007) *Young Citizens in the Digital Age: Political Engagement, Young People and New Media*. London: Routledge.

Norris P (2001) *Digital Divide? Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide*. Cambridge: Polity Press.

Papacharissi Z (2010) *A Private Sphere: Democracy in a Digital Age*. Malden, MA: Polity Press.

Schlozman K, Verba S and Brady H (2010) 'Weapon of the strong? Participatory inequality and the internet'. *Perspectives on Politics* 8: 487–509.

Shah D, Kwak N and Holbert L (2001) 'Connecting and disconnecting with civic life: patterns of Internet use and the production of social capital'. *Political Communication* 18: 141–162.

Shakuntala B and Buckingham D (2013) The Civic Web. Cambridge, MA: MIT Press.

Theocharis Y (2015) 'The conceptualization of digitally networked participation'. *Social Media + Society*. Epub ahead of print 20 October. DOI: 10.1177/2056305115610140.

Van Deth J (2014) 'A conceptual map of political participation'. *Acta Politica* 49: 349–367.

Velasquez A and LaRose R (2014) 'Youth collective activism through social media: the role of collective efficacy'. *New Media & Society*. Epub ahead of print 7 January. DOI: 10.1177/1461444813518391.

Vissers S and Stolle D (2014) The Internet and new modes of political participation. Information, Communication & Society 17: 937–955.

Xenos M, Vromen A and Loader B (2014) 'The great equalizer? Patterns of social media use and youth political engagement in three advanced democracies'. *Information, Communication & Society* 17: 151–167.

মার্ক্সের মানবসত্তা : এরিখ ফ্রমের পর্যালোচনা ও আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

সারসংক্ষেপ

কার্ল মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩) দুই শ বছর আগে জন্মেছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি পৃথিবীতে যতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব তিনি রাখতে পেরেছেন মৃত্যুর পর। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সংঘটিত না হলে মার্ক্সের প্রভাব পৃথিবীতে এত জোরালোভাবে পড়ত না। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর অনেকেই রুশ দেশীয় মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে এই প্রশ্ন সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতনের আগেই যাঁরা তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ফ্রাঙ্কফুর্ট বিদ্যানিকেতনের এরিখ ফ্রম (১৯০০-১৯৮০)। ফ্রম বলার চেষ্টা করেছেন যে প্রথম থেকেই মার্ক্সের তত্ত্বকে ভুলভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর কারণ, মার্ক্সের লেখার ব্যাপ্তি এবং তা সহজবোধ্য না হওয়া। অনেকেই পর্যাপ্ত পড়াশোনা না করেই মার্ক্সকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আবার রুশ ও চৈনিক বিপ্লবের কালে মার্ক্সের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা অনূদিত হয়নি। ফলে মার্ক্স মানুষ সম্পর্কে কী বুঝতেন, এই গোড়ার প্রশ্নের বিশ্লেষণেই রয়ে গেছে গলদ। মানুষ কি শুধুই তার আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পুনরুৎপাদনের ফল, নাকি তার পরিসর আরও ব্যাপক? এ নিয়ে এরিখ ফ্রম বিশদ আলোচনা করেছেন। মানুষ যদি শুধুই তার আর্থ-ভোগবাদী বস্তুবাদকে কায়েমের লক্ষ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত না করে, তবে তো বস্তুবাদের ধারণাকল্পে মার্ক্স যে পথে অগ্রসর হয়েছেন, প্রচলিত রুশ ও চৈনিক সমাজবাদী ব্যাখ্যা তা বুঝতে অক্ষম। এরিখ ফ্রমের মতে, এই ব্যাখ্যা বুর্জোয়া বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, যা মার্ক্স কখনো বস্তুবাদের ব্যাখ্যায় বোঝাননি। ফলে পণ্য-মানবের (commodity man) যে ধারণা বর্তমান মার্ক্সবাদী দুনিয়ায় চালু আছে, ফ্রম তা খারিজ করেছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের চূড়ান্ত সম্ভাবনাগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে মার্ক্স মানুষের যে পরিণামের কথা বলেছেন এবং তার বিচ্ছিন্নতার (alienation) পরিসমাপ্তি টানতে চেয়েছেন, তাতে মানুষের এক অস্তিত্ববাদী সত্তার ধারণাই মার্ক্স প্রতিষ্ঠা করেছেন। মার্ক্স নিজে এতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এক মসিহ আকারে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মানবসত্তা সম্পর্কে এরিখ ফ্রমের মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে অপরাপর বিশ্লেষণের সঙ্গে এরিখ ফ্রমের

চিন্তার তুলনাও করা হয়েছে। এরিখ ফ্রমের বক্তব্যের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মার্ক্সের মূল জার্মান লেখাগুলোকেও খতিয়ে দেখা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

আর্থ-ভোগবাদী বস্তুবাদ, পণ্য-মানব, মানুষের সামগ্রিক বিকাশ, বিচ্ছিন্নতা, রক্ষণশীল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, মানুষের আত্মিক মুক্তি, বুর্জোয়া বস্তুবাদ, প্রকৃতিবাদ, সর্বাধিক অর্থনৈতিক অর্জন, মিথ্যা সচেতনতা, আত্মসৃজন, মানুষের অস্তিত্ব ও সারবত্তা, মানবতার সারবত্তা।

এক.

শ্রেণিহীন সমাজে আদর্শবাদ হচ্ছে পারস্পরিক আদান-প্রদানের পরিসর। এর মধ্য দিয়ে এমন পরিস্থিতি অর্জিত হয়, যার ফলে মানুষ তার অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের কারণে সব মানুষের আনুকূল্যের বিকাশ ঘটিয়েই বাঁচে। (লুই আলথুসার, ১৯১৮-১৯৯০)

এরিখ ফ্রমের সবচেয়ে বহুল পঠিত বই সম্ভবত *মানুষ সম্পর্কে মার্ক্সের ধারণা* (*Marx's Concept of Man*)। ফলে এই বই দিয়ে আমরা এরিখ ফ্রমের চিন্তার বিশ্লেষণ শুরু করব। বইয়ের শুরুতেই এরিখ ফ্রম পরিষ্কার করেছেন যে মার্ক্স ছিলেন একাধারে অস্তিত্ববাদী (existentialist) ও মানবতাবাদী (humanist); যে কারণে মানুষ তার সার্বিক মানবতার ও মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করার সঙ্গে সঙ্গে তার সার্বিক সৃজনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। আর যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল মূলত রক্ষণশীল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, ফলে সেটি মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র ছিল না। একাধারে গণচীনেও মানুষের সার্বিক মুক্তির সম্ভাবনা খর্বিত; ফলে ফ্রমের চোখে চীনের সমাজতন্ত্রও খর্বিত সমাজতন্ত্র। ফ্রমের মতে যেহেতু মার্ক্স ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশে বিশ্বাসী এবং প্রচলিত ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার মতো না হলেও মার্ক্স মানুষের একধরনের আত্মিক মুক্তির কথা বলেছেন, তাই উভয় সমাজতন্ত্রই আর যা-ই হোক, মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্র নয়। গণচীন ও ভূতপূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারের লক্ষ্য ছিল মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আর মার্ক্সের চোখে অর্থনৈতিক মুক্তি মানুষের সার্বিক মুক্তির একটি ধাপ মাত্র। অর্থনৈতিক মুক্তি মানুষের বিচ্ছিন্নতার সমাপ্তি ঘটাবে এবং মানুষ ক্রমাগত তার সৃজনশীলতার পূর্ণত্বের দিকে এগিয়ে যাবে। এই হলো মার্ক্সীয় চিন্তার গতিপ্রবাহ আর এ ঘটনা ঘটবে প্রত্যেক ব্যক্তির মুক্তির মধ্য দিয়ে। মার্ক্সের বয়ানের ভঙ্গি ধর্মনিরপেক্ষ ও নিরিশ্বরবাদী, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জন্য এক পয়গম্বরি মসিহত্বের আভাস তাতে বিদ্যমান। মানবিক ও মানবতাবাদী এই মসিহত্বের পয়গামের অনুপস্থিতির কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত আর্থ-ভোগবাদী বস্তুবাদকে আশ্রয় করেছে, যা মার্ক্সের কখনো কাম্য ছিল না।

দুই.

মার্ক্সের বস্তুবাদ ও মানবতাবাদ বুঝতে গেলে যে প্রশ্ন প্রথমে মাথায় আসে, তা হলো, বস্তুবাদের সঙ্গে মানবতাবাদকে একসঙ্গে পাঠ করা কি সম্ভব? কারণ, বস্তুবাদে জগৎমাত্রই বস্তুঘটিত ক্রিয়াকর্মের ফল আর মানবতাবাদে রয়েছে মানুষকেন্দ্রিক জগৎ। সেখানে ব্যক্তি কি স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীনকর্মের কর্তা? বলে রাখা ভালো, মার্ক্স কখনোই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ—এই পদগুলো ব্যবহার করেননি। তবে মার্ক্স তাঁর দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন, যা হেগেলীয় বস্তুবাদী ভিত্তির সমান্তরাল নয়। এ বিষয়ে এরিখ ফ্রম মার্ক্স ও এঙ্গেলস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'হেগেলের (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ১৭৭০-১৮৩১) ইতিহাস-দর্শন আদতে আত্মা ও বস্তুর পার্থক্য বিচারে খ্রিষ্টীয়-জার্মান মতাদর্শগত দার্শনিক প্রকাশের অধিক কিছু নয়। হেগেলের ইতিহাস দর্শন প্রথমেই এক বিমূর্ত অথবা চূড়ান্ত আত্মাকে ধারণা করে নেয়, আর তার বিকাশ ক্রমাগত মানবজাতিতে বহুব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এভাবে যে ওই আত্মাকে তারা ধারণ করে সচেতন কিংবা অচেতনভাবে। হেগেলের অনুমান এই যে চিন্তাশীল ও গূঢ় ইতিহাস অভিজ্ঞতালব্ধ ইতিহাসের আগেই অবস্থান করে। ফলে মানবেতিহাস মানুষের বিমূর্ত আত্মার ইতিহাসে রূপান্তরিত হয়। আর পরিণতিতে সে প্রকৃত মানুষকে অতিক্রম করে' (পবিত্র পরিবার)। ফলে হেগেল মানবতাবাদী কিংবা অস্তিত্ববাদী নন, অন্তত মার্ক্সের এই ব্যাখ্যার পর। মার্ক্সের মতে, এই সমস্যা শুধুই হেগেলের নয়, পুরো জার্মান দর্শনের একটা অংশের। খ্রিষ্টধর্মের বয়ান-আশ্রিত এই দর্শনচর্চাকে তিনি খারিজ করেছেন নিম্নোক্ত বিবৃতিতে, 'জার্মান দর্শনের সঙ্গে আমাদের বিরোধিতার জায়গা ওইখানে যে তারা স্বর্গ থেকে মর্তে অবতরণ করেছে, আর আমরা মর্ত থেকে স্বর্গে উঠি। আমাদের যাত্রা কখনোই মানুষের ধারণা, অনুমান বা ওই ব্যাখ্যাপ্রসূত নয়, যেভাবে রক্তমাংসের মানুষকে বোঝার জন্য ধারণা ও অনুমানের আশ্রয় করা হয়েছে। আমরা যাত্রা শুরু করি প্রকৃত ও সচল মানুষ থেকে এবং তাদের প্রকৃত জীবনপ্রবাহ থেকে। আমরা তাদের সেই দার্শনিক প্রতিচ্ছবির প্রতিধ্বনি থেকে তাদের চলমান করি, যা ওই জীবনপ্রবাহ থেকেই উৎসারিত' (*জার্মান ভাবাদর্শ*, পৃ : ১৪)।

ফলে এরিখ ফ্রমের মতে, মার্ক্সীয় তত্ত্বে কট্টর বস্তুবাদের প্রতি অনাগ্রহ থাকলেও অন্তত সত্তাতাত্ত্বিক (ontology) জায়গায় মার্ক্স বস্তুবাদী। মার্ক্স বুর্জোয়া বস্তুবাদী নন, হেগেলের আদর্শবাদের ছোঁয়া তাঁর মধ্যে আছে। মার্ক্স আবার পুরোদস্তুর আদর্শবাদীও নন, তিনি বস্তুবাদকে সর্বাংশে খারিজও করেননি। আদর্শবাদ ও বস্তুবাদের সংশ্লেষে এরিখ ফ্রমের ভাষায়, মার্ক্স মানবতাবাদী (humanist) এবং প্রকৃতিবাদী (naturalist)।

তিন

মার্ক্স বস্তুবাদকে খারিজ করেন এই প্রশ্নে যে সর্বাধিক অর্থনৈতিক অর্জন যদি ব্যক্তির সার্বক্ষণিক তাড়না হয়, তবে মানুষের চূড়ান্ত মুক্তি সম্ভব নয়। অবশ্য পুরোদস্তুর বস্তুবাদকে গ্রহণ না করার পেছনে মার্ক্সের দার্শনিক অবস্থান মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। *পুঁজি* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মার্ক্স তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করেছেন এভাবে যে ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজেই নিজের জন্মদাতা। আর এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই তার এই স্বয়ম্ভূ অবস্থান। ইতিহাসের সূচনাতে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে অন্ধ বন্ধনে আবদ্ধ বা শৃঙ্খলিত ছিল। বিবর্তনপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের রূপান্তর ঘটায়, আর সেই সঙ্গে তার নিজেরও রূপান্তর সাধন করে। মার্ক্সের ভাষায়, 'যেভাবে ভিকো (Giambattista Vico, ১৬৬৮-১৭৪৪) বলেছেন যে মানবেতিহাস আর প্রকৃতির ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, আমরা প্রথমটি সৃষ্টি করেছি, পরেরটি নয়। আর এভাবেই কি ইতিহাস সংরক্ষণ সহজ নয়?' (*পুঁজি*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪০৬)। ফলে এ জায়গা থেকেও আমরা বলতে পারি যে মার্ক্স অস্তিত্ববাদী ও মানবতাবাদী। তবে মার্ক্সের মতে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের প্রধান নিয়ামক হচ্ছে শ্রম। এই শ্রমই মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নিরূপণে ও বিপাকে (metabolism) মূল ভূমিকা পালন করে। আর এই বিপাকে মানুষ নিজেও বিবর্তিত হয়। তবে প্রকৃতির অবস্থান যেহেতু মানুষের আগে, ফলে ইতিহাসের শুরুতে প্রকৃতিই মানুষের সচেতনতার অর্গল উন্মুক্ত করেছিল। এ কথা মার্ক্স মান্য করেছেন, 'It is not the consciousness of men that determines their social being, but on the contrary, their social being that determines their consciousness' (*A Contribution to the Critique of Political Economy*, ১৮৫৯)। আর এ কথা বলার কারণ হচ্ছে ভাব (ideas), ধারণা (conceptions) এবং সচেতনতার (consciousness) জন্ম সরাসরি মানুষের বস্তুবাদী কর্ম এবং তার বস্তুবাদী সংশ্লেষের সঙ্গে সম্পৃক্তির মধ্য দিয়ে—আর এ-ই হচ্ছে প্রকৃত জীবনের ভাষা। এরিখ ফ্রম বলেছেন যে এ পর্যায়ে মানসিক সংশ্লেষের আবির্ভাব ঘটে। এ ধারার সূত্রপাত ঘটে মানুষের বস্তুবাদী আচরণ থেকে। এই মানসিক উৎপাদন মানুষের রাজনীতি, আইন, নৈতিকতা, ধর্ম এমনকি অধ্যাত্মিকতার ভাষারও জন্ম দেয়। প্রকৃত সক্রিয় মানুষ জন্ম দেয় ধারণা ও ভাবের—আর ওই উৎপাদন শক্তিগুলোরও, যাদের নিজেদের মধ্যকার সংশ্লেষ ও পরবর্তী ধাপের উত্তরণের শর্ত হিসেবেও সে কাজ করে। সচেতন অস্তিত্বের বাইরে সচেতনতা কিছু না। এই সঙ্গে এই সচেতনতা তার প্রকৃত জীবনপ্রক্রিয়ারও অস্তিত্বরূপে আবির্ভূত।

চার

স্পিনোজা (Baruch Spinoza, ১৬৩২-১৬৭৭) এবং পরবর্তী সময়ে ফ্রয়েডের (Sigmund Freud, ১৮৫৬-১৯৩৯) মতো মার্ক্সও মনে করতেন যে বেশির ভাগ মানুষ মিথ্যা সচেতনতা দ্বারা পরিপ্লুত; ফলে অবধারিতভাবে তার ভাববাদ ও তার যৌক্তিক প্রক্রিয়া বিভ্রান্ত। তাই মানুষের কাজও এই অচেতনতার ফসল। ফ্রয়েডের মতে, এই অচেতনতার জন্ম যৌন-আর্তির (libidinal striving) মধ্যে। আর মার্ক্সের মতে, তার জন্ম সামাজিক সংগঠনের মধ্যে; যে কারণে মানুষ কিছু সচেতনতার দিকে ধাবিত হয়, আর কিছু সত্য ও অভিজ্ঞতা তার সচেতনতার নাগালের বাইরে থেকে যায়। মার্ক্সের মতে, এই অচেতনতা মানুষকে তার প্রকৃত প্রয়োজন ও আদর্শ শনাক্ত করতে বাধা দেয়। সত্যকে অনুধাবনের মধ্য দিয়ে মিথ্যা সচেতনতার প্রকৃত সচেতনতায় রূপান্তরিত হওয়ার পথ অবারিত হয়; যৌক্তিকতার নামে যে বিভ্রান্তি, তা অপনোদিত হয়, মানুষ তার প্রকৃত চাহিদাকে শনাক্ত করতে পারে, মার্ক্সীয় বিজ্ঞান বলে, মানুষের মধ্যে সহজাত যে শক্তি থাকে, তা আদতে উৎপাদন শক্তিরই কিছু অংশ, যেগুলো প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় কাজ করে। মার্ক্স ভাবের বিরুদ্ধে নন, কিন্তু ওই সব ভাবের বিরুদ্ধে যেগুলো সামাজিক সত্য বুঝতে বাধা দান করে, হেগেলের ভাষায় একটি সত্য সম্ভাবনাকে আড়াল করে। তবে মার্ক্স স্বীকার করেছেন যে শুধু পরিস্থিতিই মানুষকে সৃষ্টি করে না, মানুষও পরিস্থিতির জন্মদাতা। জার্মান ভাবাদর্শে মার্ক্স ও এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করেছেন যে পরিস্থিতি ও মানুষের যুগপৎ পরিবর্তনের অথবা মানুষের আত্মপরিবর্তনের বিষয়টি অনুধাবন ও বাস্তবসম্মতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব শুধু বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। এই বিপ্লব সমাজ পরিবর্তন করবে জোর করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে। যদিও এরিখ ফ্রম বলছেন, জোর করে ক্ষমতা দখলের এই বয়ান মার্ক্সীয় দর্শনে প্রথম উপস্থাপিত হয়নি; তিন শ বছর ধরে এই তত্ত্বের উদ্‌গাতা হলো বুর্জোয়া সমাজ। ফলে ইংল্যান্ড, ফরাসি দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে বুর্জোয়া আন্দোলন এই সূত্র ধরেই প্রতিষ্ঠা পায়। ওই সব বিপ্লবের সংঘটক মধ্যবিত্ত সমাজ। মার্ক্সের মতে, প্রতিটি পুরোনো সমাজের ভেতর একটি নতুন সমাজের জন্ম দিতে ধাত্রীর কাজ করে থাকে শক্তি (*পুঁজি*, ভলিউম এক)। তবে শ্রেণিসচেতনতাবিহীন ওই সমাজ পরিবর্তিত হলেই যে মার্ক্সীয় ধারামতে তা আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে, তা বলা চলে না।

পাঁচ.

মার্ক্স বলেছেন, মানুষ পরিবর্তিত হয় ইতিহাসের পথ ধরে। সে নিজের উৎকর্ষ সাধন করে, সে নিজেকে রূপান্তর করে, সে ইতিহাসের উৎপাদক, ইতিহাস সে সৃষ্টি করে। আবার সে নিজেই নিজের উৎপাদক। ইতিহাস হচ্ছে মানুষের

আত্মোপলব্ধির ইতিহাস, এটি মানুষের কাজের ও তার উৎপাদনের মধ্য দিয়ে আত্মসৃজনের বাইরে অন্য কিছু নয়। যে সমগ্রকে আমরা ইতিহাস বলে জানি, তা-ও মানবশ্রমের সৃষ্টির বাইরে অন্য কিছু নয়। আর এই মানবশ্রমের উৎপত্তি মানব-প্রকৃতি থেকেই। মানুষের আত্মসৃজনের ইতিহাস নিহিত তার উৎপত্তির মধ্যেই। তবে একটা কথা বলে রাখা জরুরি যে মানুষ সম্পর্কে মার্ক্সের ধারণা হেগেলীয় ধারণার মধ্যেই মূল সূত্রে প্রোথিত। দুজনেই আলোচনার জন্ম দিয়েছেন মানুষের সারবত্তা ও তার অস্তিত্বের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণে। এ ক্ষেত্রে হেগেল ও মার্ক্সের ধারণার সঙ্গে পরবর্তী সময়ে লেখা হারবার্ট মারকুইজের (Herbert Marcuse, ১৮৮৯-১৯৭৯) বক্তব্য অনেকটাই মেলে। মারকুইজ লিখেছেন, পৃথিবী একটি বিভক্ত ও মিথ্যা পৃথিবী, যতক্ষণ না মানুষ তার মৃত বস্তুময়তাকে (objectivity) ধ্বংস করে এবং নিজেকে ও নিজের জীবনকে নির্দিষ্ট ছাঁচে ও আইনের প্রকারের মধ্যে স্বীকৃতি দেয়। পরিশেষে যখন সে তার আত্মোপলব্ধি অর্জন করে, সে শুধু নিজের সত্যের দিকে ধাবিত হয় না, সেই সঙ্গে পৃথিবীর সত্যের দিকেও সে অগ্রসর হয়। আর এই স্বীকৃতির পালা চলতে থাকে। সে চেষ্টা করে এই সত্যকে কাজে পরিণত করার, এবং পৃথিবীকে জরুরি ভিত্তিতে তার আত্মোপলব্ধির পরিপূর্ণতায় পর্যবসিত করার (*Reason and Revolution*, Oxford University Press, 1941. পৃ : ১৪৬)।

লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, এই চিন্তা হেগেলীয়। জ্ঞান বলতে হেগেল কর্তা-কর্মের বিভাজন (Subject-Object split) মানতেন না। তিনি মনে করতেন, মানুষ পৃথিবীকে জানতে গোটা পৃথিবীটাকেই নিজের করে তোলে। মানুষ ও তার পরিপার্শ্বের সঙ্গে এই রূপান্তর ক্রমেই চলতে থাকে, সঙ্গে এসব আত্মোপলব্ধির ধারাবাহিকতাও। তবে হেগেল এখানে এ-ও বলেছেন যে এ প্রক্রিয়ায় সবকিছু তার অন্তর্গত বৈপরীত্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ায় এবং পরিণতিতে নিজেকেই তার ফলাফলরূপে উপস্থাপন করে। ফলে মানুষের সারবত্তা যতটা ঐতিহাসিক, ততটাই সত্তাতাত্ত্বিক। এই মর্মে এরিখ ফ্রম জার্মান কবি গ্যেটের (Johann Wolfgang von Goethe, ১৭৪৯-১৮৩২) বরাত দিয়েছেন। গ্যেটে বলেছেন, 'মানুষ ততটুকুই নিজেকে জানে, যতটুকু সে পৃথিবীকে জানে। সে পৃথিবীকে তার নিজের মধ্যে নিয়ে হৃদয়ঙ্গম করে; আর সে নিজের বিষয়ে সচেতন পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করেই।' মূলত গ্যেটের এই ভাষা জার্মান ভাববাদী দর্শনের গোড়ার কথা, মার্ক্সও এই ধারার বাইরে নন। এই ধারায় মানুষ স্বাধীন ও উৎপাদনশীল। তবে এই ধারার সবচেয়ে কার্যকরী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হেগেল। তিনি পদ্ধতিগতভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই ভাষ্য হাজির করেছেন যে মানুষ উৎপাদনশীল এবং ইতিহাসে তার অবস্থান নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা আকারে নয়, বরং সে সক্রিয়। আর এ ক্ষেত্রে সে পৃথিবীর সঙ্গে সরাসরি

সম্পর্কিত এবং পৃথিবীতে থেকেই সে পৃথিবীকে ক্রমাগত নিজের করে নিচ্ছে এবং পৃথিবীকে ক্রমাগতভাবে পুনরুৎপাদন করছে। এ ক্ষেত্রে তার পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, ক্রমাগত কাজের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির ক্ষমতা, সক্ষমতা এবং তার সুপ্ত প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ সম্ভব। অন্যথায় মানুষ হবে গ্রহীতা ও অকর্মক নিষ্ক্রিয়—আর এই মানুষ হেগেলের ভাষায় 'কিছুই না'; ফলে সে মৃত। অন্যদিকে উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষ তার সারবত্তায় ফেরত যেতে পারে; ধর্মতাত্ত্বিক ভাষ্যে এরই নাম ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়া বা ঈশ্বরে সমর্পিত হওয়া। দর্শনশাস্ত্রের এই বয়ান স্পিনোজা ছাড়া জার্মান ভাববাদী দর্শনেই সবচেয়ে বেশি শিকড় গেড়ে বসেছে। আর গ্যেটে, হেগেল এবং মার্ক্স এরই ধারাবাহিকতা। এই তিনজনেরও ভাষ্য, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত জীবিত, যতক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদনশীল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বাইরের দুনিয়াকে তার নিজ ক্ষমতার মধ্যে প্রকাশ ও আত্মস্থ করতে পারে। এই জায়গায় এসে এরিখ ফ্রম বলছেন, কমিউনিজম বলতে মার্ক্স বুঝতেন ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তির ইতিবাচক বিলোপ এবং একাধারে ব্যক্তির আত্মবিচ্ছিন্নতার অবসান। সেই সঙ্গে মার্ক্স ব্যক্তির মানবপ্রকৃতির স্বরূপ অর্জন করে তার সামাজিক সত্তা তথা প্রকৃত মানবসত্তায় ফেরত যাওয়াকেও কমিউনিজমের অভিপ্রায় হিসেবে প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতিবাদের সর্বোত পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে যে মানবতাবাদে পৌঁছানো যায়, তা-ই কমিউনিজম। এটি প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্বের অবসান, আর সেই সঙ্গে তা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বেরও অবসান। এটি একাধারে অস্তিত্ব ও সারবত্তার মধ্যকার পারস্পরিক দ্বন্দ্বেরও অবসান। এটি বস্তুময়তা (objectification) এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার (self-affirmation) দ্বন্দ্বের বিলোপ সাধন, সেই সঙ্গে স্বাধীনতা ও প্রয়োজনের বিবাদ ভঞ্জন। এ হচ্ছে বস্তুময় দুনিয়ার সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্কের সূচনা। মার্ক্স একেই বলছেন উৎপাদনশীল জীবন।

ছয়

সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার বিষয় নিয়ে মার্ক্স বলছেন যে এই নির্বোধ ও পাক্ষিক ধারণা বোঝায় যে কোনো বস্তু 'আমাদের' হওয়ার মানে হচ্ছে তা আমাদের করায়ত্তে আছে (having); আর তা তখনই 'আমাদের', যখন এটি আমাদের কাছে কোনো পুঁজি অথবা সরাসরি আমরা তা খেতে, পান করতে, পরতে অথবা তাতে অবস্থান করতে পারি—এককথায় কোনো না কোনোভাবে তা আমাদের উপযোগিতায় লাগে। ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি বলতে জীবনের উপকরণও (means of life) বোঝায়, যা নানা পুঁজির জন্ম দেয়। এর বহুবিধ 'হওয়ার' (being) বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণা সত্ত্বেও আমরা তার খর্বিত অর্থ 'আছের' (having) মধ্যেই একে সীমাবদ্ধ রাখলাম। এরিখ ফ্রম মার্ক্সবিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ

বিবাদের ভঞ্জন করেছেন এই মর্মে যে তাবৎ কমিউনিস্ট সমাজে এবং সমাজবাদী দলগুলোতে কিছু ব্যতিক্রম বাদে এই ধারণা প্রচলিত যে মার্ক্সবাদ দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনন্ত ভোগবাদকে প্রশ্রয় দেবে, তবে পুঁজিবাদের সঙ্গে এর মূলগত তফাত হচ্ছে, এখানে ভোক্তা হবে সর্বসাধারণ, পুঁজিবাদীদের মতো কিছু বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠী নয়। কিন্তু প্রধান মূল্যবোধের জায়গায় এ ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রুশ্চেভতন্ত্র (Krushchevism) একই লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আছে, আর তা হচ্ছে সর্বোচ্চ উৎপাদন ও সর্বোচ্চ ভোগ। কিন্তু মার্ক্স বলেছিলেন যে খুব বেশি দরকারি জিনিসের উৎপাদন খুব বেশি অপদার্থ লোক তৈরি করে। মার্ক্সের লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন, কিন্তু ভোগের অনন্ত দরজা উন্মোচন নয়। মার্ক্স জোর দিয়েছেন বুদ্ধিবৃত্তিক উৎপাদনের দিকে এবং চিত্তের বিকাশের দিকে। আর তার জন্য প্রথমে দরকার দারিদ্র্যের অপনোদন। কারণ, তা না হলে মানুষের সৃজনশীলতা বাধাগ্রস্ত হবে।

সাত

মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি বলতে মার্ক্স মানুষের আত্মসৃজনকে বুঝিয়েছেন। একজন মানুষ কখনোই স্বাধীন নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেই নিজের অধিপতি (Master) না হয়। আর এই নিজের অধিপতি হওয়া বলতে বোঝায়, ব্যক্তি তার অস্তিত্বকে নিজের দখলে রাখছে। অপরাশ্রিত ব্যক্তি বা অপরের অধীন ব্যক্তি এই মত মোতাবেক স্বাধীন নয়। এ ক্ষেত্রে তার আত্মসৃজন ক্রমেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। জগৎকে দেখে, শ্রবণ করে, গন্ধ শুঁকে, অনুভব করে মানুষ যে ক্রমাগত নিজেকে পুনরুৎপাদন করে, অপরাশ্রিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার এই প্রক্রিয়া খর্বিত হয়। মার্ক্সীয় সমাজবাদের লক্ষ্য মানুষের মুক্তি, আর এ ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়া কার্যকর হয় আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিরূপণ করে। এই সম্বন্ধ নিরূপণের মূল ভাষ্য হচ্ছে আদিতে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্কে আবার ফেরত যাওয়া। আর তাতেই মানুষ তার প্রকৃত আত্মসৃজনের বিকাশ ঘটিয়ে তার উপলব্ধির ও সৃজনশীলতার পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারবে। কিন্তু বস্তুগত সম্পদের ওপর প্রভুত্ব কায়েমের যে বাসনা মানুষের মধ্যে, তার ওপর নির্ভরশীল কমিউনিজমকে মার্ক্স অশোধিত কমিউনিজম বলেছেন। এরিখ ফ্রমের মতে, এই কমিউনিজম বল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বস্তুগত সম্পদের আত্মীকরণ বজায় রেখে মানুষের প্রতিভা হনন করে। আবার তা বৈবাহিক সম্পর্ককে সামন্ত ও বুর্জোয়া ধারণা বলে নারীকেও সর্বসাধারণের বা গণের করে তোলে 'গণিকা' প্রতিপন্ন করে। এককথায় এই ধারণা নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক বিলোপ করে জগতে নারীর সর্বজনীন বেশ্যাবৃত্তিকে বৈধ করে তোলে।

আট

মার্ক্সের মতে, মানুষের আত্মোপলব্ধির বিষয়টি পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না মানুষের কাজের সঙ্গে তার সম্পর্কের পর্যালোচনা না হচ্ছে। প্রথমে বিষয়টি জেনে নেওয়া জরুরি যে মার্ক্স শ্রম ও পুঁজিকে শুধু অর্থনৈতিক নিক্তিতে মাপতেন না, তাঁর কাছে ওগুলো ছিল নৃবিজ্ঞানেরও বিষয়, যেগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আবার মূল্যবোধের মূল্যায়ন, যা শেষ বিচারে মানবিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত। আর শ্রমকে বোঝার ক্ষেত্রে মার্ক্স হেগেলের অনুসরণ করেছেন। হেগেলের মতো মার্ক্সও মনে করতেন যে শ্রম হচ্ছে আত্মসৃজনের কাজ। ফলে মার্ক্সের কাছে শ্রম হচ্ছে তৎপরতা, কিন্তু তা পণ্য নয়। মানুষের সামগ্রিক তৎপরতা মার্ক্সের ভাষায় স্বতৎপরতা (self-activity)। এই তৎপরতাকে মার্ক্স শ্রম বলতেন না, বরং সমাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে তিনি শ্রমের অবসান চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে মার্ক্স মুক্ত শ্রম ও বিচ্ছিন্ন শ্রমের মধ্যে পার্থক্য রচনা করেছেন এবং একটি নতুন পদ ব্যবহার করেছেন—শ্রমের মুক্তি। শ্রম বলতে বোঝায় অন্তত মার্ক্সের মতে আত্মপ্রকাশ, যার মধ্য দিয়ে মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু মানুষের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অন্তত মার্ক্সীয় সমাজবাদে তার নিজস্ব তৎপরতার বিকাশ ঘটিয়ে নিজের সামগ্রিক আত্মতৃপ্তি ঘটানো। কাজ এখানে কোনো লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় নয়, বরং তা নিজেই এক লক্ষ্য। আর তা কৃত হবে মানবশক্তির অর্থবহ প্রকাশে।

জার্মান ভাবাদর্শে মার্ক্স লিখেছেন, 'একজন শিকারি, একজন জেলে, একজন মেষ পালক অথবা একজন তীক্ষ্ণধী সমালোচক তার নিজের পেশাতেই থাকবে, যদি সে তার জীবিকার উপায় না হারাতে চায়। অন্যদিকে কমিউনিস্ট সমাজে একজন মানুষের শুধু একটি গণ্ডিবদ্ধ কর্মজগৎ থাকবে না, যে কেউ যেকোনো ধরনের কাজে সক্রিয় হতে পারে। সার্বিক উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হবে সমাজ দ্বারা, আর তা আমাকে আজ এক কাজে আর কাল আরেক কাজে ব্যাপৃত হওয়াকে সম্ভব করবে। সকালে শিকার করা, বিকেলে মাছ ধরা, সন্ধ্যায় পশু পালন করা আর নৈশভোজের পর সমালোচক হিসেবে আবির্ভূত হওয়া—যা আমার মনে ধরে; আর ওই সমাজে তা হওয়া সম্ভব শুধুই শিকারি, জেলে, মেষ পালক বা সমালোচক না হয়েই (*জার্মান আইডিওলজি*, পৃ : ২২)

নয়

মার্ক্সের মতে, মানবজাতির ইতিহাস তার ক্রমিক বিকাশের ইতিহাস। কিন্তু আবার একই সঙ্গে তা তার ক্রমিক বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস। আর মার্ক্সের সমাজতন্ত্র হচ্ছে এই বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তির আন্দোলন, যার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের তার নিজের কাছে ফেরত যাওয়া এবং পুরোদস্তুর তার আত্মোপলব্ধির আঙিনায় প্রবেশ করা। মার্ক্স বিচ্ছিন্নতার অবসানের আগে বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। বিচ্ছিন্নতা

বলতে মার্ক্স বুঝতেন আদতে পৃথিবী ও নিজেকে নিষ্ক্রিয়ভাবে ও গ্রহীতার আদলে অভিজ্ঞতায় আনা; যেখানে কর্তা (subject) বস্তু (object) থেকে বিচ্ছিন্ন। পশ্চিমা দর্শনে বিচ্ছিন্নতার বয়ান হাজির হয়েছে বাইবেলের পুরাতন সন্ধি (old testament) থেকে, বিশেষ করে মূর্তি উপাসনার ধারণা থেকে। মানুষ মূর্তি গড়ে তার নিজ হাতেই। এই মূর্তির সংখ্যাও নেহাত কম নয়। অথচ সচেতন মানুষ বলেন যে তাঁরা একজন ঈশ্বরেরই ভজনা করেন। কিন্তু মূর্তি উপাসনার বেলায় মানুষ তার নিজের হাতে গড়া মূর্তিরই উপাসনা করে। যখন সে তার মাথা ওই নিজ হাতে গড়া মূর্তির সামনে নত করে, ব্যক্তি তার সত্তা হারিয়ে বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। এর পরিণতি হচ্ছে জগৎকে বোঝার মধ্য দিয়ে তার সৃজনশীল সত্তা হওয়ার পরিবর্তে মূর্তির উপাসনায় রত হয়ে নিজেকে তার সৃজনশীল সাধনা ও জীবনীশক্তি থেকে সে বিযুক্ত করে। এরিখ ফ্রম এ জায়গায় বাইবেলের পুরাতন সন্ধি থেকে উদ্ধৃত করেছেন, '(ওই সব মূর্তির) চোখ আছে কিন্তু তারা দেখে না, কান আছে কিন্তু তারা শোনে না ইত্যাদি।' মানুষ যতই তার শক্তি ওই সব মূর্তির দিকে ব্যয় করে, ততই সে নিঃস্ব হয়, আর ততই সে ওই সব মূর্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে; আর পরিত্রাণের যে অংশটুকু সে মূর্তিকৃত বলে ভাবে, সে বোঝে না ওই অংশ তারই সৃষ্ট। সে জানে না মূর্তির মধ্যে যে সৃজনীশক্তি সে আবিষ্কার করে, তা আদতে তারই দেওয়া। এরিখ ফ্রম মনে করেন, মার্ক্সীয় দর্শনের পয়গম্বরি উদ্দেশ্যের অন্যতম বিষয় হলো এই মূর্তি ধ্বংস করা (*Marx's concept of Man*. পৃ : ৫১)।

আমার মতে অবশ্য বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত আরও আগে এবং তা বাইবেলের পুরাতন সন্ধির আদিপুস্তকের (Genesis) তৃতীয় অধ্যায়ে, যেখানে সাপের পরামর্শে হাওয়া (Eve) ও তাঁর কারণে পরে আদম (Adam) নিষিদ্ধ ফল খান এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে এক উপলব্ধির জগৎ উন্মোচিত হয় এবং তাঁরা আবিষ্কার করেন যে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বাইরেও তাঁদের আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে এবং জগৎকে আলাদাভাবে হৃদয়ঙ্গম করার আছে। এর ফলে তাঁদের আদি অস্তিত্ব যা প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, তা থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয়। অবশ্য তাতে ভালো কি মন্দ হলো, সেই আলোচনায় আমি এখানে যাচ্ছি না।

যে জায়গায় এরিখ ফ্রম গুরুতর ভুল করেছেন, তা হচ্ছে তিনি লিখেছেন যে মার্ক্স বিচ্ছিন্নতার ধারণা নিয়েছেন হেগেল থেকে। আদতে ইউরোপে বিচ্ছিন্নতার ধারণা রেনেসাঁ-উত্তরকালে প্রথম বিস্তৃত আকারে ব্যবহার করেছেন জঁ-জাক রুশো (Jean-Jaques Rousseau, ১৭১২-১৭৭৮) তাঁর বিখ্যাত বই *সামাজিক চুক্তি*তে। গিয়র্গ ফ্রিদরিখ হেগেল যখন আট বছর বয়সের, রুশো তখন মারা যান। রুশো যখন ১৭৬২ সালে *সামাজিক চুক্তি* লেখেন, তখনো হেগেল জন্মগ্রহণ করেননি।

Wordsworth Classics of World Literature ১৯৯৮ সালে *সামাজিক চুক্তির* যে ইংরেজি অনুবাদটি (*The social contract or principles of political right*) প্রকাশ করে (অনুবাদক H.J. Tozer) তার দ্বিতীয় অধ্যায় (Primitive Societies) ও চতুর্থ অধ্যায়ে (Slavery) বিচ্ছিন্নতার ধারণা স্পষ্টভাবেই আছে। মজার ব্যাপার হলো, রুশো আবার এই ধারণা মূলত ধার করেছেন হুগো গ্রোটিয়াস (Hugo Grotius, ১৫৮৩-১৬৪৫) থেকে। *সামাজিক চুক্তির* বয়ান পড়লে এটি সহজেই স্পষ্ট হবে যে মার্ক্সের বিচ্ছিন্নতার ধারণা রুশোর ধারণারই সম্প্রসারিত রূপ কিন্তু কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে। রুশো লিখেছেন,

> 'যেভাবে আমরা দেখি, পরিবার হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজের প্রথম উদাহরণ; যেখানে দলপতি হচ্ছেন পিতৃতুল্য আর জনগণ তার সন্তান সমতুল্য : সবাই জন্মগতভাবে সমান ও স্বাধীন এবং প্রয়োজনের বাইরে তারা বিচ্ছিন্ন নয়। সামগ্রিক পার্থক্যের জায়গাটা হচ্ছে, পিতার ভালোবাসা, যেটি তিনি তাঁর সন্তানদের দেন, তার বিনিময় তিনি পান। রাষ্ট্রীয় পরিসরে হুকুমকর্তা হুকুম-আহকামের দণ্ড দিয়ে সেই ভালোবাসা অর্জন করেন না' (দ্বিতীয় অধ্যায়, আদি সমাজ)।

এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হচ্ছে রুশোর চোখে বিচ্ছিন্নতার উপকারী দিকটা হলো, এতে আদিম সমাজের বিপৎসংকুল পৃথিবীতে পিতৃতুল্য নেতার নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে থাকা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে হুগো গ্রোটিয়াস রুশোর চেয়ে আরও বেশি প্রাজ্ঞতার পরিচয় হয়তোবা দিয়েছেন রাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী হিসেবে। রুশো লিখেছেন,

> গ্রোটিয়াস বলেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি তার স্বাধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার প্রভুর ক্রীতদাস হতে পারে, তাহলে একটি রাজত্বে কেন জনগণ নিজ সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাজার অধীন হতে পারবে না?' (চতুর্থ অধ্যায়, ক্রীতদাসত্ব)।

কিন্তু রুশো গ্রোটিয়াসের বিরোধিতা করেন এইভাবে,

> এ ক্ষেত্রে বহু দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে (বিচ্ছিন্নতার) বিষয়টি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে; আমরা বরং বিচ্ছিন্নতা শব্দটির ওপর মনোযোগ দিই। বিচ্ছিন্নতা মানে নিজেকে দেওয়া বা বিক্রি করা। এখন এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির কাছে ক্রীতদাস হওয়ার অর্থ নিজেকে দেওয়া নয়, ওই ব্যক্তির বেঁচে থাকার তাগিদে নিজেকে খুবই স্বল্পমূল্যে বিক্রি করা (পূর্বোক্ত)।

যে জায়গায় মার্ক্স হেগেলের ওপর নির্ভরশীল, তা হচ্ছে মার্ক্স হেগেলের মতো মনে করতেন যে মানবেতিহাস আদতে বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস। তাঁরা দুজনেই একমত যে মানুষের অস্তিত্ব তার সারবত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার অন্তর্গত সক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হয়, তার যা হয়ে ওঠার কথা ছিল, তা আর বাস্তবে হয় না। মার্ক্স নিজে যা যুক্ত করেছেন তা হলো, বিচ্ছিন্নতার সূচনা হয়েছে মানবেতিহাসে ব্যক্তিগত সম্পদ ও শ্রমের বিভাজন থেকে।

দশ

এরিখ ফ্রম মনে করতেন, মার্ক্স নিয়ে যে বিকট বিভ্রান্তি কমিউনিস্ট দুনিয়ায় চালু আছে, তা হচ্ছে, মার্ক্স নাকি প্রথমত অর্থনৈতিকভাবে যে শ্রমিক শোষণ পৃথিবীব্যাপী বিদ্যমান, তার মূলোৎপাটন করতে চেয়েছেন। এর কারণ হিসেবে মার্ক্স ভাবতেন যে উৎপাদিত পণ্যের যে সিংহভাগ পুঁজিপতির দখলে যায়, তা আদতে শ্রমিকের। এই সমস্যা সমাধানকল্পে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ তাবৎ কমিউনিস্ট দুনিয়া ব্যক্তিগত পুঁজিপতির জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। কিন্তু মার্ক্স আয়ের সমতা রক্ষা করার জন্য প্রথমত উদ্বিগ্ন ছিলেন না। তিনি মানুষকে প্রথমত সেসব কাজ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যা তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করে, তাকে বস্তুতে রূপান্তর করে এবং তাকে বস্তুর দাসে পরিণত করে। যেভাবে কিয়ের্কেগার্ড (Søren Kierkegaard, ১৮১৩-১৮৫০) ব্যক্তির পরিত্রাণের চিন্তা করেছিলেন, সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মার্ক্স আয়ের বণ্টননীতি নয়, বরং উৎপাদনপদ্ধতি নিয়ে তাঁর ভাষ্য প্রদান করেছেন, যে পদ্ধতিতে মানুষ শুধু পুঁজিপতির দাসে নয়, মানুষ মাত্রই বস্তুর এবং পরিস্থিতির দাসে রূপান্তরিত হয়, ফলে তার মুক্তি ব্যাহত হয়। যে কারণে মার্ক্সের লক্ষ্য শুধু শ্রমিকের মুক্তি নয়, বরং সমগ্র মানবতার মুক্তি। মার্ক্স মনে করতেন, বিচ্ছিন্নতার অবসান আসবে স্বাধীন কাজের মধ্য দিয়ে; আর তা-ই মানুষকে পূর্ণ মানবে রূপান্তর করবে। এই জায়গায় মার্ক্স পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন; কারণ পুঁজিবাদে মার্ক্স বলছেন, 'মানবসত্তার দুর্বলতার কারণে যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে দুর্বল মানুষকে যন্ত্রের সারিতে দাঁড় করানোর জন্য' (*Economic and Philosophical Manuscripts*, পৃষ্ঠা : ১৪৩)।

*পুঁজি*র প্রথম খণ্ডে মার্ক্স বলেছেন, 'পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমলব্ধ সামাজিক উৎপাদনের সব পন্থাই ব্যক্তিশ্রমিকের ব্যয়ে প্রাপ্ত; উৎপাদনের উন্নয়নের সব মাধ্যমই তাদের ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর ও তাদের শোষণ করার জন্য; আর উৎপাদকেরা শ্রমিককে কেটেকুটে খণ্ডিত মানুষে পরিণত করে, তাকে যন্ত্রের অনুষঙ্গে নামিয়ে আনে, তার কাজের শেষ আকর্ষণটুকুও ধ্বংস করে এবং তার কাজকে পরিণত করে এক ঘৃণ্য শরীর খাটানোতে। তারা তার কর্মপ্রক্রিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতাকে তার থেকে আলাদা করে সেই অনুপাতেই, বিজ্ঞান যেভাবে স্বাধীন শক্তি আকারে তাতে সংশ্লিষ্ট হয়েছে' (*পুঁজি*, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭০৮)।

'এই বিচ্ছিন্ন মানুষ শুধু অন্যান্য মানুষ থেকেই বিচ্ছিন্ন নয়; সে মানবতার সারবত্তা থেকেই বিচ্ছিন্ন, সেই সঙ্গে তার প্রজাতি সত্তা (species-being) থেকেও এবং তার স্বাভাবিক ও আধ্যাত্মিক গুণগুলো থেকেও বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতা মানুষের মধ্যে এক অস্তিত্ববাদী অহমের জন্ম দেয়; যা তার মধ্যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

আমদানি করে। পরিণতিতে সে তার নিজ দেহ, বহিঃপ্রকৃতি, তার মানসিক জীবন এবং তার মানবজীবন থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়' (*Economic and Philosophical Manuscripts*, পৃষ্ঠা : ১০৩)।

এগারো

মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য মানুষ। ফলে মানুষকে বিচ্ছিন্নতা থেকে অবমুক্ত করে মানুষের সৃজনশীল সত্তার চূড়ান্ত বিকাশের লক্ষ্যে উৎপাদনব্যবস্থা ও সমাজের পুনর্বিনির্মাণ করাই এই মতাদর্শের কাঙ্ক্ষিত পরিণতি। *পুঁজি* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মার্ক্স লিখেছেন, 'বস্তুত স্বাধীনতার আঙিনা ততক্ষণ পর্যন্ত অবারিত হয় না, যে পর্যন্ত না প্রয়োজনের তাগিদ এবং বহিঃস্থ উপযোগিতার কারণে শ্রম কাজে না লাগে। সত্যিকার চূড়ান্ত বাস্তবতা অনুসারে বিষয়টি কঠিনভাবে অর্থগত জায়গায় বস্তুগত উৎপাদন বলয়ের অপর প্রান্তে অবস্থিত। যেভাবে অসভ্য বুনোকে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় তার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে, জীবনকে সংবহন করার লক্ষ্যে এবং তার পুনরুৎপাদনের জন্য, সভ্য মানুষকেও তা-ই করতে হয় এবং সে তা করতে বাধ্য সব সমাজেই এবং সম্ভব সব উৎপাদনপদ্ধতিতে। তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাভাবিক প্রয়োজনেরও সম্প্রসারণ ঘটে; এর কারণ তার চাহিদা বাড়ে, কিন্তু একই সঙ্গে উৎপাদন শক্তিরও বৃদ্ধি ঘটে। আর এসবের মাধ্যমে এই চাহিদাগুলোরও পূরণ হয়' (*পুঁজি* তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৫৪)।

বলা যায়, এরিখ ফ্রম মার্ক্সীয় চিন্তার সারাৎসার বলতে বুঝেছেন যে দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক চাহিদা পরিপূরণের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক মানুষ তার আধ্যাত্মিক চেতনার ও সামগ্রিক সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাবে—এ-ই হচ্ছে মার্ক্সীয় চেতনার কাম্য। এই চিন্তার জায়গা থেকেই শ্রেণিহীন সমাজের চেতনা পরিস্ফুটিত হয়েছে। শ্রেণিহীন সমাজ মূলত পূর্ণ বিকশিত মানুষ সৃষ্টিরই একটি ধাপ। এরিখ ফ্রম এই জায়গায় মার্ক্সের মধ্যে হিব্রু পয়গম্বরদের ছায়া দেখেছেন, যাঁরা একাধারে রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন। সমাজে ধর্মীয় চেতনা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সমাজের পথ বিনির্মাণে এবং ইতিহাসের পুনর্বিনির্মাণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন; কিংবা ইতিহাসকে তাঁরা অতিক্রমও করেছেন চিন্তার পুনর্ব্যাকরণ রচনা করে এবং নতুন উপলব্ধির সূত্রপাত ঘটিয়ে। ইব্রাহিম (আ.), ইসহাক (আ.) ও ইয়াকুব (আ.)-এর ঈশ্বর ইতিহাসেরই অংশ; ধর্মীয় বয়ান ও রাজনৈতিক বাস্তবতার অংশ হিসেবেই ইতিহাসে ঈশ্বর ঐতিহাসিক ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছেন। তার মানে হচ্ছে, মানুষের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত, আর রাজনীতিকেও নৈতিক মূল্যবোধ ও মানুষের আত্মোপলব্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো অবকাশ নেই।

বারো

মার্ক্সের মানবসত্তার পর্যালোচনা প্রধানত *ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট* এবং *জার্মান আইডিওলজি* গ্রন্থ দুটিতে এসেছে। বই দুটি পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে, অর্থাৎ ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের বহু পরে, যে কারণে রুশ দেশীয় কমিউনিজম কিছুটা মোজেস হেস (Moses Hess, ১৮১২-১৮৭৫) প্রভাবিত মার্ক্সের ইহুদি-খ্রিষ্টান পয়গম্বরি মসিহত্বের আলামত বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে রুশ দেশে ওই বই দুটিকে তরুণ মার্ক্সের লেখা বলে আর পরিণত মার্ক্স ওই বয়ানগুলো থেকে সরে এসেছেন বলে চাউর করা হচ্ছিল। রুশ দেশে কমিউনিজমের যুগে যে ব্যক্তির অধিকার ও অভিপ্রায় ক্ষুণ্ন হয়েছে, তার বিরোধী শুধু মার্ক্স নন, ফরাসি বিপ্লবপন্থী ও জার্মান ভাববাদী দর্শনের সবাই। এরিখ ফ্রম লিখেছেন, 'ফরাসি বিপ্লবের সমর্থক দার্শনিকেরা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফয়েরবাখ, মার্ক্স, স্টির্নার এবং নিৎশে সবাই যে বিষয়ে একমত, তা হল ব্যক্তি তার বিকাশ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাইরের কোনো অভিপ্রায়ের প্রতি নতজানু হবে না' (*The Fear of Freedom*, পৃষ্ঠা : ১০৬)।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Karl Marx, *The Capital* 1 & III volume. Charles H. Kerr & co. Chicago. 1906

২. Karl Marx, *Economic and philosophical Manuscripts*, Translated by T. B Boffomore continum Publicter; 2004 editing

৩. Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. ML Werke. See: http://www.mlwerke.de/me/me40/me40_465.htm

৪. Karl Marx and F. Engels, *German Idealogy*. Translated by R. Pascal. New York International Pubishers. 1939.

৫. Karl Marx and F. Engels, *Die deutsche Ideologie*.. See: http://www.mlwerke.de/me/me03/me03_009.htm

৬. Erich Fromn, *Marx's Concept of Man*. Continum Pablishers. 2005 South Asian edition.

৭. Erich Fromn, *Th Fear of Freedom*. Routledge classics. 2003 edition.

৮. Karl Marx, *Economic and Philosophical Manuscripts of 1844*, Progress Publishers, Moscow 1959, translated by Martin Milligan.

৯. Jean-Jaques Rousseau, *Du contrat social ou Principes du droit politique* (1762). Mozambook. 2001 edition.

১০. *The Social Contract or Principles of Political Right*. Translated by H. J. Tozer. Wordsworth Classics of world literature. 1998 edition.

বই আলোচনা

এক-এগারো : সেনা-রাজনীতির মিথস্ক্রিয়া

সোহরাব হাসান

এক-এগারো : বাংলাদেশ ২০০৭-২০০৮
মহিউদ্দিন আহমদ; প্রথমা প্রকাশন, ২০১৯

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঘটনার চেয়ে দুর্ঘটনা বেশি। আর নায়কের চেয়ে প্রতিনায়কের সংখ্যা বেশি। ২০০৭ সালে সংঘটিত এক-এগারোর পরিবর্তন বাংলাদেশের রাজনীতির এমন একটি ঘটনা, যার রেশ সহজে যাবে না। এক-এগারো কেন ঘটেছিল, তার পুরোটা কখনো জানা যাবে না। আগের সেনা হস্তক্ষেপ বা অভ্যুত্থান সম্পর্কেও জানা যায়নি। এক-এগারোর সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, যাঁরা এর থেকে সুবিধা পেয়েছেন এবং যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সবাই নিজের মতো করে ঘটনা ব্যাখ্যা করেছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। প্রকৃতপক্ষে এক-এগারো ঘটনা নয়, ঘটনার প্রতিক্রিয়া। এ রকম প্রতিক্রিয়া আমাদের ইতিহাসে আরও অনেক আছে।

বাংলাদেশে প্রথম সেনা হস্তক্ষেপ হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। বলা যায়, এটি পাকিস্তানের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। পাকিস্তানে প্রথম সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান আইয়ুব খান, ১৯৫৮ সালে। তারও আগে জেনারেল আকবর খান ১৯৫১ সালে বামপন্থীদের সহায়তায় একটি অভ্যুত্থানের উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হন। ইস্কান্দার মির্জার হাত থেকে আইয়ুব যেভাবে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, ১৯৬৯ সালে জেনারেল ইয়াহিয়াও একই কায়দায় বন্দুকের নলের মুখে আইয়ুবকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন। মির্জা দেশে থাকতে পারেননি। আইয়ুব দেশেই ছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপালিত কতিপয় সেনাসদস্য 'গণতন্ত্র ও ইসলাম' উদ্ধারের নাম করে রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করেন। কিন্তু ওই সেনারা জানতেন না, কীভাবে দেশ চালাতে হয়। তাই তাঁরা যে নেতাকে হত্যা করে ক্ষমতায় এলেন, সেই নেতার অনুসারীদের দিয়েই সরকার

গঠন করলেন। এর মাধ্যমে প্রমাণ করলেন, সেটি শুধু সামরিক অভ্যুত্থান ছিল না, ছিল ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাও। রাষ্ট্রপতি পদে বসানো হয় বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সদস্য ও বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদকে। আগের মন্ত্রীদের নিয়েই গঠন করা হয় নতুন মন্ত্রিসভা, যাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে বন্দুকের নলের মুখে শপথ পড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। তবে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, ওবায়দুর রহমান প্রমুখের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। মোশতাকের পাশাপাশি তাঁরাও ইতিহাসের খলনায়ক হিসেবে চিহ্নিত।

সেনা অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে নীতিভ্রষ্ট রাজনীতিকদের হাত মেলানোর ঘটনা পরেও ঘটেছে। একদল দালাল রাজনীতিক এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য মুখিয়ে থাকেন। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন। আবার জিয়ার মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য এরশাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।

এক-এগারো নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের অতীতের পটভূমিটিও জানা প্রয়োজন। সমস্যা হলো, বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে গবেষণামূলক বই খুব বেশি লেখা হয়নি। স্মৃতিচারণামূলক বই বেশি লিখিত হয়েছে। কিন্তু স্মৃতিচারণা ইতিহাস নয়। মহিউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগ, জাসদ ও বিএনপির ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির উৎসমূল সন্ধান করেছেন। *জাসদের উত্থান-পতন* বইয়ে তিনি স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরেছেন। সেখানে জাসদের কী ভূমিকা ছিল, তা-ও বলেছেন। তাঁর মতে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টেই জাসদের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। এরপর জাসদ ছিল অনেকটা প্রাণহীন ধড়ের মতো। জাসদ গঠনতন্ত্রে 'আমাদের লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' নীতি গ্রহণ করলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ। ১৫ আগস্ট সেই কাজ যখন অন্য পক্ষ করে ফেলে, তখন জাসদের জন্য তাঁদের সঙ্গে হাত মেলানো বা নীরব দর্শক হওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না। সম্প্রতি শামসুদ্দীন পেয়ারা লিখিত *সিরাজুল আলম খান বলছি* বইয়েও বিষয়টি খোলামেলাভাবে এসেছে (বইটি বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে)।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর পালাবদল ঘটলেও জাসদ ক্ষমতার বারান্দা থেকে ছিটকে পড়ে। এরপর ক্ষমতার লড়াইয়ে জাসদ হেরে যায় এবং জিয়া জয়ী হন। কিন্তু সাড়ে পাঁচ বছরের মাথায় ১৯৮১ সালের ৩০ মে তিনিও আরেক সেনা অভ্যুত্থানে নিহত হন, যদিও সেই অভ্যুত্থান সফল হয়নি। জিয়া হত্যার কয়েক দিনের মাথায় সেই অভ্যুত্থানের নেতা হিসেবে পরিচিত জেনারেল মোহাম্মদ মঞ্জুরও নিহত হন।

জিয়াউর রহমান বন্দুকের জোরে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তবে সেখানে জাসদেরও প্ররোচনা ছিল। কারণ তার আগে তিনি তো সেনাপ্রধানের পদে ইস্তফা

দিয়ে অবসরে চলে গিয়েছিলেন। ৩ অক্টোবর খালেদ মোশাররফ নতুন সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। জিয়া তাহেরকে ফাঁসি দিয়েছেন—এটি যেমন সত্য, তেমনি অসত্য নয়, জাসদই তাঁকে ক্ষমতার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। সামরিক বাহিনীর ওপর ভর করে যে বিপ্লব হয় না, সেটি বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই প্রমাণিত।

বাংলাদেশে সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে ক্ষমতা নিয়েছে একবারই—১৯৮২ সালে। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তখন সেনাপ্রধান। তার ১০ মাস আগে জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে নিহত হন। নতুন রাষ্ট্রপতি হন বিচারপতি আবদুস সাত্তার, যিনি জিয়ার উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন। এরশাদ প্রথমে তাঁকে দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় সেনাবাহিনীর হিস্যা আদায় করতে চেয়েছিলেন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করালেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি সাত্তার তাঁর আবদার মেনে না নেওয়ায় সেনাবাহিনী ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখল করে। জিয়ার মতো এরশাদ রাজনীতিকদের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিলেন এবং 'যে দেবতাকে যে নৈবেদ্য দিলে কাজ হবে', সেটা দিয়েছেন। তিনি প্রকাশ্যে বিএনপিকে ভেঙেছেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে গোপনে সমঝোতা করেছেন। এরশাদ ধর্মপরায়ণ মানুষ, এ কথা কেউ বলবেন না। কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে ধর্মকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন। এরশাদ নিজেকে আওয়ামী লীগের মিত্র বলে দাবি করেছেন। কিন্তু রাজনীতিটা নিয়েছেন বিএনপির। বিএনপি ও জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্র একই ছাঁচে তৈরি। এরশাদ দেখেছেন, বিএনপি ও তাঁর রাজনীতি প্রায় এক। বিএনপির সঙ্গে আঁতাত করলে তাঁর কোনো ফায়দা হবে না। তাঁর চেয়ে জিয়ার ক্যারিশমা অনেক বেশি। এ কারণে এরশাদের প্রথম কাজ হয় বিএনপিকে ভাঙা। অন্যান্য সামরিক শাসক যেমনটি করে থাকেন, এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যবহার করে, লোভ ও ভয় দেখিয়ে ক্ষমতায় আসার আগেই বিএনপিতে নিজের সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন এরশাদ।

ক্ষমতায় থাকতে জিয়া ও এরশাদ দুই ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। এরশাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল রাজনৈতিক শক্তি। জিয়ার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল সেনাবাহিনীর ভেতরেই। তাঁর সময়ে ১৮টি, মতান্তরে ২১টি সেনা অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছে।

জিয়া, খালেদ বা মইন—ক্ষমতা গ্রহণের আগে কেউ নিজেদের সামনে আনেননি। এরশাদই এনেছেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের আগেই সরকারের কাছে ১২ দফা দাবিনামা পেশ করেছিলেন। এরশাদ চেয়েছিলেন, দেশ শাসনে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব বজায় থাকুক।

বাংলাদেশে প্রতিবারই সেনা হস্তক্ষেপ হয়েছে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এবং রাজনীতিকদের গালমন্দ করে। আবার সমরনায়কেরা সেই নিন্দিত রাজনীতিকদেরই

কাছে টেনে নিয়েছেন গদি টিকিয়ে রাখতে। ১৯৮২ সালে সামরিক শাসন জারির আগে একজন প্রতিমন্ত্রীর বাসা থেকে কুখ্যাত খুনের আসামি ইমদুর ধরা পড়ার ঘটনা পরিকল্পিত ছিল বলে অনেকের ধারণা। সেই সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম এ মতিন প্রথম সুযোগে এরশাদের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। এরশাদের রাজনৈতিক দুর্বলতা যত প্রকট হোক না কেন, তিনি সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁর সময়ে একটিও অভ্যুত্থান হয়নি।

ইতিহাসের সত্য খুঁজে বের করতে খালেদ ও মঞ্জুর—দুই সেক্টর কমান্ডারের হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন জরুরি। সাধারণ অভিযোগ আছে যে পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনারা এসব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত। তাহলে প্রশ্ন আসে, সেক্টর কমান্ডাররা কেন একে অপরকে হত্যা করলেন? দুজন রাষ্ট্রপতিকে যাঁরা হত্যা করেছেন, তাঁরা কেউ পাকিস্তান প্রত্যাগত নন।

জিয়াকে ডিঙিয়ে সফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান করা বঙ্গবন্ধুর ভুল সিদ্ধান্ত ছিল বলে অনেকে সমালোচনা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া, এরশাদ, শেখ হাসিনার শাসনামলেও জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে সেনাপ্রধান পদে কাউকে বসানো হয়েছে। কোনো যুক্তি বা তথ্য দিয়ে হত্যাকাণ্ড জায়েজ করা যায় না। হত্যা শুধু হত্যাই ডেকে আনে। ইউনিফর্মধারীদের জন্য এটি আরও সত্য এ কারণে যে তাঁরা অস্ত্রকেই একমাত্র সমাধান মনে করেন।

খালেদা জিয়া চারজনকে ডিঙিয়ে মইন উ আহমেদকে সেনাপ্রধান করেছিলেন। তাঁর বাড়ি নোয়াখালী, খালেদা জিয়ার বাড়িও নোয়াখালী। তিনি ছিলেন খালেদার ছোট ভাই সাইদ এস্কান্দারের ব্যাচমেট। পরে তিনিসহ সেনা কর্মকর্তাদের বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার পেছনে তারেক রহমানের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও অসদাচরণকে দায়ী করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

এক-এগারো বুঝতে হলে আমাদের সেনা মনস্তত্ত্ব এবং বাংলাদেশের রাজনীতির গতিবিধি বুঝতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ তাদের ভেতরে থাকা স্বাভাবিক। আবার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া কিছু লিগ্যাসিও তারা বহন করে চলেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে দেশটির একসময়ের আলোচিত বিচারপতি এম আর কায়ানির উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সেনাবাহিনী পররাজ্য দখল করে, আর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী নিজের দেশ দখল করে।

পৃথিবীর সব দেশে সেনাবাহিনী গঠিত হয় বহিঃশত্রুর হাত থেকে সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে সেনা মনস্তত্ত্ব তৈরি হয়েছিল, পঁচাত্তরের পর সেটি বদলে যায়। তবে এ জন্য রাজনীতিকেরাও কম দায়ী নন।

ভূরাজনীতিতে আমরা কখনো ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পারিনি। ২০০৭ সালের রাজনৈতিক পালাবদলের পরও সেনাবাহিনীর ভেতরে নতুন মেরুকরণ হয়।

এক-এগারোর পরিবর্তনে সামরিক হস্তক্ষেপ ছিল। কিন্তু তারা সরাসরি ক্ষমতা নেয়নি; সংবিধানও স্থগিত করেনি; নেপথ্যে থেকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেছে। সামনে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল, যাদের দায়িত্ব ছিল দৈনন্দিন কাজগুলো করা। কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিত সেনা কর্তৃপক্ষই। বিশ্লেষকদের মতে, তারা প্রথমে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে চেয়েছিল। সে লক্ষ্যেই দুই দলের শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তার করে। কিংস পার্টি গঠনের চেষ্টা চালায়। এক-এগারোর কুশীলবেরা দুই দলের সম্ভাব্য বিকল্প নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু সেনা নেতৃত্ব যখন দেখলেন নানা দিক থেকে সংকট ঘনিয়ে এসেছে, তখন তাঁরা পিছু হটলেন। আমরা মহিউদ্দিন আহমদের বই থেকে জানতে পারি যে ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে এক-এগারোর দুই প্রধান কুশীলব জেনারেল মইন ও মাসুদ উদ্দিনের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। সেই বিরোধে মইন জিতে যান এবং মাসুদকে রাষ্ট্রদূতের চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে যেতে হয়। এরপর তাঁর অনুসারীরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।

মহিউদ্দিন আহমদের *এক-এগারো* আসলে দুই বছরের ইতিবৃত্ত নয়। বাংলাদেশের রাজনীতির বৃত্তের কথাই এতে আছে। এক-এগারো নিয়ে রাজনৈতিক মহলে অনেক কথা চালু আছে, যার বেশির ভাগই মনের মাধুরী মেশানো। কিন্তু মহিউদ্দিন ভিত্তিহীন কিছু লেখেননি। তিনি উৎস খুঁজে বের করতে চেয়েছেন এবং অনেকখানি সফলও হয়েছেন। ঘটনার কুশীলবদের সঙ্গে কথা বলেছেন, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন।

মহিউদ্দিন আহমদ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, '১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশে নির্দলীয় রাজনীতি শুরু হয়। কিন্তু পারস্পরিক আস্থার জায়গাটি তৈরি হয়নি। ১৯৯০ সালে তিন জোটের রূপরেখায় গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার কাগুজে ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহি না থাকার কারণে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলো পাশ কাটিয়ে সংসদে সদস্যরা শুধু গালাগাল আর বাগাড়ম্বরেই ব্যস্ত হয়ে থাকেন।'

যাঁরা এক-এগারো থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, ক্ষমতা হারিয়েছেন, তাঁরা এর বিপক্ষে থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা উপকৃত হলেন, যাঁদের ক্ষমতার দণ্ড আরও দৃঢ় হলো, তাঁরাও কেন এক-এগারোর বিরুদ্ধে বলেছেন? হতে পারে নিজেদের দুর্বলতা আড়াল করতে।

আগেই বলেছি, এক-এগারো আসলে ঘটনা নয়, ঘটনার প্রতিক্রিয়া মাত্র। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠান আগেই নড়বড়ে ছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের রাতারাতি বাংলাদেশি বনে যাওয়া কিংবা সেক্যুলার রাজনীতির দিকপালদের ধর্মবাদী হয়ে যাওয়ার মধ্যে যা মোক্ষ হয়ে ওঠে, তা হলো সুবিধাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক বলে যাঁরা দাবি করেন, তাঁরা আসলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ কথাটার মর্মই বোঝেন না। আবার যাঁরা গণতন্ত্রের রক্ষাকারী হয়ে বসেন, তাঁদের নিজেদের আচরণে গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই। এই স্ববিরোধী ও প্রতারণামূলক রাজনীতিই আমরা দেখে আসছি ৪৮ বছর ধরে।

এক-এগারো রাজনীতিকদের দৃষ্টি খুলে দিতে পারত, কিন্তু দেয়নি। এক-এগারো থেকে তাঁরা শিক্ষা না নিয়ে অন্যকে 'শিক্ষা' দিতে সচেষ্ট থেকেছেন। সুষ্ঠু নির্বাচনের দোহাই দিয়ে যে এক-এগারো এসেছিল, সেটি নিশ্চয়ই একটি নির্বাচন নয়। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি যে নির্বাচনটি হওয়ার কথা ছিল, সেই নির্বাচনে জনরায়ের প্রতিফলন ঘটবে—শাসক দল ছাড়া কেউ মনে করেননি। দুই বছর পর আমরা সত্যি সত্যি একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন পেয়েছি। সেই নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ মসনদে বসেছে, বিএনপি বিরোধী দলের আসনে। কিন্তু তারপর কী হলো? দুটি নির্বাচন গেল ২০১৪ ও ২০১৮ সালে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন ছিল একতরফা। আর ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনের নামে দেশের ভোটব্যবস্থাটিই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

দুর্ভাগ্য, স্বাধীন বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্ব একটি সুষ্ঠু ও অবাধ এবং সবার জন্য গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে পারেনি। এ কারণে আন্দোলন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আনা হলো। সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে সেটি ধ্বংস করা হলো। বিএনপি যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে আইসিইউতে পাঠিয়ে থাকে, আওয়ামী লীগ আনুষ্ঠানিক দাফনের ব্যবস্থা করেছে। ফলে আমরা ফের ২০০৭ সালের এক-এগারোর আগের অবস্থায় চলে গেছি। কুশীলব বদলেছে মাত্র। তখন যাঁরা গণতন্ত্রের জন্য রাস্তায় চিৎকার করেছেন, এখন তাঁরা গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করছেন। তখন যাঁরা কথিত গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করছিলেন, এখন চিৎকার করছেন। পার্থক্য, এক-এগারোর আগে অন্তত রাস্তায় চিৎকার করা যেত, এখন সেই রাস্তাটিও বন্ধ।

আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা বলছেন, হরতাল-অবরোধের যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন উন্নয়নের যুগ। কিন্তু ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ কখনো যদি বিরোধী দলে আসে, সেই শেষ হওয়া যুগ যে ফিরে আসবে না, এই কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এক-এগারোর আগে 'দলের জন্য দেশের জন্য' শিরোনামে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'গত দেড় দশকের অধিককাল ধরে যাঁরা সংসদকে অকার্যকর করে রেখেছেন এবং ওয়াকআউটের মধ্যে সংসদীয়

দায়িত্ব পালন স্থগিত রেখেছেন, তাঁদের হিসাব কে নেবে? সংসদ সদস্যদের প্রভাব অস্বাভাবিকভাবে স্ফীতি ও বিস্তার লাভ করেছে। আজ আঞ্চলিক সব গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি হিসেবে প্রতিটি জেলার জন্য আমরা একজন করে সাংসদকে দায়িত্বভার দিয়ে দিয়েছি, সে কোন আইন বা রেওয়াজের বলে?'

এক-এগারোরও বিবিধ কারণ ছিল। এর মধ্যে বেশি আলোচিত সংবিধানের ১৪তম সংশোধনী, যাতে বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে ৬৫ বছর থেকে ৬৭ বছর করা হয়। উদ্দেশ্য, বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করা। বয়স না বাড়লে তিনি প্রধান উপদেষ্টা হতে পারবেন না। আওয়ামী লীগ সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে এর বিরুদ্ধে। ফল দাঁড়ায়, যেদিন বিএনপি সরকার পদত্যাগ করে; সেদিন লগি-বইঠার আন্দোলনে ঢাকা শহর অচল হয়ে পড়ে। বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে ১৪ দল ও জামায়াত-শিবিরের সংঘর্ষে কয়েকজন মারা যান। এই পরিস্থিতিতে কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সংবিধানে বর্ণিত বিকল্পগুলো অনুসন্ধান না করে নিজেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। আপত্তি সত্ত্বেও বিরোধী দল শর্ত সাপেক্ষে এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁর ভূমিকা হয়ে পড়ে 'বিএনপির হয়ে, বিএনপির জন্য, বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকার' পরিচালনা। তাঁর পক্ষপাতমূলক আচরণের প্রতিবাদে চারজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। এ পর্যায়ে বিরোধী দল সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এটাই দৃশ্যত এক-এগারোর পটভূমি।

মহিউদ্দিন আহমদের বইয়ে ১১ জানুয়ারি তিন বাহিনীর প্রধান বঙ্গভবনে গিয়ে কীভাবে 'দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে' রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে দিয়ে আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করেছিলেন এবং ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন করতে বাধ্য করেছিলেন, তার আনুপূর্বিক বর্ণনা আছে। সেনা নেতৃত্বের প্রথম পছন্দ ছিল গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। কিন্তু তিনি স্বল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব নিতে রাজি না হওয়ায় বিকল্প হিসেবে বেছে নেওয়া হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফখরুদ্দীন আহমদকে। আক্ষরিক অর্থেই অস্ত্রের মুখে সেনা নেতৃত্বের প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দেন। আওয়ামী লীগসহ প্রায় সব বিরোধী দল এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা বঙ্গভবনে শপথ অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। যদি এক-এগারো তাঁদের কাছে এতই অপছন্দের হবে, তাঁরা কেন স্বাগত জানাতে গেলেন?

প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ ১২ মে ২০০৮ সালে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেন, 'একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তন ছাড়া আমাদের সকল প্রচেষ্টা বিফলে পর্যবসিত হবে। সে লক্ষ্যে আমাদের প্রথম কাজ রাজনীতির

গুণগত উত্তরণে সকল বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হওয়া। এ বিষয়ে অথবা রাজনৈতিক দলগুলোর স্বতঃপ্রণোদিত অভ্যন্তরীণ সরকারের সফল বাস্তবায়ন আশা করি। জাতি আজ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গণতান্ত্রিক আচার-আচরণ, সৎ, যোগ্য এবং গতিশীল নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা সৃষ্টির জন্য প্রত্যাশিত সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়ন দেখতে চায়। পাশাপাশি জনগণ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সম্প্রীতি, শ্রদ্ধাবোধ ও সহযোগিতা কামনা করে। রাষ্ট্রীয় এবং দলীয় সকল কার্যকলাপে সুস্থ ও স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ধারার বাস্তবায়ন ও তা অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়ে ঐকমত্য সকলেই উপলব্ধি করবেন বলে আমি আশা করছি।'

এক-এগারো সফল হলো না ব্যর্থ হলো, সেই প্রশ্নের চেয়েও জরুরি হলো, এক-এগারো কেন এল? গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতিকেরা রাষ্ট্র চালাবেন, এটাই স্বাভাবিক। কোনো সরকার ভালো কাজ না করলে জনগণই তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু জনরায় প্রত্যাখ্যান করে গায়ের জোরে ক্ষমতায় থাকতে চাইলে কী অবস্থার সৃষ্টি হয়, এক-এগারো তার একটি উদাহরণ মাত্র। ভবিষ্যতে যে গণতন্ত্রের স্বার্থে, সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে এ রকম অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটবে না, সে কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

রাষ্ট্র পরিচালনার তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার বিভাগ। যেসব দেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেসব দেশে এক বিভাগ আরেক বিভাগের ওপর খবরদারি করে না। সংবাদমাধ্যম বা নাগরিক সমাজকেও শত্রু ভাবে না। যে যার দায়িত্ব পালন করে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনা করে নির্বাহী বিভাগ। বিচার বিভাগ ও আইনসভা তাদের ওপর নজরদারি করে, যাতে তারা আইনের ব্যত্যয় ঘটাতে না পারে। কিন্তু আমাদের দেশে সরকার অর্থাৎ নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভা একাকার হয়ে গেছে। ক্ষমতাসীনেরা মনে করেন, সবকিছু দখলে রাখতে হবে।

এক-এগারো নিয়ে এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকে লিখলেও সামগ্রিক বিষয়টি তুলে ধরেছেন লেখক-গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ। এ বইয়ে তিনি নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সেই সময়ের প্রধান চরিত্র, পার্শ্বচরিত্র এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা একে অপরের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। এর মাধ্যমে পাঠক সত্যাসত্য বিচার করতে পারবেন। তাঁর ভাষায়, 'এই বইয়ে বিশেষ একটি সময়ের যে ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, তার বড় একটি অংশ সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। আমি চেয়েছি খোলামেলা আলোচনার মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে।...দেখা গেছে, একই বিষয়ে একেকজন একেক রকম তথ্য দিয়েছেন বা মন্তব্য করেছেন। আবার কিছু কিছু বিষয়ে একমত পেয়েছি। এই ভিন্নতাটুকু সময়ের চরিত্রগুলো বুঝতে

আমাদের সাহায্য করে।'

মহিউদ্দিন আহমদের লেখায় তিনটি পর্ব উঠে এসেছে : এক-এগারোর পটভূমি, সেনাসমর্থিত সরকারের দুই বছরের শাসন এবং পরবর্তী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে বিষয়টি পুরোপুরি রাজনৈতিক হলেও ঘটনা প্রবাহের ওপর রাজনীতিকদের নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

যেকোনো ঘটনার পটভূমি, শুরু এবং শেষ থাকে, কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক-এগারো এমন এক ঘটনা, যা সহজে শেষ হওয়ার নয়। যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে এক-এগারো ঘটানো হয়েছিল বলে এর উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, যা নিয়ে নাগরিক সমাজের মধ্যে আশাবাদ জেগেছিল, তার কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি। রাজনীতি এক কদমও এগোয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো হয়েছে আরও ভঙ্গুর, অকার্যকর। এক-এগারোর আগে ধারণা করা গিয়েছিল যে বাংলাদেশে নাগরিক সমাজ খুব শক্তিশালী। তাঁরা মনে করেছিলেন, রাজনীতি ও গণতন্ত্রকে সুষ্ঠু ধারায় নিয়ে যেতে পারবেন। বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি। বরং সবকিছু উল্টো ধারায় চলছে।

এক-এগারোর কুশীলবেরা মুখে যা-ই বলুন না কেন, শুরুতে তাঁরা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বাইরে নিজেদের একটা বিকল্প শক্তিকেন্দ্র হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্যে তাঁরা কিছু পদক্ষেপও নিয়েছিলেন, যা ডিজিএফআইয়ের তৎকালীন পরিচালক চৌধুরী ফজলুল বারীর জবানিতে উঠে এসেছে। যদিও তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদের দাবি, তাঁদের কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিল না। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দুই শীর্ষ নেত্রী যখন গ্রেপ্তার হলেন, তখন রাজনীতিকদের মধ্যে প্রচণ্ড ভীতি তৈরি হয়। দুই দলের অনেক জ্যেষ্ঠ নেতা নিজেদের সংস্কারবাদী বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন। অন্যরা থেকে গেলেন নিজ নিজ নেত্রীর সঙ্গেই। আবার কেউ কেউ দুই নৌকায় পা দিয়ে রেখেছিলেন।

কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা, বিশেষ করে সেই সময়ে হঠাৎ চালের ঘাটতি, নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জের ধরে গণ-আন্দোলন কুশীলবদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়; যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশ এক-এগারোর পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল, তারাও অনির্বাচিত সরকারকে বেশি দিন মেনে নিতে চায়নি। এই প্রেক্ষাপটে মইন উ আহমেদ ক্ষমতা ধরে রাখার চেয়ে মসৃণ প্রস্থানের উপায় খুঁজতে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে ভারত সফরকালে দেশটির তৎকালীন অর্থমন্ত্রী (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি) প্রণব মুখার্জির সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথোপকথনটি স্মরণীয়। প্রণব মুখার্জি দুই নেত্রীকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার তাগিদ দিলে

মইন উ আহমেদ ক্ষমতা ছাড়ার পর তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, এই নিশ্চয়তা চান। প্রণব মুখার্জির ভাষ্য অনুযায়ী, মইন নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই নিশ্চয়তার পেছনে কী ভুরাজনীতি কাজ করেছে, গবেষকেরা সেটি ভবিষ্যতে খতিয়ে দেখতে পারেন।

এক-এগারোর চরিত্র উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে এর অন্যতম কুশীলব মইন উ আহমেদের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মহিউদ্দিন আহমদ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সেই সময়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ডিজিএফআইয়ের সাবেক পরিচালক চৌধুরী ফজলুল বারী। মহিউদ্দিন আহমদ আরও যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ ও উপদেষ্টা মইনুল হোসেন, সাবেক নৌবাহিনীর প্রধান সারোয়ার জাহান নিজাম, সাবেক সেনাপ্রধান মাহবুবুর রহমান ও নূরউদ্দিন খান, সাবেক জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা এ টি এম জহিরুল আলম, রাজনীতিক শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, আবদুল আউয়াল মিন্টু, মাহমুদুর রহমান মান্না, সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, সাবেক এনবিআর চেয়ারম্যান বদিউর রহমান, শিক্ষকনেতা হারুন অর রশিদ ও সদরুল আমিন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ইফতেখারুজ্জামান, জাফরুল্লাহ চৌধুরী, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, আবুল হাসিব খান, সাবেক আইজিপি খোদা বকশ চৌধুরী, র‍্যাবের সাবেক ডিজি মিজানুর রহমান, চিকিৎসক কাজী মজহারুল ইসলাম প্রমুখ। লেখকের ভাষ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি এই সাক্ষাৎকারগুলো নিয়েছেন। একটি বইয়ের জন্য এতজন মানুষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

ফখরুদ্দীন আহমদ সরকারের দৈনন্দিন কাজ ও নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে নিজেকে জড়াননি। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো উপদেষ্টা জড়িয়েছেন কিংবা দূরবর্তী লক্ষ্য নিয়ে এগোতে চেয়েছিলেন, তার আভাস-ইঙ্গিতও মহিউদ্দিনের বইয়ে আছে।

এক-এগারোর কুশীলবেরা যেসব তথ্য-উপাত্ত দিয়েছেন, তাতে বলা যাবে না যে এর পেছনে দীর্ঘ ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল। তাঁরা দুই শীর্ষ নেত্রীকে বাদ দেওয়ার চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু এরপর কী করবেন, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এক-এগারোর উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক না কেন, সেসব কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, তা তাঁরা জানতেন না। তাঁরা যেসব সংস্কারের কথা বলেছিলেন, দৃশ্যত সেগুলো বাস্তবে রূপ দেওয়ার সদিচ্ছা বা সামর্থ্য তাঁদের ছিল না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদের কথা বলে তাঁরা ক্ষমতায় এলেও তাঁদের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান বিশ্বাসযোগ্যতা পায়নি। সেখানে পক্ষপাত ছিল। ফলে লাইনচ্যুত ট্রেনকে লাইনে না তুলেই এক-এগারোর কারিগরদের সটকে পড়তে হয়েছে।

বাংলাদেশে এর আগে সংঘটিত সেনা অভ্যুত্থান বা সামরিক হস্তক্ষেপ সম্পর্কে লেখক-গবেষকেরা খুব বেশি কাজ করেছেন বলে মনে পড়ে না। বিশেষ করে পঁচাত্তরের ঘটনাবলি জানতে আমাদের বিদেশি সাংবাদিক লরেন্স লিফৎশুলজ কিংবা অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের শরণাপন্ন হতে হয়। তাঁরাই ঘটনা তথ্য-উপাত্তসহকারে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া সেনাবাহিনীর কতিপয় অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও স্মৃতিচারণা করেছেন। কিন্তু গবেষকের দৃষ্টিতে সেনারাজনীতির সম্পর্কটি দেখা সম্ভবত এটাই প্রথম।

বিভিন্ন কুশীলব ও পার্শ্বচরিত্রের বয়ানে মহিউদ্দিন আহমদ আমাদের কাছে ইতিহাসের এক নানা জানা-অজানা অধ্যায় তুলে ধরেছেন। অস্থির ও জটিল সময়ের ব্যবচ্ছেদ করেছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে। বহু বছর ধরে আসা বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান দুই ধারা—আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে একটা শক্তির ভারসাম্য ছিল। এক-এগারো সেই ভারসাম্য কি চিরতরে বদলে দিল? এ প্রশ্নের উত্তর কেবল ভবিষ্যৎই দিতে পারবে। ১৯৭৫ সালের বিয়োগান্ত ঘটনার পর আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে ২১ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এক-এগারোর পর বিএনপিকে কত বছর অপেক্ষা করতে হবে?

এক-এগারোর উৎসমূল সন্ধানের জন্য মহিউদ্দিন আহমদ বিশেষভাবে সাধুবাদ পেতে পারেন।

লেখক পরিচিতি

রাহমান চৌধুরী

লেখক, গবেষক ও নাট্যকার। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—*মহাবিদ্রোহ ও সম্রাট বাহাদুর শাহ* (বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫); *ক্রীড়নক* (বাংলা একাডেমি, ২০০১); *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক* (বাংলা একাডেমি, ২০০৭); 'মুক্তিযুদ্ধ', 'দুই বিঘা জমি' এবং 'বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের পুড়ে যাওয়া বিবেক' (*সাপ্তাহিক ২০০০*, ২০০৫)।

আসহাবুর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। পরে ইংল্যান্ডের রেডিং ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রামীণ সমাজ উন্নয়নে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৭২-৭৯ সময়কালে সরকারি কলেজে শিক্ষকতা ও ১৯৭৯ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি করেন। ১৯৭০ সাল থেকেই বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস নিয়ে লিখছেন। প্রথম প্রকাশিত বই *মানব সভ্যতার উষালগ্নে* (খান ব্রাদার্স, ১৯৭০) প্রয়াত লেখক ও উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সত্যেন সেনের সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত। পরে প্রকাশিত বইগুলো—*বাংলাদেশের কৃষি কাঠামো, কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন* (ইউপিএল, ১৯৮৬), *বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (ইউপিএল, ১৯৮৮), *বাংলাদেশে কৃষিপ্রশ্ন* (ইউপিএল, ১৯৯২)। তাঁর লেখা গ্রন্থ সমালোচনা দীর্ঘদিন অধুনালুপ্ত *বিচিত্রা* এবং সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসবিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও তুলনামূলক রাজনীতিতে নর্দার্ন অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের স্কুল অব সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজে শিক্ষকতা করছেন। প্রকাশনা: *Water for Poor Women: Quest for an Alternative Paradigm* (Lanham: Lexington Books, ২০১৩)। লেখালেখির বিষয়: গণতন্ত্রায়ণ, ইসলামি মতাদর্শ, জেন্ডার ও উন্নয়ন, পানি ব্যবস্থাপনা।

মারওয়ান মাউশের

জর্ডানের কূটনীতিক ও রাজনীতিক। ২০০২ থেকে ২০০৪ সময়কালে জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে কারনেগি এনডাওমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিস প্রতিষ্ঠানে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ওপর পরিচালিত গবেষণার দেখভাল করেন। তিনি ইসরায়েলে জর্ডানের প্রথম রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রেও একই দায়িত্ব পালন করেছেন। মাউশের জর্ডানের একমাত্র ইংরেজি পত্রিকা *জর্ডান টাইমস*-এর সাংবাদিক হিসেবে পেশাজীবন শুরু করেছিলেন।

ম্যাটস একস্ট্রম ও অ্যাডাম শেহাতা

দুজনই সুইডেনের গোটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম, মিডিয়া ও কমিউনিকেশন বিভাগের শিক্ষক। একস্ট্রম পিএইচডি করেছেন সমাজবিজ্ঞানে, উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর শেহাতা পোস্টডক্টরাল ডিগ্রি নিয়েছেন সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম ও যোগাযোগ বিষয়ে।

মুহাম্মদ তানিম নওশাদ

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে। দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন উন্নয়ন অধ্যয়নের ওপর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জার্মান ভাষার ওপর পড়াশোনা করেছেন জার্মানির ম্যাক্স ভেবার হাউস, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে গবেষক ও পরামর্শক হিসেবে তিনি কাজ করেছেন এবং করছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই ও লেখা তিনি মূল জার্মান, ফরাসি ও রুশ থেকে অনুবাদ করেছেন। ২০১৭ সালে তাঁর অনুবাদের ওপর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোহরাব হাসান

কবি, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—*বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ ও যুদ্ধাপরাধ* (ঢাকা প্রকাশন, ২০০০); *মুজিব, ভুট্টো, মুক্তিযুদ্ধ* (মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০); *সুন্দর তোমার সর্বনাশ* (সৃজন, ১৯৮৮); *বাতিল রাজদণ্ড* (উত্তরা, ১৯৮৪)।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। ডাকযোগে নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ নগদ টাকাও পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়া যাবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শ) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শ) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬